উপেক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়া

যুধিষ্ঠির জানা

ময়না প্রকাশনী
১৪-এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

॥ প্রকাশক ॥
শ্যামসুন্দর সাহু
ময়না প্রকাশনী
১৪।এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৯

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
শুভ ২৫শে বৈশাখ, শুক্রবার
১৩৬৮

॥ প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা ॥
মোহন মুখার্জী

॥ মুদ্রাকর ॥
তৃপ্তিমোহন ঘোষ
নিউ রাজলক্ষ্মী প্রিণ্টার্স
১৯ এইচ/এইচ গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-পঞ্চশতক পূর্তি স্মরণে

আমার তৃতীয় নিবেদন

প্রসঙ্গ : উপেক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়া

উপেক্ষা করেছিলেন বাল্মীকি উর্মিলাকে। লক্ষণের স্ত্রী উর্মিলা। অযোধ্যার রাজকুল বধূ হয়েও সর্বসুখ বঞ্চিতা। মাত্র দেখেছিলাম একবার উর্মিলাকে। জনক তনয়ার স্বয়ম্বর সভায়। মালা দিয়ে পতিত্বে বরণ করেছিলেন লক্ষণকে। তারপর অবগুণ্ঠিতা উর্মিলা রাজঅন্তঃপুরে কোথায় গেলেন হারিয়ে। মহর্ষি বাল্মীকি কোন খোঁজই দিলেন না আমাদের। বিরহিনী উর্মিলার জন্য আজো হাহাকার করে উঠে হৃদয়।

বাণভট্টের কাদম্বরীর পত্রলেখা, কই সেও ত পেলনা রাজকুমার চন্দ্রাপীড়ের সুপ্তযৌবনের বিন্দুমাত্র স্পর্শ। কালিদাসের অভিনব সৃষ্টি শকুন্তলা। অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা, প্রিয় সখী শকুন্তলার। তাদের দুরন্ত যৌবনকে কি করে বেঁধে রেখেছিল অতিপিনদ্ধ বল্কলে, মহাকবি কালিদাসও দেননি আমাদের সে সংবাদ।

হায়, উপেক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমার বিরহিনী জীবনের সংবাদও কই পেলাম না খুঁজে বৃন্দবন দাস আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের মানসলোকে। প্রিয়া বড় ভুল করেছিলে বাল্যে নিমাইকে দেহ মন সমর্পণ করে। নিমাই ত তোমায় চায়নি। হতভাগী কেন গিয়েছিলে সোহাগ জানাতে মিথ্যে কান্নাকাটি করে। তার হৃদয়-সিংহাসনে সবটুকু স্থান ত অধিকার করে বিরাজ করত লক্ষ্মীপ্রিয়া। নিমাই ভালবেসে ছিল একান্ত ভাবে লক্ষ্মীকেই। নিমাই সন্ন্যাসের অন্যতম প্রধান কারণ লক্ষ্মীর বিচ্ছেদ। পিতার মৃত্যু আর বিশ্বরূপের সংসার ত্যাগ। বৈরাগ্যের আগুন জ্বলে উঠেছিল এসব কারণেই নিমাইয়ের হৃদয়ে। তাতে যুগিয়েছিল ইন্ধন তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের শ্লেষোক্তি।

নিমাই বড় মাতৃভক্ত। তুলনা হয় না বৈষ্ণব সাহিত্যে নিমাইয়ের মাতৃভক্তির। মাতৃ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি অবিচার নিমাই চরিত্রকে বড় ব্যথিত করে তুলে। উপেক্ষিতা তাই পতিদেবতার কাছেও।

ইতিহাস বলে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব রাত্রে শুধু নয়, অনেক দিন আগে থেকেই ছিলেন না বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর বাড়ীতে। অনাদরে অবহেলায় বঞ্চিতা হয়ে বাস করতেন তিনি পিত্রালয়েই। সন্ন্যাস গ্রহণের পর আর কোন দিনই চৈতন্যদেব দেখা করেননি বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে। গোপা রাহুলকে বুকে ধরে ভুলে ছিলেন আর্যপুত্র শাক্যসিংহকে। বুদ্ধ হয়ে তিনি দেখা করেছিলেন গোপার সঙ্গে। গোপা গ্রহণ করেছিল স্বামীর প্রবর্তিত বৌদ্ধ ধর্ম। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হয়েছিল ভিক্ষুণী। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাগ্যে সেটুকুও জোটেনি। শ্রীচৈতন্যদেব মায়ের জন্য কাপড় আর জগন্নাথের প্রসাদ পাঠাতেন ঠিকই, কিন্তু কোনদিন বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য কাপড় পাঠান ত দূরের কথা খোঁজও নিতেন না। ইতিহাস সম্মতভাবে এ তথ্য সত্য।

বিষ্ণুপ্রিয়ার গার্হস্থ্য জীবনের অন্তরঙ্গ হার্দিক চিত্র এঁকেছেন লোচন দাস। বাস্তব নয় সে চিত্র, সত্যও নয়। অথচ ভক্ত হৃদয় বিশ্বাস করে, গেঁথে ও নিয়েছে হৃদয়ে সত্য বলে। প্রশ্ন উঠবে এমন কর্ম কেন করলো লোচন? লোচন ছিলেন' গৌরনাগরবাদী।' মনে করেন ঐতিহাসিকগণ কাঁচড়াপাড়ার শিবানন্দ সেন, নবদ্বীপের মুরারী গুপ্ত ও শ্রীকণ্ঠের নরহরি সরকার বাংলাদেশে সৃষ্টি করেছিলেন প্রথম 'গৌরপারম্যবাদ।' এখানে উভয় শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গই পরমতত্ত্ব। বৃন্দাবন দাস ছিলেন না 'গৌরপারম্যবাদী।' আর ব্রজধামের গোস্বামীরা এর ধারই ধারতেন না। তাদের উপাস্য ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। গোপীবৃন্দ পরিবৃত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁর পরকীয়া ছিলেন শ্রীরাধা। গ্রহণ করতেন তাঁরা গোপাল মন্ত্র। আর এদিকে গৌর মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন নরহরি সরকার। লোচন ছিলেন এই নরহরির শিষ্য। গৌর যদি নাগর হয় তাঁর রাধা হবেন বিষ্ণুপ্রিয়া। পরকীয়া প্রেমেই শ্রেষ্ঠ প্রেম। লোচন দাসই বানালেন চৈতন্যদেবকে নাগর করে, নিজেরা সাজলেন গোপী। মত্ত হলেন বৃন্দাবনী আদি-রসে। শেষে এমন হল নবদ্বীপের কুল-কামিনীরা ও ডগমগ হলেন চৈতন্য প্রেমে। রচনা করলেন শৃঙ্গার উদ্বোধক চটুল ঢামালি। নবদ্বীপের শ্বাশুড়ী, ননদী বধূদের ছাড়লেন বিবস্ত্র করে। বৈষ্ণব ধর্মে বৈষ্ণবীর হলো আমদানী। সর্বনাশ হলো বৈষ্ণব ধর্মের। নরহরি লোচনেরাই সব থেকে বড় বৈষ্ণব অপরাধী।' নরহরি বধূদের সাহস দিয়েছিলেন, পথ দিয়েছিলেন বাতলে, খিড়কি দিয়ে পালাতে। 'নরহরি কহে, খিড়কীর পথে যাইতে কে করে মানা।' এই আদি রসের অশুচি উন্মাদমতা এক শতাব্দী পরে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে প্রবেশ করে ধারণ করেছিল উৎকট রূপ। এর ফলে বিপর্যস্ত হয়েছিল চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ ও মহৎ আদর্শ।

আমি ও বৈষ্ণব অপরাধে অপরাধী। লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' অবলম্বন করে এঁকেছি চৈতন্যদেবের গার্হস্থ্য চিত্র। জানি এচিত্র সত্য নয়। গৃহত্যাগের পূর্ব রাত্রে চৈতন্যদেব ব্যাকুল সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য। উন্মত্ত কৃষ্ণ প্রেমে, চিন্তান্বিত তিনি মনে মনেও। সেই সময় এই অবিশ্বাস্য 'নানা রস বিহার' করা, স্ত্রীর সঙ্গে আসঙ্গ লিপ্সা, শুধু অমানসিক নয় অস্বাভাবিকও। লোচন গুরুতর বৈষ্ণব অপরাধে অপরাধী। আমি মনে করি লোচনকে যিনি অনুসরণ করবেন, তিনিও হবেন সমান 'বৈষ্ণব অপরাধী।'

যুক্তি আর ভক্তি এক নয়। যুক্তি দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, হৃদয়ে জাগ্রত করা যায় না ভক্তি ভাব। চৈতন্যদেবকে যাঁরা ভগবান মনে করেন, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি। তাই বলে আমি চৈতন্যদেবকে ভগবান মনে করি না। শ্রীচৈতন্যদেব স্রষ্টা। তিনি সৃষ্টি করেছেন ভগবানকে, পৌঁছে দিয়েছেন স্বর্গ থেকে ভগবানকে আমাদের মর্তের মাটির ঘরে। অর্থাৎ ভগবানের ভগবান। জন্মদাতা জনক। তাঁর জন্যই আমরা ঘরেই বসে পেয়েছি ভগবানকে। দেখেছি ঘরের ছেলের চক্ষে বিশ্ব-ভূপের ছায়া। কবির কথাকেই মনে করি সত্য বলে। 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।'

আর বিষ্ণুপ্রিয়া ? এক রকম রাজ-নন্দিনী হয়েও চির উপেক্ষিতা, চির বঞ্চিতা। চৈতন্য সহচর বাসুদেব ঘোষের পদেই পাই প্রকৃত বিষ্ণুপ্রিয়াকে খুঁজে। বাসুদেব বিষ্ণুপ্রিয়ার ব্যথা বেদনা উপলব্ধি করেছিলেন মরমী হৃদয় দিয়ে। তিনি ছিলেন চৈতন্য পর্ষদ্। তাই ঐতিহাসিকগণ মনে করেন তিনি চৈতন্যদেবের জীবনলীলাকে বাস্তব ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সক্ষম হয়েছেন চিত্রিত করতে। যদিও তিনি অনেকটা 'গৌরনাগর' ভাবের কবি ছিলেন।

গত এক বছর আমি 'চৈতন্যময়' নয় চৈতন্যঘোরে' সমাচ্ছন্ন উম্মাদবৎ। বিশ্বাস করিনা অলৌকিকতায়, ভক্তিহীন অধম পামর আমি। কিন্তু কেন জানি না বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনার্ত, উপেক্ষিত, বঞ্চিত জীবন আমাকে কাঁদায়, ব্যথিত করে তুলে হৃদয়কে। কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি তাঁর পাশে। অকপটে তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর বেদনাময় জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী। সে কাহিনীর সাহিত্যরূপ দিতে গিয়ে এক নাগাড়ে লিখেছি প্রায় দু'মাস। এর মধ্যে পুরো দু'দিন দু'রাত্রি অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টা বিরামহীন লিখেছি। তিনি সামনে বসে থেকে কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন তাঁর, জীবন কাহিনী। তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতাম রাত্রিতেই সব থেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে। স্ত্রী এসে কাছে দাঁড়ালে লিখতে পারতাম না এক কলমও। তখন যেন আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করতেন বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায়। যখন পড়ে শুনাতাম স্ত্রীকে দেখতাম তার কাঁধে হাত দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া শুনছেন তাঁর জীবন-কাহিনী। স্ত্রীর চোখেও আগ্রহ, বেদনা, কান্না, একই অবস্থা বিষ্ণুপ্রিয়ারও। কেঁদেছি আমিও। পাণ্ডুলিপির পাতায় স্পষ্ট তার স্বাক্ষর। যত বড় অবিশ্বাসী হই আমি, এ সত্য বিশ্বাস করি আমি হয়ে গিয়েছিলাম অন্তর সত্তায় বিষ্ণুপ্রিয়াময়। তন্ময়তাই আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে।

আমার প্রকাশক শ্যাম ভাই, তার কর্মচারীবৃন্দ, প্রেসের কর্মচারীগণ আর আমার পুত্র শ্রীমান্ সুস্নাত জানা (পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর ছাত্র)-র ঐকান্তিক চেষ্টা, পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে সম্ভব করেছে প্রকাশ করতে এই পুস্তকটি। কিছু বানান ভুল হয়ত চোখে পড়বে। গ্রামে কলকাতা থেকে একশত কিলোমিটার দূরে বসে লিখছি, দিন দু'বার লোক আসছে। প্রেসে যাচ্ছে পাণ্ডুলিপি। কি লিখছি বুঝতে পারছি না নিজেই। পাণ্ডুলিপি ভাল করে পড়ে দেখারও সময় হয়নি। ঠিক মত প্রুফও পাবছি না দেখতে। তাই কোন ভুল যদি চোখে পড়ে, অসংগতি যদি থেকে যায়, কিংবা যদি কোন প্রশ্ন জাগে মনে, জানাই সবিনয় নিবেদন আমার শ্রদ্ধেয়, পাঠকবৃন্দের কাছে অনুগ্রহ করে পত্র দেবেন নিম্ন ঠিকানায়। সাধ্যমত চেষ্টা করব উত্তর দিতে। আর এ বই পড়ে যদি খুশি হন, সে ত আপনাদের মহৎ অন্তঃকরণের হার্দিক পরিচয়।

যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো)

শচী জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ
দুই জন হইলেন আনন্দ স্বরূপ ॥

—বৃন্দাবন দাস

শয়ন মন্দিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর

উঠিলা রজনী শেষে

মনে দৃঢ় আশ করিব সন্ন্যাস

ঘুচাব এমন বেশে ॥

লোচন দাস

দোল পূর্ণিমায় প্রিয়া প্রবেশি মন্দিরে
মহাভাবে সমাধিস্থ স্মরিয়া প্রভুরে ॥

॥ এক ॥

তখনো সূর্য ওঠেনি। আরক্তিম পূর্বাচল। বৃক্ষের শাখায় শাখায় সবেমাত্র শুরু হয়েছে পাখির বন্দনা-গীতি। জেগে উঠেছে নবদ্বীপের নাগরিক জীবন। পায়ে মাড়ানো ধূসর বালুময় পথ। হেঁটে হেঁটে আসছে অগণিত নারী-পুরুষ গঙ্গায়। প্রাতঃস্নানে।

এক হাতে একটি ছোট ঘটি। আর এক হাতে একটি গামছা আর কাপড়। ধীর পদক্ষেপ। শচী দেবী চলেছেন গঙ্গা স্নানে। প্রতিদিন এ পথেই তিনি আসেন। এ তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস।

মনের নিভৃতে তার জমাট কান্নার পাহাড়, যেন পাথর হয়ে আছে। একটা বোবা বেদনা। কোন দিকে খেয়াল থাকে না তাঁর। বিক্ষিপ্ত উন্মনা তিনি। থেকে থেকে একটা চাপা কান্নার অশ্রু ঝরে পড়ে তাঁর দু'চোখ বেয়ে। এই নীরব কান্নার মধ্যেই স্মরণ করেন ইষ্টদেবতাকে।

বড় দুঃখ শচীদেবীর। তাইত নিরন্তর তাঁর অন্তর চাইছে ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম। প্রভু, আর কেন। এবার ডেকে নাও আমাকে। জাগতিক দহনদীর্ণ হাহাকার থেকে তুমি আমায় মুক্তি দাও। ঠাঁই দাও তোমার চরণপ্রান্তে।

আজকাল শচী দেবীর কাছে সব কিছু যেন কেমন একটা বিষাদ মাখা। কোন কিছুই ভাল লাগে না তাঁর। প্রভাতের এই স্নিগ্ধতা, তাও যেন বিষাদাচ্ছন্ন।

সহসা উৎসুক হয়ে ওঠে তাঁর দু'টি নয়ন।

ঐ সেই মেয়েটি আসছে না গঙ্গায়।

হ্যাঁ, রোজইত আসে।

বড় সুন্দর মেয়েটি। ছোট টুকটুকে দু'খানি পা। ছোট ছোট পদবিক্ষেপে ধীর মন্থর গতিতে আসছে এগিয়ে। লীলায়িত মন্দ-মন্থর কি সুন্দর ছন্দোময় গতিভঙ্গী। স্নিগ্ধ দু'টি চোখ। নম্র আনত মস্তক। যেন কাঁচা সোনা-গলানো বরণ। দীপ্ত দিব্য কান্তি। জ্যোৎস্না-স্নাত লাবণ্যময় দেহ। এ যেন প্রত্যুষের এক ঝলক সবুজ প্রসন্নতা।

উপচে পড়ছে ডুরে টানা শাড়ীর ফাঁকে ফাঁকে।

বয়স কতই বা আর হবে !

এগারো, কি বড় জোর বারোর বেশী কিছুতেই নয়।

সহসা কেমন যেন তাঁর প্রশ্ন জাগে মনে। কেন আসে গঙ্গায়। ঠিক এমনি সময়। প্রতি দিন। ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন স্নান করে এই শৈশব থেকে কেন গঙ্গার প্রতি এত টান। কি বোঝে ও গঙ্গাস্নানের কেন এত ভালবাসে গঙ্গাকে।

ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নানে পুণ্য সঞ্চয়—কিন্তু তার কি বোঝে ও। কি-ই বা এমন ওর বয়স হয়েছে। হয়ত ওর গুরুজন কেউ গঙ্গাস্নানে পুণ্য অর্জনের কথা বলেছে ওকে। এমনি নানান্ প্রশ্ন ভিড় করে আসে শচীদেবীর মনে। আকুল জিজ্ঞাসা দপ্ দপ্ করে ওঠে—কে এই মেয়েটি ! আলো করে রয়েছে কার গৃহাঙ্গণ ?

ওকে দেখলে কেমন যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে জড়িয়ে ধরতে বুকে। উছলে উঠে বুকের স্নেহ-সমুদ্র। দৃষ্টি কেড়ে নেয় সহজেই।

সহসা শচীদেবীর বুকটা কেমন যেন রিক্ত শূন্য হয়ে—হয়ে যায় নিথর নিস্পন্দ। হাহাকার করে উঠে শূণ্য হৃদয়। কি যেন কোথায় হারিয়ে গেছে তাঁর। কি এক অমূল্য নিধি। সে হারানোর ব্যথা ভুলতে চান তিনি। কি যেন তিনি চান।

পোড়া প্রাণটা তো চাইলেই আর যায় না যতক্ষণ প্রাণ, ততক্ষণ গান। মায়া বন্ধ জীব আবদ্ধ মায়াতেই। তাইত তাঁর হৃদয়ের এই আর্তি, এই আকুলতা।

কেমন যেন সম্বিৎ ফিরে পান শচী দেবী।

সামনে তাকিয়ে দেখেন, পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে মেয়েটি।

অপলক শচী দেবী। তাকিয়ে থাকেন মেয়েটির পানে। লক্ষ্য করেন তার গতিবিধি।

ধীরে অতি ধীরে মেয়েটি নামে গঙ্গায়। টুবটুব করে ডুব দেয় গঙ্গার স্নিগ্ধ শীতল জলে। তারপর ছোট্ট দুটি হাতে প্রণাম জানায় সূর্যদেবকে। অন্তর উজাড় করে অর্পণ করে পুষ্পাঞ্জলি। ভক্তির ভাবে আবেশে অবশ হয়ে আসে দেহ। বুজে যায় চোখ দুটি। তারপর ভেজা কাপড়ে উঠে আসে।

ততক্ষণে শচীদেবী পৌঁছে গেছেন ঘাটে।

মেয়েটি ভক্তি বিনম্র মাথাটি ওঁর চরণে ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

কিন্তু কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই পালিয়ে যায় ছুটে। আঁথিবীথি

চঞ্চল-চরণে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন শচীদেবী—এলায়িত কালো কালো চুলগুলি উড়ছে বিচুর্ণিত হয়ে। চলে যাচ্ছে মেয়েটি।

নির্বাক দর্শক তিনি। দাঁড়িয়ে থাকেন ঠায়। বারে বারে প্রশ্ন জাগে—কে, কে, এই মেয়েটি ?

বিস্ময়, বিমুগ্ধা শচী দেবী। নয়ন ভরে শুধু দেখেন আর দেখেন।

গঙ্গায় কত লোকই ত স্নানে আসে। কই, কেউ ত এমন করে প্রণাম করে না তাকে। তবে এ মেয়েটি বা এমন করে কেন। ওঁকি চেনে আমাকে। তাইবা কেমন করে হয়। পাড়ায় কই অমন মেয়ে দেখিনি ত কাঁরো। তা'হলে ও আমায় চিনবে কেমন করে ? ওইত একটুখানি কচি বয়েস। সবে কৈশোর অতিক্রম করে আসছে ওর যৌবনের উষালগ্ন। আমাকে ত ওর জানার কথা নয়। ও আমায় চিনবে কেমন করে।

সহসা শচী দেবীর চিন্তাচ্ছন্ন মন কেমন যেন সজাগ হয়ে ওঠে। প্রভাতী সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে গঙ্গার জল। যেন এক রাশ সোনা গলিয়ে কেউ সদ্য ঢেলে দিচ্ছে গঙ্গায়। এতখানি বেলা হয় গিয়েছে। খেয়ালই নাই তার।

চটপট্ স্নান সেরে নেন শচীদেবী। স্মরণ করেন ইষ্টদেবকে। পূর্বাস্য হয়ে দিনমণির উদ্দেশ্যে করজোড়ে প্রণাম জানান। অবুণবরণ কশ্যপ নন্দনের কাছে সে প্রণাম পেঁ'ছে কিনা জানেন না শচী দেবী।

গঙ্গার পূত বারি ভরে নেন ঘটিতে। ধীরে ধীরে গঙ্গার সিঁড়ি বেয়ে ওঠেন। যতদূর সম্ভব দ্রুত হেঁটে চলেন গৃহাভিমুখে।

গৃহ-দেবতার পূজা করতে বসে কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যায়। ভুল হয় মন্ত্রোচ্চারণে। আচার-আচরণে ঘটে ত্রুটি। কেমন যেন তন্ময় হয়ে পড়েন শচী দেবী।

যতই ভুলতে চান, কিছুতেই ভুলতে পারেন না। বারে বারে ভেসে ওঠে সেই মুখটি। গঙ্গার ঘাটে দেখেছেন যাকে। কি অপূর্ব লাবণ্য। অমিয় প্রশান্তি ভরা মুখখানি। ভারি মিষ্টি, ভারি সুন্দর। কিছুতেই ভোলা যায় না সে মুখ।

গৃহকাজে প্রায়ই ব্যাঘাত ঘটে শচীদেবীর। এক ভাবেন করেন আর এক। সারা মন যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে মেয়েটি। কেন এমন হয়, নিজেই তিনি বুঝতে পারেন না।

গঙ্গার ঘাটে যেতে যেতে ভাবেন। আজকে আর কোনমতেই ছাড়ছি না। যেমন করেই হোক, পরিচয় ওর নেবই। কেন অমন করে ধরা দিয়েও পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। দাঁড়ায় না সামনে। একি তার লজ্জা না ভয়।

ওই, ওই ত আসছে।

কি অপূর্ব সুন্দর। সুস্নিগ্ধা। সুলক্ষণা। সুরেখায়িত ললাট। আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন। সুডৌল নাসিকা। সুমিষ্ট বিম্বোষ্ঠ। আলুলায়িত কুন্তল। আনিতম্ব বিস্তার। যেন চুইয়ে পড়ছে মুখ বেয়ে সোহাগ ধারা। অন্তরদ্বারে নবোদ্ভিন্ন দর্শন মুগ্ধ দুটি মঙ্গল কুম্ভ। অঙ্গের লাবণ্যে ঝলমল করছে লীলায়িত গতিছন্দ। যেন কার প্রতীক্ষায় উন্মুখ ও।

প্রস্তুত হন শচী দেবী নিজে। না, আজ আর কোন দ্বিধা নয়, দ্বন্দ্ব নয়। ছাড়বেন না কোনমতেই। নাম, ধাম, বংশ, গোত্র—সবই নেবেন জেনে।

ওঁকে দেখেই কেমন যেন মন্থর হলো গতি। মুখটাকে আরো একটু অবনত করে এগিয়ে আসছে মেয়েটি। হ্যাঁ, শচী দেবীর কাছেই ত আসছে।

দাঁড়িয়ে গেলেন উনি। নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করে দাঁড়ালেন।

কাছে এল ও। অবনত হয়ে প্রণাম করল। স্পর্শ করল ওঁর চরণ যুগল। যেন টাটকা তাজা দুটি পুষ্প। ফুলের মতই দুটি হাত। শুচিস্নাতা, শুদ্ধা বালিকা।

সঙ্গে সঙ্গে নুয়ে পড়ে হাত দুটি ধরে তুললেন শচী দেবী। টেনে নিলেন কোলের দিকে। গঙ্গাজল সিক্ত মাথায় হাত দিয়ে বললেন। মনের মত পতি হোক। চির এয়োস্ত্রী হও।

তারপর মুখে একটা চুমু খেয়ে, আরো ঘনিষ্ঠ করে টেনে নিলেন নিজের কাছে। দুটি চিবুকে হাত দিয়ে মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলেন—

মা, তোমার নাম কি ?

'প্রিয়া' বলে মা ডাকেন, ভাল নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।

বাঃ, ভারি সুন্দর নাম।

শচীদেবী আরো নিবিড় করে বুকের কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন—

তা তোমার বাবার নাম কি বাছা ?

আমি সনাতন মিশ্রের মেয়ে।

সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে যান শচীদেবী। অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে আসে—সনাতন মিশ্রের মেয়ে তুমি।

বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবীর বুকে মাথা রেখে সলজ্জ আঁখি মেলে তাকায় মুখের দিকে। দেখে শচী দেবী স্নেহ-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

দু'হাতে বেষ্টন করে শ্রদ্ধাভরে আঁকড়িয়ে ধরেন শচীদেবীকে বিষ্ণুপ্রিয়া। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন শচীদেবী—

তুমি ত মস্ত বড় ঘরের মেয়ে। তোমার বাবা রাজপণ্ডিত। আশীর্বাদ করি তুমি সুখী হও। ভাগ্যবতী হও। বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুরই প্রিয়া হওয়ার যোগ্য তুমি।

লজ্জায় এতটুকুন হয়ে যায় বিষ্ণুপ্রিয়া।

এই ত তার মনের কথা। এই মন্ত্রই ত জ্ঞানাবধি জপ করছে সে। অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য উজাড় করে এই বাসনাই ত জানায় তার অন্তর-দেবতার চরণে। এত-দিনের জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা সবই ত এই। তার অন্তরের কান্না কি শুনতে পান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ।

ভাবতে ভাবতে ভক্তিতে শ্রদ্ধাভরে আবার লুটিয়ে পড়ে শচী দেবীর শ্রীচরণে।

থাক্ থাক্ হয়েছে। আর প্রণাম করতে হবে না। এমন সুন্দর সুলক্ষণা ভক্তিমতী মেয়ের কৃষ্ণের মত পতি না হয়ে যায়। দেখো, তুমি সত্যি বিষ্ণুপ্রিয়া হবে মা।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ছোট্ট হৃদয়টি কেমন যেন ভরে উঠে পরিতৃপ্তিতে। প্রশান্তিতে হয়ে উঠে পরিপূর্ণ। নির্বাক চাহনি যেন আবেদন জানায়।

মাগো, আমাকে সেই অধিকার দাও। যোগ্য হওয়ার অধিকার। অর্ঘ্য-দানের অধিকার। তার চরণে নিজেকে সমর্পণ করার অধিকার। তুমি না কৃপা করলে আমার অভিলাষ যে পূর্ণ হবে না মা।

শচীদেবী মেয়ের ভাব-ভঙ্গী দেখে কেমন যেন নিজেকে নিজের মধ্যে হারিয়ে ফেলেন। অন্তর তাঁর মেয়েটির প্রতি হয়ে উঠে আকৃষ্ট। বিষাদাচ্ছন্ন হৃদয় তার ক্ষণকালের জন্য ভরে যায় প্রশান্তিতে। হাহাকারে বিদীর্ণ বক্ষে কে যেন মাখিয়ে দেয় শান্তির প্রলেপ।

কেমন যেন একটা আচ্ছন্নতা, আবৃত করে ফেলেছে তাঁর সারা দেহ। ক্ষণিকের জন্য জ্বালা যন্ত্রণা মুছে গেছে যেন। পরম পরিতৃপ্তিতে ভরে গেছে অন্তর। দুঃখ-দহন-দীর্ণ হৃদয়টা তাঁর এক অনাস্বাদিত আঘ্রাণে যেন মঙ মঙ করে উঠছে। বহুদিন পরে একটা পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর বুক থেকে।

সহসা সচেতন হয়ে দেখেন—বিষ্ণুপ্রিয়া সামনে নেই। কখন যেন চলে গেছে সে।

কখন গেল। কই কোন কথা বলে গেল না ত।

পরক্ষণে আবার ভাবেন, হয়ত বলেছিল। শুনতে পাননি তিনি। নিমগ্ন ছিলেন আপন ভাবে। তা না হলে অমন সুন্দর সোনার প্রতিমার মত মেয়ে। সে কি কখনো না বলে যেতে পারে। বৃথাই ভাবছেন তিনি। এমন কখনো হতে পারে না।

সব চিন্তা ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে চললেন গৃহাভিমুখে শচীদেবী।

ঘরে ফিরে কেমন যেন তাঁর ভাবান্তর ঘটল। গৃহকাজ সেরে, গৃহদেবতার ভোগরাগ দেখিয়ে একটু অবসর পেয়ে বসে পড়েছেন ভিতরের দালানটায়। নিমাই তখনো ফিরেনি টোলের অধ্যাপনা সেরে।

শচীদেবীর কেমন যেন ভাবান্তর ঘটেছে। তিনি ভাবছেন, তাও কি কখন সম্ভব। কি আছে তাঁর। নিতান্ত দরিদ্র সে, সনাতন রাজপণ্ডিত। কত খ্যাতি-প্রতিপত্তি তাঁর, সে কেন দেবে তার স্বর্ণ-প্রতিমাকে এ দরিদ্রের ঘরে। কি আছে তাঁর। নিঃস্ব রিক্ত তিনি। এ-যে বামন হয়ে চাঁদকে ধরতে হাত বাড়িয়েছেন তাও কি কখন সম্ভব।

না না, কখনো এ অসম্ভব সম্ভব হতে পারেনা।

বুকটা হাহাকার করে ওঠে শচীদেবীর।

মা, কই গো, আমি এসেছি।

ধড়মড় করে ওঠে পড়েন তিনি। বেরিয়ে আসেন বাইরের দালানে। দেখেন নিমাইকে। টোলের অধ্যাপনা সেরে ফিরে এসেছে সে।

কই গো, তুমি আমায় খেতে দাও। আমি গঙ্গায় স্নান সেরে এসেছি।

তা আসতে এত বেলা করলি কেন? একটু তাড়াতাড়ি ত ফিরতে হয়। পেটে যে পিত্ত পড়ে গেল, খাওয়া-দাওয়ার কথা সব কি ভুলে গেলি?

বলতে বলতে নিমাইয়ের হাত থেকে ধরে নিলেন পুঁথির দপ্তর। মুখে বললেন—কাপড় ছেড়ে আয়, আমি ভাত বাড়ছি।

তুমি তাড়াতাড়ি দাও মা। আমি এই এলাম বলে।

হ্যাঁরে, পাগল ছেলে। বাড়া আমার হয়েই আছে, এলেই খেতে দেব।

তাই দাও মা, আমি আসছি।

খেতে বসে নিমাই কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ে। কি যে খাচ্ছে তার কোন খেয়ালই থাকে না। শচী দেবী বসে আছেন সামনে। নিমাইয়ের ভাব দেখে বলেন—কিরে, কি অত ভাবছিস তুই। খাচ্ছিস না কেন। খা।

এইত খাচ্ছি মা। ভারি সুন্দর রান্না করেছ তুমি।

তা তুই খাচ্ছিস কোথা। সব ত পড়ে রয়েছে দেখছি। মুকুন্দ লাউ এনেছিল। তুই দুধে লাউ খেতে ভালবাসিস্। তাই রেঁধেছি। খেয়ে দেখ, কেমন হয়েছে।

এবার সচেতন হয়ে নিমাই বলে—ও, তাই নাকি! মুকুন্দ দিয়ে গেছে বুঝি। তা খাচ্ছি মা! ওটা শেষেই খাব। আগে তোমার এই শাকের তরকারিটা খেয়ে নিই।

আচ্ছা তাই খা। যেমন তোর অভিরুচি। তবে খাবার সময় মন দিয়ে খাবি। অত কি সব ভাবিস্! তোকে আনমনা দেখলে আমি যে চিন্তায় বাঁচি না! মাকে কি অত কষ্ট দিতে আছে খোকা। তুইত সব বুঝিস্। তবে অত কষ্ট দিস কেন?

কি যে বল তুমি মা! আমি কিছুই বুঝতে পারি না। ওসব কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

নিমাই মুখে বললো বটে শচী দেবী কিন্তু বুঝতে পারেন ছেলের ভাবান্তরের কারণ লক্ষ্মীপ্রিয়া যে দিন থেকে চলে গেছে। সেদিন থেকে গৃহ তার শূন্য একটা দুঃখের পাহাড় যেন চেপে বসেছে মিশ্র-ভবনে। সব যেন কেমন শূন্য, রিক্ত শ্রীহীন এ ঘর সংসার, কোন কিছুই ভাল লাগে না তাঁর। মন বসে না গৃহে থাকতে।

ছেলেকে তিনি বুঝেন! ছেলের অন্তরের বেদনা উপলব্ধি করতে পারেন তিনি। মা তিনি কেন বুঝতে পারবেন না ছেলের অন্তর-বেদনা। লক্ষ্মী-বিহনে লক্ষ্মীপতি চঞ্চল ত হবেনই। সারা হৃদয় জুড়ে লক্ষ্মী যে বিরাজ করছে। শচী দেবী ত জানেন, কত ভালবাসত ছেলে লক্ষ্মীকে। সে ত স্বয়ং লক্ষ্মী রূপেই এসেছিল মিশ্রভবনে! লক্ষ্মী হারানোর ব্যথায় বুকটা তাঁর টনটন করে ওঠে। বুক ফেটে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস।

ততক্ষণে নিমাই উঠে পড়েছে খেয়ে। মুখ ধুয়ে বললে—কই গো মা, পান কই?

ওই ত বাটাতেই রয়েছে সাজা একটু কষ্ট করে নিয়ে নে বাবা।

হ্যাঁ হ্যা মা, তাই নিচ্ছি। তুমি চটপট খেয়ে নাও! বসে থেকো না। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

আমি যাচ্ছি আমার জন্য তোকে অত ভাবতে হবে না। তুই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়! বিছানা পাতাই আছে।

নিমাই পানটা মুখে পুরে চলে গেল শুতে।

খেতে বসলেন শচীদেবী! ভাত যেন তাঁর মুখে উঠে না। ছেলেকে

কি সান্ত্বনা দেবেন তিনি। অহরহঃ দুঃখের দহনে তিনি ত নিজেই জ্বলে পুড়ে মরছেন। তিনি নিজেই কি ভুলতে পারছেন লক্ষ্মী হারানোর ব্যথা। যতই ভুলতে চান সে মুখ, বারে বারে উঁকি মাবে হৃদয়ে। ভেসে উঠে সেই সুন্দর মায়াময় মুখটি।

আহার যেন তার কাছে বেস্বাদ মনে হয়। আহারের কাছে লক্ষ্মী নাই। তিনি কেমন করে তুলবেন মুখে গ্রাস। নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে ঝরে পড়ে দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু। হাহাকার করে ওঠে হৃদয়টা।

খাওয়া হয় না শচী দেবীর। যাই হোক দু'টো মুখে দিয়ে উঠে পড়েন।

কাকেই বা জানাবেন মনের ব্যথা। কেই বা জানবে তাঁর এই মর্ম-যন্ত্রণা। এ ব্যথা যে কাউকে জানান যায় না। জানাতে তিনি পাবেন না। সে স্বভাব তাঁর নয়। অমনিতেই তিনি শান্ত, সমাহিত। কথা খুব কমই বলেন। বেঁটে ছোট খাট মানুষ শচীদেবী। মনের অভিব্যক্তি মনেই রাখেন চেপে। অতএব মনেব মধ্যে বেদনার হিমালয় হয়ে উঠে পুঞ্জীভৃত।

বিষ্ণুর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করলো বিষ্ণুপ্রিয়া। কি অর্থে আত্মনির্ভরতা। এ না হলে আত্মসমর্পণ করবে কেমন করে।

সে ত মনের অজান্তেই তার দেহ মন সব সঁপে দিয়েছে নিমাইকে। সে নিমাই ছাড়া আর কাউকে ভাবতে পাবে না।

সে কি আজ!

শৈশবে যে দিন দেখেছে গঙ্গায় সাঁতার কাটতে ওকে। জল ছোঁড়া-ছুঁড়ি করতে। কেউ পেরে উঠত না ওর সঙ্গে জল যুদ্ধে। ডুব সাঁতার দিয়ে চলে যেত গঙ্গার মাঝ বরাবর। গঙ্গার প্রচণ্ড স্রোতকে গ্রাহ্যই করত না। কি দুরন্ত দুষ্টু।

স্নান সেরে গঙ্গার তীরে পুজো করলেই ও আসত। চোখ মুদে নিবেদন করার সময় অলক্ষিতে কোথা থেকে হাজির হত ও। কলা বাতাসা ছোঁ মেরে নিয়ে ডুবে যেত জলের মধ্যে।

চোখ খুলে কাউকে দেখতে পেত না বিষ্ণুপ্রিয়া। কপট রাগে আর বিরক্তিতে কেমন যেন ক্ষেপে উঠত। তখন দুষ্টের শিরোমণি হাসতে হাসতে কাছে এসে বলত—মিছেমিছি রাগ করছ কেন। ও পুজোত তুমি আমাকেই নিবেদন করলে। এখন তবে খেতে রাগ করছ কেন? আমি কি তোমার মনের কথা শুনতে পাইনি ভেবেছ।

লজ্জায় সংকোচে এতটুকু হয়ে যেত বিষ্ণুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়ে যেত গৃহাভিমুখে।

বিষ্ণুমন্দিরে পুজোয় বসে চোখ মুদলেই মানসপটে ভেসে উঠত কৃষ্ণচ্ছায়া। কৃষ্ণতনু। পীতবাস পরিহিত মোহন বেণু হাতে নওল কিশোর। কণ্ঠে কদম্বের মালা। মস্তকে শিখিপুচ্ছ। চরণে নূপুর। আহা কি নয়ন ভোলান রূপ। চোখ ফেরাতে পারত না প্রিয়া।

তাকিয়ে থাকত অপলক নয়নে। সহসা কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যেত। প্রিয়ার মানসপটে ফুটে উঠত ওই নিমাই-এর প্রতিচ্ছবি। মোহন বাঁশী হাতে ধরে দুষ্টু হাসি হাসছে। প্রিয়া যেন স্পষ্ট দেখতে পেত।

শৈশবের খেলার সাথীর মত প্রিয়া ত ওকেই নিয়েছিল আপন করে।

শৈশবের খেলা ঘরে এলো কৈশোর। প্রিয়া এখন কিশোরী।

সে ত শুধু কিশোরী নয়। কৃষ্ণ-কিশোরী।

ধীরে ধীরে দেহ-মনে ঘটে পরিবর্তন। বসে থাকে আপন মনে। দেখে গৌরকান্তি। তার আবাল্যের আরাধ্য দেবতা যেন ধারণ করেছেন গৌররূপ। মালা গাঁথে গোপনে। সে মালা পরিয়ে দেয় গৃহের বিষ্ণু বিগ্রহের গলদেশে। আকুল আকুতির কুসুম ফুটে উঠে হৃদয়-বৃন্তে। দু'চোখ বেয়ে নামে অশ্রুধারা। জলে ভেজা ঝাপসা দৃষ্টিতে কৃষ্ণ তনুর পরিবর্তে দেখে গোরা তনু। একান্তে প্রিয় প্রার্থনা করে গোরা-প্রেম, গোরা প্রীতি।

একদিন কৈশোরও বিদায় নেয়। শঙ্খধ্বনি করে ঘোষণা করে যৌবনের উষালগ্ন। প্রিয়া হয়ে উঠে ব্যাকুলা। শুনতে পায় তার যৌবন তীর্থে তীর্থ-পতির মৃদুমন্দ পদধ্বনি। আশৈশব সে কৃষ্ণকিশোরকে বন্দনা করতে গিয়ে দেখেছে শ্যামসুন্দরের গৌর মূর্তি, আজ যৌবন-মন্দিরে বন্দিত তারই অপরূপ মোহন মূর্তি।

ব্যাকুল হৃদয়ে প্রিয়া প্রার্থনা জানায়—

তবে তুমি কি আমার আশৈশবের আরাধিত দেবতার নবকলেবর। ওগো, তোমার চরণেই আমার দেহ মন উৎসর্গ করলাম। তুমি আমাকে বঞ্চিত করো না। করো না উপেক্ষা। আমি যে একান্ত তোমারই গো।

আজ বুঝি প্রিয়ার প্রাণের সে কান্না পৌঁচেছে আপন জনের কর্ণকুহরে।

প্রিয়া এখনো যেন শুনতে পাচ্ছে সেই কণ্ঠস্বর।

'তুমি চির এয়োস্ত্রী হও মা। বিষ্ণু-প্রিয়া হও।'

কি মধুর অমিয় মাখা স্বর। যেন কানের কাছে অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে। কি স্নেহ, কি কোমল মিষ্ট সম্ভাষণ। ভাবতে ভাবতে চোখ দু'টি বুজে আসে

প্রিয়ার। যেন শচী দেবী তার হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার দিয়েছেন খুলে। আজ যেন স্তব্ধ হৃদয় সমুদ্র হয়ে উঠেছে তরঙ্গায়িত শচীদেবীর বুকের উষ্ণ স্পর্শ আজ তাকে করে তুলেছে অস্থির। উচাটন দেহ-মন তার।

একি আশিস বাণী, না আশ্বাস বাণী—তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া হও।

বিষ্ণু-প্রিয়া, হও জন্ম এয়োস্ত্রী

বার বার অনুরণিত হয়ে ওঠে হৃদয়-তন্ত্রীতে। প্রিয়া কিছুতেই ভুলতে পারে না শচী দেবীর কথা, তনু মন প্রাণ সর্বত্র যেন এই কথা বার বার তুলছে প্রতিধ্বনি।

পরক্ষণে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে প্রিয়া

কিন্তু কি নিয়ে যাবে তার হৃদয়-দেবতার কাছে কি আছে তার কি দিয়ে সাজাবে সেই বিশ্ব-সম্রাটকে

না-না, সঞ্চিত আমার কিছুই নাই সামান্য যেটুকু আছে, সে তপ, জপ আর তিতিক্ষা তাতে কি তিনি তুষ্ট হবেন। আর জপ দিয়ে চাইব কি তোমাকে অন্তরে তিতিক্ষায় আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করে রইব তোমার পথ চেয়ে। তাহলে তুমি কি আসবে না, দাঁড়াবে না আমার সমুখে। তোমার নাম করতে করতে, তোমাকে ব্যাকুল হয়ে ডেকে কান্নায় দেব বক্ষ ভাসিয়ে তবু কি দেখা পাব না তোমার তুমি কি সাড়া দেবে না আমার ডাকে?

বিষ্ণুপ্রিয়া একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠে। একটা আনন্দ এই অস্থিরতার মধ্যে ফুটে উঠে চোখে মুখে, যেন নিজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে প্রিয়া

সহসা বিষ্ণু-বিগ্রহের চরণে তার ল আবেগে সমর্পণ করে নিজেকে

॥ দুই ॥

কান্না আর কান্না।

কান্না দিয়েই জীবনের সুরু আর কান্না দিয়েই জীবনের শেষ।

কাঁদতে কাঁদতেই মানুষ আসে পৃথিবীতে। আবার প্রিয়জনকে কাঁদিয়ে সে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে। এর বুঝি শেষ নেই। সীমা নেই। অসীম অনন্তের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায় মানুষ। কেউ খুঁজে পায় না। কোথায় যায় সে।

এই খোঁজার অন্ত নেই। যে দিন থেকে তার জ্ঞান হয়েছে। যে দিন থেকে সে নিজেকে বুঝতে শিখেছে। সে দিন থেকেই আরম্ভ হয়েছে তার খোঁজা। আজো সে খুঁজছে। খুঁজে চলেছে—মৃত্যুর পরে মানুষ কোথায় যায়?

শচীদেবী আর নিজে ধরতে পারেন না হৃদয় তাঁর আজ বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মত হাহাকার করে শুধু কাঁদছে।

এ কান্নার কি শেষ নেই। কাঁদার জন্যই কি তার জন্ম। বিধাতা পুরুষ কি তার ভাগ্যে একটুও সুখ লেখেননি? সুখের আলো কি জীবনে তিনি একটুও দেখতে পাবেন না।

ধৈর্য তিতিক্ষার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে শচীদেবীর আর তিনি পারছেন না নিজেকে ধরে রাখতে। কিছুতেই বাঁধ মানছে না চোখের জল। অবিরল ধারায় শুধু কাঁদছেন আর কাঁদছেন।

বিগত বিস্মৃত জীবনের পরিচ্ছেদটি যেন খুলে দিয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া। চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠছে। আকুল শচীদেবী আর তিনি কিছুতেই পারছেন না নিজেকে ধরে রাখতে। ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন প্রিয়াকে। যেন কত আপন মনে হয় ওকে বিষ্ণুপ্রিয়াই পারবে মুছিয়ে দিতে জীবনের সব দুঃখ। সব বেদনা। যেন ওর মধ্যে তিনি পেয়েছেন বাঁচার প্রতিশ্রুতি।

কেন এমন হলো শচীদেবীর?

হয়। এমনিই হয়। প্রিয়জনকে কাছে পেলে উথলে উঠে দুঃখের সমুদ্র। হৃদয়ের বেদনার অগ্নি প্রিয়জনের উষ্ণতাপে উথলে উঠে হৃদয়কে তোলপাড় করে। ইচ্ছে করে বুকের সব দুঃখ, সব বেদনা উজাড় করে, নিঃশেষ করে গচ্ছিত রাখি প্রিয়জনের কাছে।

দুঃখ আর কান্নার কি শেষ আছে শচীদেবীর।

যৌবনে একের পর এক আটটি কন্যা এলো শচীদেবীর কোলে। কত আশা, কত আনন্দ—বুকের স্তন দিয়ে মানুষ করবেন তাদের। কিন্তু হায়! কোথায় নিবে গেল সে আশার আলো। নিষ্ফল হলো সবই। কোন অন্তহীন গহন আঁধারে হারিয়ে গেল সব। কোরকেই শুকিয়ে গেল একে একে আটটি বৃন্ত। ফুল আর ফুটল না। অকালেই ঝরে গেল সব।

আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলেন শচীদেবী। সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই মুখে। নষ্ট গর্ভা তিনি। এমন দুর্ভাগ্য, সংসারে কারই বা হয়।

সকলেই বলাবলি করতে লাগল, অপয়া মিশ্র-গৃহিণী। তা না হলে কখনো এমন হয়। পর পর আটটা কন্যা প্রসব করল, তার একটাও বাঁচল না গো।

নীরব কান্নায় শুধু বুক ভাসান শচীদেবী। নিজের ভাগ্যকে শুধু ধিক্কার দেন নিজেই। সত্যি ত, কি বলে সান্ত্বনা দিবেন তিনি মনকে। এ ব্যথা, বড় ব্যথা। কি করে বুঝবে অন্য জনে। শুধু হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস।

জগন্নাথ মিশ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত। তিনি কিন্তু ভেঙ্গে পড়েননি শচীদেবীর মত। দুঃখ পেয়েছেন। কেঁদেছেন নীরবে। মুছেছেন চোখের জল। তাই বলে অতখানি আকুল হয়ে পড়েন নি।

যত বড় পণ্ডিতই হোন কাঁদতে ত হবেই। কারণ, মায়াবদ্ধ জীব তিনি। পরক্ষণেই অবশ্য হয়ে উঠেছেন সচেতন। ভেবেছেন, এতো ঈশ্বরের দান, দিয়েছিলেন তিনি, আবার তিনিই নিয়েছেন ফিরিয়ে! সুখেও তিনি, আবার দুঃখেও তিনি। সুখের মধ্যেও তাঁর প্রকাশ, আবার দুঃখের মধ্যেও তিনি বিরাজমান। প্রার্থনা করেন পরমপিতার কাছে—হে প্রভু, তুমি আমাকে সুখে কর বিগতস্পৃহ, আর দুঃখের মাঝে নিরুদ্বিগ্ন হতে শক্তি দাও হৃদয়ে।

তবুও এই পাণ্ডিত্যের আবরণেও ঢেকে রাখতে পারেন না নিজেকে। মাঝে মাঝে ঘটে চিত্ত বিভ্রম। বুকের পাঁজর ঠেলে নামে কান্নার ঢল। তখন জগন্নাথ মিশ্র নিজেকে পারেন না সামলিয়ে রাখতে। আরাধ্য দেবতা রঘুনাথ বিগ্রহকে বুকের মধ্যে ধরেন জাপটে জড়িয়ে। চোখের জলে সিক্ত করেন রঘুনাথের চরণ যুগল। আকুল মিনতি জানান মিশ্র—

প্রভু, আমায় আর কত দুঃখ দেবে। কত পরীক্ষা করবে। হে রঘুনাথ, আমায় কত কাঁদাবে তুমি।

অবশেষে জগন্নাথের কান্নায় বুঝি বিগলিত হলো রঘুনাথের হৃদয়। মুখ তুলে তাকালেন তিনি। শচীদেবীর কোলে এল বিশ্বরূপ। ভাবলেন এত-দিনে হয়ত প্রভু কৃপা করলেন তাঁকে। হয়ত এই নবম গর্ভের সন্তান ঘুচিয়ে

দেবে তাঁদের সব দুঃখ কষ্ট। পরম স্নেহ ভরে শচীদেবী বুকে তুলে নিলেন বিশ্বরূপকে।

কি বুক জুড়ানো মনোহর কান্তি। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে। শৈশবেই সকলের হৃদয় হরণ করলো বিশ্বরূপ। তার জ্ঞানের গরিমায় সে নবদ্বীপের সকলেরই হলো প্রিয়জন। শৈশব থেকেই ধর্মকর্ম নিয়ে মেতে উঠল বিশ্বরূপ। সারাদিন তার কাটে চতুষ্পাঠী, টোল, আর শাস্ত্র কীর্তনে।

বিশ্বরূপ এসেছে অগ্রদূত হয়ে। এসেছে সে জমি প্রস্তুত করতে। জমি প্রস্তুত না হলে তাতে বীজ বপন হবে কেমন করে। মিশ্রভবনের উর্বর জমিতে চাই চাষ করার উপযুক্ত ভূমিকর্ষক। ভাল চাষ না হলে বীজ ত বোনা যাবেনা।

কি জানি হয়ত বিশ্বরূপ এসেছে পথ পরিষ্কার করতে। দুদিন পরে আসছেন পথের রাজা। তাইত এই পথ-মার্জন। নিকিয়ে সাফ করছে পথের ধুলো বালি। পথে পথে ঘোষণা করছে অনাগত দিনের বাণী।

কিন্তু বিশ্বরূপ কেন এত উন্মনা। কেন এত উদাসীন। মন বসে না তার ঘরে। বিষয়-আশয়, টাকা-কড়ি—কোন কিছুতে নেই আসক্তি। সে যেন কত ব্যস্ত। সংসারে বুঝি তার সময় নাই। সে যেন কান পেতে শুনে অনাগত ধ্বনি। বেণুর নিঃস্বন। ওই সে আসছে। শোনা যায় তাঁরই পদধ্বনি। বিশ্বরূপ তাই কি এত ব্যস্ত!

এদিকে কমলাক্ষও কাঁদছেন। তীর্থ থেকে ফিরে আকুল হয়ে শুধু কাঁদছেন। থামে না তাঁর কান্না। ঘুম নাই চোখে। দেশে ধর্মের নামে একি চলছে ব্যভিচার। বিষয় বাসনে উন্মত্ত হয়ে ধনীদের অত্যাচারে জর্জরিত দেশ। চন্ডাল, মুচি, মেথর ছোট জাত বলে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত। পান্ডিত্যের দম্ভে পন্ডিতেরা হয়ে উঠেছেন দাম্ভিক। দিনে দিনে ছাড়িয়ে যাচ্ছে দম্ভেরও সীমা।

কমলাক্ষ দীক্ষা নিয়েছেন মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে। চাই মনুষ্য জীবনের মহত্তম বিকাশ। আসুরী বৃত্তি থেকে চাই দৈবী সম্পদ। দম্ভ, প্রতাপ ঐশ্বর্য থেকে করুণা, ক্ষমা ও প্রেম। পূজা নয়, অনুষ্ঠান নয়, ভয়ে কোন শাস্ত্রের বিধানকে অনুসরণ নয়। শুধু চাই নামে রুচি। আচন্ডাল সকলেই হবে দেবজীবনের অধিকারী।

তাইত কমলাক্ষের এত কান্না। এত কাতরতা। শ্যামসুন্দরকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে আর্তনাদে ভেঙ্গে পড়ছেন কমলাক্ষ। প্রভু তুমি এসো। আর কাল হরণ করো না। চারিদিকে বড় দুর্দিন।

মানুষ ভুলে গেছে দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা। একি হলো প্রভু। মানুষ এত নিষ্ঠুর হলো কেন? কারো হৃদয়ে নেই প্রেম, নেই সাধন ভজন, তপ ও তিতিক্ষা।

অবিশ্বাস। চারিদিকে শুধু অবিশ্বাসের দুস্তর ব্যবধান। মানুষ পারছে না মানুষকে বিশ্বাস করতে। অবিশ্বাসের চোরা বালিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুণছে প্রহর। মানুষ নেমে যাচ্ছে পশুর পর্যায়ে। হে অনন্ত করুণাময় প্রভু, তুমি এই দুর্দিনের ঘনান্ধকার রাত্রিতে এসো আশার আলোক বর্তিকা হাতে। তুমি না এলে কে তাদের পথ দেখাবে। কে ত্রাণ করবে এই কলঙ্কিত জীব-জগতকে।

কমলাক্ষের সে কি আকুল কান্না শ্যামসুন্দরের পদপ্রান্তে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে আবেগ-মথিত কণ্ঠে বলেন—কেন, কেন নৈয়ায়িকগণ তোমার অস্তিত্বে আজ সন্দিহান? বৈদান্তিকগণ বলছেন—সোঽহম্—আমিই সেই। তার্কিকদের ভাষায় তুমি ত অপ্রকাশ। তোমাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে তারা। তুমি নেই। প্রভু, আমি যে আর পারছি না।

চীৎকার করে কমলাক্ষ অজ্ঞান হয়ে পড়েন শ্যামসুন্দরের পদতলে।

পরক্ষণে মূর্চ্ছাভঙ্গে, আবার কেঁদে ওঠেন চীৎকার করে।

প্রভু, ওরা আজ জ্ঞানের দম্ভে উপেক্ষা করছে তোমার প্রেমকে। ওরা ভুলে গেছে আত্মজ্ঞানের কথা। ভক্তি ওরা জানে না। প্রভু তুমিই ত বলেছিলে—

ভক্তিরই ভগবান। ভক্তের হৃদয়ে তোমার অধিষ্ঠান। বলো বলো না প্রভু, তুমি কি আসবে না? এখনো কি তোমার আসার সময় হয়নি?

হে শ্যামসুন্দর, মদনমোহন, তুমি কৃপা কর।

কমলাক্ষের কান্নায় পাষাণ হৃদয়ও হয় বিগলিত। তবু থামে না তার এই হৃদয় বিদারক কান্না। তাঁর কান্নায় মূর্ত হয়ে উঠে সমকালীন সমাজ-জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তিনি আর্তনাদ করে বলেন—

প্রভু, চারিদিকে তান্ত্রিকতার নামে একি জঘন্য ব্যভিচার। পশ্বাচারে মেতে উঠেছে জীব। বীরাচারের নামে চলছে যৌনাচার। 'পঞ্চমকারের'র নামে একি যৌন ব্যভিচার। ওরা একি বলছে প্রভু, যার মুখে মদ মাংসের গন্ধ নাই, তাকে করতে হবে প্রায়শ্চিত্ত। পশুর অধম সে, ওরা উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করে বলছে—

আমিষাসব-সৌরভহীনং যস্য মুখং ভবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তী স বর্জ্জ্যশ্চ পশুরেব ন সংশয়॥

—কুলার্ণবতন্ত্র

প্রভু, তুমি এখনো কেন নিশ্চল পাষাণ হয়ে আছ। বলো না, তুমি কি শুধু পাষাণ। তুমি কি শুনতে পাওনি আমার করুণ ক্রন্দন। তোমার হৃদয় কি ভক্তের আকুল ক্রন্দনে বিগলিত হবে না? তুমি কি সাড়া দেবে না ভক্তের ডাকে।

এমন দুর্দিনেও কি তুমি আসবে না? তবে কি আমার সব আশা, সব বিশ্বাস মিথ্যা হবে প্রভু। তবে কেন, কেন তুমি বলেছিলে-

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থান অধর্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥

কমলাক্ষের আকুতি দেখে গুরু মাধবেন্দ্রের হৃদয় হলো দ্রবীভূত। তিনি শিষ্য কমলাক্ষকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

তাঁর আগমনের জন্য আমাদের প্রতীক্ষা করতে হবে বৎস এমনি আকুল হয়ে ডাকতে হবে তাঁকে। আসবেন, তিনি এই তোমাদের নদীয়াতেই আসবেন। অনন্ত সংহিতায় লেখা আছে সে আগমনের কথা—

'শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে গৌররূপে হইব অবতীর্ণ।'

গুরুদেবের কথা শুনে কমলাক্ষ আনন্দে উন্মাদ হলেন। নৃত্য করতে লাগলেন দু'বাহু তুলে। একটা অনন্ভূত আনন্দে তিনি হলেন আত্মহারা।

ডাকলেন বৈষ্ণবদের। প্রতিষ্ঠা করলেন বৈষ্ণব সভা নিত্য পাঠ চললো, গীতা আর ভাগবত। উন্মুখ হয়ে শুনেন বৈষ্ণবগণ।

এ কমলাক্ষ আর কেউ নন। অদ্বৈতাচার্য নিজেই। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তাঁর অন্তরের আকুলতা দিয়ে তিনি বলেন—

'না-না, শাস্ত্র-জ্ঞানেও নয়, কর্মেও নয়। চাই একমাত্র প্রেম আর ভক্তি। কেমন ভক্তি—অচলা ভক্তি। অনিমিত্তা ভক্তি। দেখছ না, দিনকে দিন জীব যে হয়ে পড়ছে ভক্তিহীন। শুধু তর্ক আর তর্ক। তর্কের দ্বারায় কি মেলে তর্কাতীতকে। চাই বিশ্বাস। চাই কৃষ্ণ নাম আর সংকীর্তন।

কিন্তু অদ্বৈতাচার্যের কথা কেউ শুনলো না। তারা পারলো না বিশ্বাস করতে। মনে মনে ব্যথিত হলেন আচার্যদেব। তিনি খুঁজতে লাগলেন পথ।

আকুলতাই তাঁকে বাৎলে দিল পথ।

আচার্যদেব সন্ধান পেলেন পথের। আসবেন, কলির পাবনাবতার। তার জন্য চাই স্মরণ, চিন্তন আর বন্দন।

গঙ্গাতীরে বাঁধলেন কুঁড়ে। আদিস্তানা করে প্রতিদিন একান্তে চললো

তাঁর অর্চনা। ডাক যখন তাঁর কেউ শুনলো না, ভেবে নিলেন—একলাই চলবেন পথ। হয়ত ভাগ্য ভাল হলে মিলে যাবে পথের সাথী।

নির্জন সাধন-কুঠিতে বন্দনায় রত আচার্যদেব।

এমন সময় কে একজন যুবক এসে আভূমি লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলো তাঁকে। দেখলেন দীর্ঘ সুন্দর সুপুরুষ যুবা। আজানুলম্বিত ভুজ। তেজপুঞ্জ সর্ব অবয়ব। দেখে আশ্চর্য হলেন আচার্যদেব।

এ যে দেখছি সর্বঅঙ্গে মহাপুরুষের লক্ষণ। এ কার আবির্ভাব হলো আমার সাধন-কুঠিতে। বিস্মিত আচার্যদেব জিজ্ঞেস করলেন যুবাকে—

কোথা থেকে আসছ তুমি?

নানা তীর্থ-দর্শন করতে করতে এসেছি এই শান্তিপুরে।

—তা আমার কাছে কেন এলে?

এসেছি আপনার নাম শুনে। শ্রীচরণ দর্শন করতে।

তোমার জাতি কি?

মুঞি ম্লেচ্ছধম। জাতিতে যবন।

আচার্যদেবের কেমন যেন ভাবান্তর ঘটল। তিনি ভাল করে দেখলেন যুবকটিকে। ভাবলেন মনে মনে, কে এই যুবক! যার সর্বঅঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছে বিদ্যুতের জ্যোতিঃ। নিশ্চয়ই সাধারণ বিবাগী এ নয়। কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এসেছে এই ঈশ্বর প্রেরিত যুবা।

তিনি বিস্মৃত হলেন জাতপাতের কথা। ব্রাহ্মণ হয়েও যুবককে স্থান দিলেন আপন বাড়ীতে। বললেন—

ইহা রহি করহ বিশ্রাম।
ধর্ম শাস্ত্র পড় সিদ্ধ হইব কাম॥

যুবক আশ্রয় নিল আচার্যদেবের বাড়ীতেই। একে একে পাঠ করলো সর্বশাস্ত্র। যুবকের বুদ্ধি আর মেধা দেখে ভারি খুশি হলেন আচার্যদেব। ভাবলেন মনে মনে—এই ত তিনি পেয়েছেন পথের সাথী। যা তিনি চান, তার পূর্বাভাগ দেখছেন তিনি যুবকের মুখে। তাই আশায় বুক বেঁধে একদিন বললেন—

ধর্ম প্রবর্তন হেতু লহ হরিনাম।
নাম ব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ॥

আচার্যদেবের কথা শুনে ভারি সন্তুষ্ট হলো যুবক। ভক্তি-বিনম্র চিত্তে কৃতাঞ্জলি বদ্ধ হয়ে বললে—

কৃপা করে তাই আমায় প্রদান করুন গুরুদেব। আমি প্রস্তুত।

তখন বিধিসম্মত ভাবে অদ্বৈত আচার্য—

"...তার মস্তকাদি মুণ্ডাইয়া।
তিলক তুলসী মালা দিলা পরাইয়া॥
কটিতে কোপীন ডোর দিলেন বান্ধিয়া।
হরিনাম দিলা প্রভু শক্তি সঞ্চারিয়া॥
গঙ্গার গহ্বরে পাঞা নাম চিন্তামণি।
প্রেমেতে মাতিলা শ্রীবৈষ্ণব চূড়ামণি॥"

—ঈশাননাগর

বৈষ্ণব করলেন যবনকে আচার্যদেব। যবন হলো আজ বৈষ্ণব চূড়ামণি। নাম—যবন হরিদাস। অদ্বৈতাচার্য তার নাম রাখলেন—ব্রহ্ম হরিদাস।

বৈষ্ণব হয়ে হরিদাস মেতে উঠলেন নাম-ব্রহ্মে। প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপ। গুরু-শিষ্য দুজনেই আজ একাত্ম। গুরু পাঠ করেন গীতার ভক্তি-যোগ। ব্রহ্ম হরিদাস নিবিষ্ট চিত্তে তাই শুনেন। হৃদয়ে তাঁর প্রবাহিত হয় ভক্তির মন্দাকিনী।

মাঝে মাঝে পূজান্তে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান জানিয়ে ছাড়েন হৃদয়-বিদারী হুংকার। সে হুংকারের প্রচণ্ডতায় বুঝি টলে উঠে স্বর্গে ভগবানের সিংহাসন।

ভাবছেন আর কাঁদছেন শচী দেবী। দুগণ্ড বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুর নির্ঝরিণী।

১৪০৬ শকাব্দ। শেষ হয়ে আসছে মাঘের ক'টা দিন।

সহসা ঘটল একি অঘটন।

কৃষ্ণাবেশ হলো শচীদেবীর দেহে। অদ্ভুত সব লীলা-বিলাস। জগন্নাথ মিশ্র আর শচী দেবী দুজনেই হলেন স্তম্ভিত। বিশ্বাস করতে পারলেন না পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র। তাই শচী দেবীকে নিভৃতে ডেকে বললেন—

—"শুনছো, আমি দেখলাম এক অদ্ভুত ব্যাপার।"

সাগ্রহে উদগ্রীব হয়ে বললেন শচী দেবী—কি দেখলে গো?

দেখলাম কি জান, স্বর্গ থেকে স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী নেমে এসে আশ্রয় নিয়েছেন তোমার অঙ্গে। তিনি অবস্থান করছেন আমাদের এই কুটীরেই। তোমাকে সবাই সম্ভ্রমে সম্মান করছে। কত ধন সম্পদ আর বহুমূল্য পরিচ্ছদ লোকে তোমাকে উপহার দিচ্ছে।

এসব কি দেখছি গো শচী রাণী?

স্বামীর কথা শুনে শচীদেবী আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বললেন—তুমি এই দেখলে। আর আমি কি দেখলাম জান ?

তুমিও দেখেছ, কি দেখেছো ?

আমি দেখলাম, স্বর্গ থেকে দেবতাবৃন্দ স্তুতি করছে

ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে শচীরাণীকে কোলের দিকে টেনে নিয়ে বললেন মিশ্র —তাহলে তুমিও দেখেছ ?

আরো কি দেখলাম জান, তোমায় বলতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এক জ্যোতির্ময় আলোক-রশ্মি ধীরে ধীরে প্রবেশ করলো আমার হৃদয়ে। তারপর জানো—তোমাকে বলতে আমার ভীষণ ভয় করছে গো। সেই আলোকচ্ছটা স্পর্শ করলো তোমাকে। আমার কি মনে হচ্ছে জানো ?

কি মনে হচ্ছে ?

কোন মহাপুরুষ বুঝি আসছেন তাই তাঁর আগমন সংকেত বুঝি শুনেছি আমরা। হয়ত তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার এ হলো পূর্ব-লগ্ন !

ভক্তিপ্লুত দুজনেরই অন্তর। দুজনেই পরম ভক্তিভরে রঘুনাথের সেবা পূজো করে চলেন নিষ্ঠা সহকারে

এ দিকে ঘটল আর এক আশ্চর্য ঘটনা।

শ্রীকৃষ্ণকে অর্চনা করে তুলসী আর গঙ্গাজল অদ্বৈতাচার্য নিক্ষেপ করলেন গঙ্গায়। সেই তুলসী পত্র ভেসে চললো গঙ্গার উজান বেয়ে। দেখে বিস্মিত হলেন আচার্যদেব। চুপি চুপি ডাকলেন হরিদাসকে।

অঙ্গুলি নির্দেশ করে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখালেন তারপর—

কৃষ্ণকৃপা মানি ধাঞা চলে তার সাথ।
হরিনাম স্মরি হরিদাস পিছে ধায় ॥

—ঈশাননাগর পৃঃ ১০৬।

চলেছেন গঙ্গার তীরে তীরে দুজনে অতি সন্তর্পণে তুলসী পত্রও চলেছে উজানে অর্থাৎ স্রোতের বিপরীত মুখে। কারো মুখে কথা নাই। দুজনেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত।

কৌতূহলী দুজনেই। মাঝে মাঝে তাকান এ ওর মুখের দিকে। এ যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজেদের চোখকে

দেখলেন স্রোতে ভাসতে ভাসতে—"পুষ্পাঞ্জলি উপনীত হৈল নদীয়ায়।"

ঠিক এমনি সময় দেখলেন, একজন ছোট খর্বাকৃতি অথচ রূপ-লাবণ্যবতী দেবী আসছেন গঙ্গাস্নানে। দেবী প্রতিমার মত রূপ দেখে ওঁরা দুজনে একটু

আড়াল হলেন। দেখলেন সেই অপূর্ব প্রতিমা আঁখবীথি চঞ্চল চরণে নামছেন গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে। স্তব করছেন গঙ্গার। বুক অবধি জলে নেমে গেলেন সেই প্রতিমাময়ী নারী।

গাছের আড়াল থেকে অপলক নয়নে চেয়ে আছেন হরিদাস আর অদ্বৈত। কি আশ্চর্য, ওঁরা দেখলেন সেই তুলসী পত্র এসে লাগল স্নানরতা ঐ নারীর শ্রীঅঙ্গে। দুজনে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন এ ওর মুখের দিকে। কারো মুখ দিয়ে হলো না বাক্যস্ফুরণ।

মনে মনে বিচার করে আচার্য বললেন হরিদাসকে—

—এই গর্ভে "কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকট সম্ভবে।"

চুপি চুপি বলাবলি করলেন দুজনে। এতদিনে এতক্ষণে বুঝি সার্থক হলো ওঁদের এতদিনের কান্না আর কীর্তন, পূজন আর বন্দন। হৃদয়টা ওঁদের নেচে উঠল অপার আনন্দে।

মনের আনন্দ মনে চেপে রেখে দুজনে ফিরে এলেন শান্তিপুরে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলেন, কে এই নারী।

তারপর?

দেখতে দেখতে কেটে গেল ছ'মাস।

একদিন অদ্বৈত আচার্য এসে হাজির হলেন নবদ্বীপের মায়াপুরে। জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে

আচার্যদেবকে দেখতে পেয়ে জগন্নাথ আস্তে ব্যস্তে আগবাড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। আগে থেকেই চিনতেন জগন্নাথ আচার্যদেবকে। দুজনের মধ্যে যথেষ্ট সখ্যতা ছিল। তাছাড়া আচার্যদেবের কত নাম। অতবড় পণ্ডিত, অত খ্যাতি-প্রতিপত্তির অধিকারী যে মানুষ, তাঁকে নবদ্বীপের মানুষ চিনবে না কেন

সসম্ভ্রমে চরণের ধূলি নিয়ে আচার্যকে বসতে আসন দিলেন জগন্নাথ। মুখে বললেন—

"কি সৌভাগ্যবান আমি আপনার মত সর্বগুণধাম মহাপুরুষের পদধূলি পড়ল আমার বাড়ীতে। গরিবের কুঁড়ে পরিণত হলো তীর্থক্ষেত্রে।

ব্যস্ত হলেন শচীদেবী পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করলেন পিঁড়ি পেতে। ভক্তি-ভরে শচীদেবী আচার্যদেবের পদপ্রক্ষালনের জন্যে জল নিয়ে এলেন এগিয়ে।

শচীদেবীকে দেখে আচার্যদেব আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন সসম্ভ্রমে। দুটি নয়ন তাঁর অপূর্ব অনুরাগে রঞ্জিত। "বাষ্প-ছলছল আঁখি অরুণ বরুণ॥"—

লোচন দাস।

কাঁপছে থর থর করে তাঁর অধরোষ্ঠ। গদগদ কণ্ঠস্বর। যেন তিনি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছেন না। টলমল করে কাঁপছে সর্ব অবয়ব।

আচার্যদেব সেই অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে—

"শচী প্রদক্ষিণ করি করে পরনাম।"—চৈতন্যমঙ্গল।

চমকে উঠে শচীদেবী বললেন—

—এ কি করছেন আচার্যদেব। আপনি আমার গুরুজন। পূজনীয়।

আপনি আমায় মহাপাপে নিমজ্জিত করছেন। আপনার মত জ্ঞানিজন এমন অবিধান কার্য করছেন কেন?

"জগন্নাথ সসন্দেহ—শচী সবিস্মিতা।
কি কর কি কর বোলে হৃদয়ে দুঃখিতা"—চৈতন্যমঙ্গল

জগন্নাথ মিশ্রের মনে কেমন যেন সন্দেহ হলো। তিনি বিস্ময়ে শিউরে উঠে বললেন—

—এ কি করছেন আপনি? আপনার চরিত্র কিছুই বুঝতে পারছি না। বিধি বিধান বহির্ভূত একি ব্যবহার আপনার?

আপনার মত জ্ঞানী মহাজনের এ কর্ম করা কি সমীচীন হলো?

কেন এমন করছেন, দয়া করে আমায় খুলে বলুন। সন্দেহের দোলায় আমি উঠছি দুলে। দোহাই আপনার, আপনার দুটি পায়ে ধরে মিনতি করছি —সব খুলে বলুন। তা না হলে অহরহ চিন্তাগ্নিতে দগ্ধ হব।

জগন্নাথ মিশ্রের আকুতি দেখে বললেন আচার্যদেব—

" — — শুন মিশ্র পুরন্দর।
জানিবে সকল পাছে—কহিল উত্তর॥
—চৈতন্যমঙ্গল। লোচন দাস।

তারপর ভক্তি-বিনম্র হৃদয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে আচার্যদেব—

"সাত প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম।
না কিছু কহিলা গেল আপনার স্থান॥"
—চৈতন্যমঙ্গল। পৃঃ ৩৪।

হতচকিত মিশ্র-দম্পতি। লজ্জায় ক্ষোভে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন হেঁট মস্তকে। চিন্তিত জগন্নাথ পুরন্দর। আচার্যদেব ত সাধারণ মানুষ নন। নিশ্চয়ই কোন গূঢ়ার্থ আছে এর।

লজ্জাবনতা শচীদেবী তাকিয়ে আছেন স্বামীর দিকে। মুখে নেই বাক্যস্ফূর্তি।

জগন্নাথ বললেন—

"আমার কি মনে হয় জান রাণী, তুমি যে আশ্চর্য দর্শনের কথা বলছিলে, বোধ হয় আচার্যদেবও দেখেছেন সেই অলৌকিক দৃশ্য। উনি ও যোগী পুরুষ। আগম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাই আমার মনে হচ্ছে, আমাদের দর্শন বুঝি মিথ্যে হবে না।

'তুমি বলেছিলে না, তোমাকে সম্ভ্রমে সকলে সম্মান করছে?

শচীদেবী লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন।

ধীরে ধীরে গিয়ে প্রবেশ করলেন মন্দিরে।

গলবস্ত্র হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন গৃহদেবতা রঘুনাথের পাদপদ্মে।

॥ তিন ॥

নীলাম্বর চক্রবর্তী জামাতাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—

তুমি এত ভেবো না জগন্নাথ। আশংকার কোন কারণ নাই।

'কিন্তু বাবা এমন ত কোথাও হয়নি। ত্রয়োদশ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল। আর যে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।'

ম্লান চিন্তাচ্ছন্ন মুখে উত্তর দিলেন জগন্নাথ মিশ্র।

সেই ঈশ্বরাবেশ দর্শনের পর এক এক করে কেটে গেলো তেরোটি মাস। অন্তঃস্বত্ত্বা শচীদেবী। কিন্তু আজো কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো না। জগন্নাথ মিশ্র তাই চিন্তান্বিত।

নীলাম্বর চক্রবর্তী শুধু জগন্নাথ মিশ্রের শ্বশুর নন, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। সারা নদীয়া জুড়ে তাঁর নাম। তিনি গণনা করে বললেন—

মিথ্যে চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলে দাও। এ মাসের শেষের দিকে শচী এক শুভক্ষণে পুত্র সন্তান লাভ করবে। তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই।

শ্বশুরের কথা শুনে চমকে উঠলেন জগন্নাথ। তাহলে কি সত্যি তিনি আসছেন। আসছেন সেই বিশ্ব-সম্রাট, স্বর্গের সিংহাসন ছেড়ে তাঁর খড়ের কুঁড়েতে।

শচী রাণীও বাবার কথা শুনে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। শকাব্দ ১৪০৭ ফাল্গুনের শেষাশেষি। ২৩ তারিখ, শনিবার, পূর্ণিমা তিথি।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এল। কিন্তু পূর্ণিমাতে জ্যোৎস্নার আলো কই। রাহু গ্রাস করছে চন্দ্রকে। গ্রহণ লেগেছে চাঁদে। সন্ধ্যার প্রকৃতি তাই তমসাচ্ছন্ন।

মর্ত্যে আবির্ভাব হচ্ছে পূর্ণচন্দ্রের। তাই বুঝি মুখ লুকিয়েছেন চন্দ্র। কিংবা অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে সকলঙ্ক চন্দ্র বুঝি মুখ দেখাতে পারতে না লজ্জায়।

সহসা হরিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। নবদ্বীপে নাগরিক জীবন হয়ে উঠল প্রাণচঞ্চল। একটা প্রসন্নতা, একটা প্রশান্তি যেন সহসা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

নদীয়া উদয়গিরিতে শচীমাতার কোলে পূর্ণচন্দ্র রূপে উদিত হলেন শ্রীশ্রীগৌর হরি।

বিস্ময়ে নির্বাক শচী দেবী। তিনি যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, এত বড়। এ যে ভুবনমোহন মূর্তি। মানুষের ঘরে কি এও সম্ভব।

মিশ্র-ভবনে বেজে উঠল শঙ্খ। উলু ধ্বনিতে মুখর হল কুল-ললনারা। হরিধ্বনি আর শঙ্খধ্বনিতে ঘোষিত হলো প্রভুর আগমন বার্তা। এলেন পতিত পাবন জগৎ বন্ধু।

অদ্বৈতাচার্যের কান্না বুঝি সার্থক হলো। যবন হরিদাসের নাম জপ, কীর্তন, বন্দন আর বিষ্ণুসেবায় সন্তুষ্ট হয়ে বুঝি অবতীর্ণ হলেন নদীয়া-জীবন। ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়েছেন ভগবান। তাইত ভক্তাধীন ভক্তের মানসেই জন্ম নেন ভগবান

এবার পূর্ণ করবেন ভক্তবাঞ্ছা তাই ত তাঁর নাম ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু।

শান্তিপুরে সহসা অদ্বৈতাচার্য হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। হরিদাস বেরিয়ে এলেন বাইরে। তারপর দুজনে আরম্ভ করলেন নৃত্য। নাচছেন, দুজনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নেচে চলেছেন মাঝে মাঝে ছাড়ছেন হুঙ্কার।

কেন কিসের এত নৃত্য। কিসের এত হুঙ্কার।

এখনও ত ওঁরা জানেন না শচীদেবীর পুত্র সন্তান লাভের কথা। জানেন না প্রভুর আগমনের কথা। এখনওত, শান্তিপুরে পৌঁছোনি কোন সংবাদ। তবে ওঁরা এত নাচেন কেন? কেন ছাড়ছেন হুঙ্কার?

অদ্বৈতাচার্য ত শুধু পণ্ডিত নন, তিনি যোগী। যোগীজন হৃদয় ত দর্পণের মত তাতে ত সবই হয় প্রতিভাসিত। তাই ত ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা তাই ত ভগবান এসে অধিষ্ঠিত হয়েছেন হরিদাস আর অদ্বৈতাচার্যের হৃদয়ে।

সেই জন্যই এত নর্তন-কুর্দন ওঁদের। সেই জন্যই এত হুঙ্কার

অদ্বৈতাচার্য ডাক দিয়ে বললেন—

'ও হরিদাস, চাঁদে গ্রহণ লেগেছে। চল গঙ্গাস্নানে যাই। স্নান করে আসি।'

গঙ্গায় এসে দেখেন, যেন মেলা বসেছে সারা গঙ্গা লোকে লোকারণ্য। ছেলে মেয়ে বৃদ্ধ যুবা—স্নান করছে সকলেই। সকলের মনেই আনন্দ। জল ছোঁড়া-ছুঁড়ি করে, ডুব সাঁতার কেটে স্নান করছে সকলেই।

দেখলেন—গঙ্গা স্নানে এসেছেন চন্দ্রশেখর। এসেছে শ্রীরাম আর তার ভাইয়েরা সকলেই। সকলেই করছে হরি সংকীর্তন। গরিব দুঃখীদের দান করছে চালডাল, পয়সা-কড়ি।

ইঙ্গিত করে হরিদাসকে বললেন অদ্বৈতাচার্য—

সকলে এত আনন্দে উথলে উঠছে কেন? এ কিসের আনন্দ? এ কিসেরই বা সংকেত? কোন শুভ মুহূর্তের আভাস বলে মনে হচ্ছে, তাই না?

হরিদাস মাথা নত করে সমর্থন জানালেন আচার্যদেবকে। বললেন—তিনি আসেন বার্তা পাঠিয়েই। মানুষের হৃদ্‌-কেন্দ্রে ধরা পড়ে সে বার্তা।

সত্যি সত্যি কয়েক দিনের মধ্যেই সংবাদ এল শান্তিপুরে। শচীদেবী চন্দ্রগ্রহণের শুভ মুহূর্তে একটি সর্ব সুলক্ষণ পুত্র সন্তান লাভ করেছেন।

নেচে উঠল অদ্বৈতের হৃদয়। তিনি এসেছেন। ভক্তের ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছেন। আর ভয় নাই। এবার দূর হবে সমাজের বৈষম্য। উদ্ধার পাবে কলিহত জীব।

তাইত সাড়া পড়েছে দিকে দিকে। এত লোক ভিড় করে যাচ্ছে শিশুকে দর্শন করতে। মিশ্র-ভবন হয়ে উঠছে লোকে লোকারণ্য।

অদ্বৈতাচার্য গৃহিণী সীতাদেবীকে ডেকে বললেন—

—ওগো, তুমি ঘরে বসে থেকো না। যাও একবার নবদ্বীপে। দেখে এসো বাল-গোবিন্দকে। দেখে এসো বালগোপালের শ্রীমুখ। আর বিলম্ব করো না। যাও।

সীতাদেবী স্বামীর আদেশে চললেন নবদ্বীপে। নবজাতকের মুখ দর্শনের জন্য সঙ্গে নিলেন সোনায় বাঁধান কড়ি। নিলেন বকুল বীজ। পায়ের জন্য রৌপ্য নির্মিত পাশুলি আর স্বুবর্ণের অঙ্গদ ও কঙ্কন। বাহুতে পরানোর জন্যে শঙ্খরৌপ্য নির্মিত বাঁকমল। গলার জন্যে স্বর্ণমুদ্রার হার। আর স্বর্ণজড়িত ব্যাঘ্রনখ। কোমরের জন্য নিলেন পট্টসূত্রের তাগা। এ সবই মনের মত করে ভরে নিলেন পেটিকাতে।

শচীমাতার কথাও ভুলে যাননি সীতাদেবী, তাঁর জন্যে নিলেন রেশমী শাড়ী। পাড়যুক্ত রেশমের ভূমিপোতা চাদর। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লৌকিকতার জন্য কিছু কড়িও নিলেন সঙ্গে।

মিশ্র-ভবনে এসে পৌঁছতেই জগন্নাথ হয়ে উঠলেন আনন্দিত। পরম সমাদরে নিয়ে গেলেন বাড়ীর ভিতরে। হৈ-চৈ পড়ে গেল অন্দর মহলে।

বালকের মুখ দেখে সীতাদেবী হলেন মুগ্ধ। এ যে সাক্ষাৎ গোকুলের কানু গো। শুধু দেখছি রঙটাই ভিন্ন। ও রঙের ভেদে নেইত কোন বিভেদ। ভেদাভেদ সব মিলেই যে তিনি এক।

খুসি হয়ে আশীর্বাদ করলেন তিনি শিশুকে। বেঁচে থাক বাবা, দীর্ঘ-জীবী হও। মুখে বললেন—

শচী, তোর দু'টি সন্তানই রত্ন হবে। এরা দু'টিতেই দিগ্বিজয় করবে। বুঝলি তোর দুঃখ আর থাকবে না।

কিন্তু আমার বড্ড ভয় করে দিদি। আমার যে বড় দুঃখের কপাল। কান্নাই সম্বল। কাঁপা গলায় বললেন শচীদেবী!

ও মুখপুড়ী, তুই আশঙ্কা করছিস। ভাবছিস ডাকিনী-শাখিনীর কথা। ভর করবে অপদেবতা। পাছে শিশুর অনিষ্ট করবে তা, তোকে অত ভাবতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করেই এনেছি।

এই নে, গলায় ঝুলিয়ে দে বাঘনখ। বাহুতে পরিয়ে দে বাঁ কমল। আর ক'টি দেশে বেঁধে দে—

থাক্ থাক্, তুই পারবি না, আমায় দে। আমিই দিচ্ছি পরিয়ে। দেখবি বিপদ-আপদ সব যাবে কেটে। কিরে এবার হলো ত?

তোমার ভরসাতেই আমি ভরসা পাচ্ছি দিদি ভাগ্যিস তুমি এসে পড়েছ। নইলে আমার কি ভয়ই যে করছিল।

সীতাদেবী তখন শিশুকে কোলে নিয়ে আত্মহারা আর নদের বাল-গোপাল, তখন হাসছে খিল খিল করে সীতাদেবীর মুখের দিকে চেয়ে।

ছ'দিনের দিন বসেছে ষষ্ঠীর বাসর। পাড়াপ্রতিবেশী গণ্যমান্য ঘরের সব মেয়েরাই এসেছে ষষ্ঠী বাসরে। করা হয়েছে ষষ্ঠীর আদিস্তানা। সকলেই এনেছেন ষষ্ঠীর উপচার। যার যেমন সাধ্য। চাল-ডাল, পান-সুপারী, হলুদ আর টাকা-কড়ি!

ষষ্ঠী বাসরেই হবে শিশুর নাম করণ।

অন্তঃপুরে নারীদের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করছেন সীতাদেবী। আর বাইরে পুরুষদের প্রতিনিধি হয়েছেন শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তী। পুরুষরা সকলে একবাক্যে নীলাম্বরকেই মেনে নিয়েছেন। তিনি বিখ্যাত জ্যোতিষ। আর জগন্নাথ মিশ্রের শ্বশুর। সব দিক থেকেই যোগ্যতম জন

ষষ্ঠী বাসরে নারীদের মধ্যে উঠল নানা গুঞ্জন কেউ একমত হতে পারছেন না। শেষে সীতাদেবী বললেন—শিশুর নাম থাক 'নিমাই'।

শচীদেবীও সমর্থন করলেন এই নাম। নিমতলাতেই ত ভূমিষ্ঠ হয়েছে শিশু। মনে মনে শচীদেবী তাই এই নামই ঠিক করে রেখেছিলেন।

তা নয়, তিতো ভেবে যম একে ছুঁইবে না,

ইহান অনেক পুত্র কন্যা নাই।

শেষ যে জন্ময়ে তার নাম যে নিমাই॥ (চৈতন্যভাগবত)

সীতাদেবী এমনি ব্যাখ্যা করে শুনালেন সকলকে। সীতাদেবীর ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট হলো সকলেই।

কিন্তু নীলাম্বর চক্রবর্তী নবজাতকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—জন্মলগ্নে দেখছি, শিশুর অঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে মহাপুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ। দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন চিহ্ন ওর দেহে বিদ্যমান। এ শিশু এসেছে বিশ্বকে ত্রাণ করতে। ভূ-ভার বহন করতে। সুতরাং এর নাম হোক 'বিশ্বম্ভর'।

নীলাম্বরের কথাটিও কেউ ফেললো না। নিমাই থাক ডাক নাম। কিন্তু পোষাকী নাম থাকবে—বিশ্বম্ভর।

কিন্তু অন্য মেয়েরা বললে—নাম থাক গৌরহরি। কারণ, হরি-ই ত এসেছে গৌর বেশে।

তখন সাহস পেয়ে অন্য মেয়েরা বলে উঠল সমস্বরে—এমন যার অঙ্গের কান্তি, তার নাম 'গৌরাঙ্গ' ছাড়া আর কি হতে পারে।

যে নামই থাক না, নাম • বস্তু চেনার উপায় মাত্র নাম আর নামীতে ভিন্ন ত নয়। তাই গৌর, গৌরচাঁদ, গৌর রায়—সমর্থিত হলো সবই।

তবে নিমাই নামটাই কেমন যেন চাউর হয়ে গেল।

দিন চলে এগিয়ে দেখতে দেখতে মাসও যায়। তারপর বছর।

হামাগুড়ি দিতে দিতে চলতে আরম্ভ করে এ কেরে'কে। কখনো পড়ে যায়, আবার মাটি ধরে নিজেই উঠে পড়ে। নিমাই-এর শিশু-লীলা, বৃন্দাবনের তুলিতে হয়ে উঠে অপরূপ কৃষ্ণলীলার সঙ্গে কেমন যেন মিলিয়ে দেন বৃন্দাবন দাস।

দেখতে দেখতে ন' বছরে পদার্পণ করল নিমাই। ব্রাহ্মণের ছেলে। চললো উপনয়নের আয়োজন। জগন্নাথের গৃহাঙ্গণ হয়ে উঠল উৎসব মুখর। বেজে উঠল শঙ্খ, বেজে উঠল মৃদঙ্গ কাসর ঘণ্টার ধ্বনিতে উপনয়নের লগ্ন এলো এগিয়ে। নিমাই-এর পৈতে। তাইত ব্যস্ত সকলেই।

অদ্বৈত আর হরিদাস টোল খুলেছেন নবদ্বীপে। শান্তিপুর থেকে চলে এসেছেন তাঁরা। প্রভু আবির্ভূত হয়েছেন নবদ্বীপে। তাই ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

নিমাই-এর বড় দাদা বিশ্বরূপ। সে এসে ঢুকেছে অদ্বৈতের টোলে। বড় ভাল লাগে অদ্বৈতকে। বিশ্বরূপ মন দিয়ে ভক্তিভরে শুনে আচার্যদেবের কথা। অর্থাৎ ভক্তির কথা। ভক্তিইত রসের সার। ভক্তিতেই মিলে ভগবানকে।

অই ভক্তির কথা পেলেই বিশ্বরূপ ভুলে যায় খাওয়া-দাওয়া সবই।

'দাদা, মা ডাকতে পাঠালো। বাড়ি যাবে না, তোমার খিদে পায় নি?'

চমকে উঠলেন আচার্যদেব। এ কে এসে দাঁড়ালো, এ কি দেব শিশু, না মানব সন্তান। এত রূপ কি মনুষ্য সন্তানে সম্ভব। এ যে দেখছি--

'প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥'

সহসা আমার চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠছে কেন? এ কি মনোহর, গাই হরণ করে নিল আমার মন।

'ও ত আমার ছোট ভাই – নিমাই দুষ্টের শিরোমণি।'

আচার্যদেব স্তব্ধ, নিরুত্তর, এতক্ষণ কৃষ্ণের কথা হচ্ছিল এখন যে আর কোন কথাই মুখে আসছে না। বাক্যাতীত যিনি, তাকে নিয়ে এত কথা। তিনি ত এসে দাঁড়িয়েছেন সম্মুখেই।

ততক্ষণে নিমাই এসে জড়িয়ে ধরেছে বিশ্বরূপের গলা

কই দাদা, চলো, মা যে ডাকছে

উঠে পড়লো বিশ্বরূপ। ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে চললো বাড়ীর পথে।

'এ বালক সাধারণ বালক নয়।' অদ্বৈতাচার্য বলে উঠলেন বৈষ্ণব ভক্তদের। দেখ তোমরা নির্ণয় করে। এ কোন ভক্ত শিরোমণি, কোন রসিক শেখর

অদ্বৈত সভাতেই কাটে সারাদিন বিশ্বরূপের বাড়ীতে বড় একটা থাকে না। জগন্নাথের সঙ্গে প্রায়ই দেখাই হয় না। সেদিন অনেক বেলাতে বিশ্বরূপ ফিরছে বাড়ী। পথে দেখা হয়ে গেল বাবার সঙ্গে জগন্নাথ মিশ্র দেখলেন পুত্রকে। দেখে অবাক হলেন যৌবনে বিশ্বরূপ ত ভারি সুন্দর হয়ে উঠেছে এবার ছেলের বিয়ে দিলে কেমন হয়?

কথাটা শুনে শচী দেবী হয়ে উঠলেন উৎফুল্ল আনন্দ যেন তার আর ধরে না। ভারি সুন্দর টুকটুকে মেয়ে দেখে বিয়ে দিবেন তিনি বিশ্বরূপের। অমন কার্ত্তিকের মত ছেলে তার ছেলের যোগ্য মেয়েই তিনি আনবেন ঘরে।

চারিদিকে চলতে লাগল মেয়ের অনুসন্ধান মিশ্র-ভবনে হতে লাগল ঘটকের আনাগোনা। কথাটা কানে গেল বিশ্বরূপের। শুনে মনটা কেমন যেন

চন্‌মন্‌ করে উঠল। সংসারের বন্ধনে জড়াতে চাইছেন তাঁর মা-বাবা। কিন্তু তাঁর মনটা যে বৈরাগী। খ্যাপা উদাসী বাতাসের মত মনটা পালাই পালাই করছে। একে ত বেঁধে রাখা যাবে না ঘরে।

বিশ্বরূপের বন্ধু লোকনাথ। দু'জনেই সদা সর্বদা থাকে এক সাথে। দু'জনেই একাত্মা। একান্তে বললে লোকনাথকে—'দ্যাখ, আমি স্থির করেছি, সন্ন্যাসী হবো।'

বিশ্বরূপের কথা শুনে লোকনাথ উঠলে লাফিয়ে। বললে—'আমিও তাহলে যাব তোর সঙ্গে।

সে কি, আমার সঙ্গে তুই কোথায় যাবি ?

কেন তুই যেখানে যাবি, আমিও যাব সেখানে। তুই আর আমি—ভিন্ন ত নই।

—তাহলে নিমাইকে দেখবে কে রে ? তাকে ত লেখাপড়া শেখাতে হবে। তুই সঙ্গে গেলে নিমাইকে রেখে যাব কার কাছে ?

'কেন, মা বাবা আছে। তাঁদের কাছেই থাকবে নিমাই।' লোকনাথ সান্ত্বনা দিয়ে বললে বিশ্বরূপকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে বিশ্বরূপ—মা বাবার কথা খুব একটা ভাবছি না। শাস্ত্রেই আছে, যার বংশে সন্ন্যাসী হয়, তার কুল উর্ধ্বগতি লাভ করে।

'গোষ্ঠীতে পুরুষ যাব করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস॥'

চলতে লাগল আয়োজন। অতি সংগোপনে। কেউ জানতে পারল না এ সংবাদ। বিশ্বরূপের বয়স তখন ষোল কি সতের। শীতের রাত। অতিক্রান্ত রাত্রির তৃতীয় যাম। বেরিয়ে পড়ল বিশ্বরূপ আর লোকনাথ।

মা বাবা তখন গভীর ঘুমে অচেতন। বাইরের থেকে প্রণাম করল মা-বাবাকে। মনে পড়ল নিমাইয়ের কথা। ছোট ভাইটি তার। বড় আদরের, বড় স্নেহের, কত দুরন্তপনা করত ওর সঙ্গে সে। কত বকেছে নিমাইকে। আজকে রাত্রির এই বিদায়-লগ্নে সে সব স্মৃতি বাঁধ ভাঙা বন্যার মত হু-হু করে ঢুকে পড়ছে বিশ্বরূপের মানস মন্দিরে। সে ত কিছু দিয়ে যেতে পারল না, তার ছোট ভাই নিমাইকে।

শুধু একখানা পুঁথি দিয়ে এসেছে মায়ের হাতে। মাকে বলে এসেছে—"নিমাই বড় হলে বইটা তাকে দিও।' মা কি সহজে নিতে চায়। বলেছিল—'সে কি রে, আমি কেন রাখব। নিমাই বড় হলে তুই নিজ হাতে তাকে দিস।'

বিশ্বরূপ মায়ের কথায় বড় বিব্রতবোধ করছিল। শেষে ছলনার আশ্রয় নিয়ে মাকে অবশ্য বুঝিয়েছে।

এই মনে কর না কেন, আমি বিদেশ-বিভুঁই-এ কোথাও যদি যাই। ফিরতে আমার হয়ত অনেক দেরীই হয়ে গেল, তখন আমার মনেই রইলো না। তাহলে পুঁথিটা আমার আর দেওয়াই হবে না। তাই বলছিলাম কি, পুঁথিটা মা তুমিই রেখে দাও। বড় হলে ও যখন পড়তে পারবে, ওকে দিও।

এত কথার পর শচীদেবী আর কথা বাড়াননি। হাত পেতে বইটা নিয়ে রেখে দিয়েছেন ঘরে।

বিশ্বরূপ এসব কথা স্মরণ করে কেমন যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কিন্তু মায়াতে বদ্ধ হলে তার ত চলবে না। তাকে যে যেতেই হবে। ওই ত স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে বিশ্বরূপ অনাহত ধ্বনি। বেণুর নিঃস্বন। ব্যাকুল আহ্বান শুনতে পাচ্ছে সে।

'হে কৃষ্ণ, আমি তোমারই পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে গেলাম আমার প্রাণের নিমাইকে 'তুমিই' একে দেখো প্রভু।'

তমিস্রা ঘন রাত্রি। দুজনে এসে দাঁড়াল গঙ্গার তীরে। কিন্তু নদী পেরোবে কেমন করে। ঘাটে ত মাঝি নেই, শীতের রাত্রি। বিশ্বরূপ ঝাঁপ দিলে গঙ্গায়। দেখাদেখি লোকনাথও ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সঙ্গে কারো কিছু নেই। শুধু একখানা পুঁথি। তাকে রক্ষে করবে কেমন করে? বাঁহাতে পুঁথিটা ধরে জলের উপরে রাখলে খাড়া করে। ডান হাতে জল কেটে কেটে এসে উঠলে গঙ্গার ওপারে। ভীষণ শীত। তায় ভেজা কাপড়। সেদিকে খেয়াল নাই কারো। সোজা চললে পশ্চিমে। চলতে চলতে শুকিয়ে যাবে কাপড়। যাদের হৃদয়ে জ্বলছে কৃষ্ণ প্রেমের আগুন প্রকৃতির শীত তাদের স্পর্শ করবে কেমন করে। দেহের বস্ত্র ভেজালেও মন ত আর ভেজাতে পারেনি।

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা হলো পুরী সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। তাঁর কাছে সন্ন্যাস নিলে বিশ্বরূপ। নাম হলো শঙ্করারণ্য। আর লোকনাথ। সে দীক্ষা নিল শঙ্করারণ্যের কাছে। দুই নবীন সন্ন্যাসী। দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে নিয়ে চললো অনন্তের পথে। চললো তাদের কৃষ্ণান্বেষণ।

কান্নার রোল উঠল জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে।

শচীদেবী কান্নায় আকুল হলেন। কাঁদতে কাঁদতে মূর্চ্ছা গেলেন। নিমাই দাদা নাই দেখে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো 'দাদা', 'দাদা' বলে।

শোকের ঝড় উঠল মিশ্র পরিবারে। নিমাই কাঁদতে কাঁদতে কেমন যেন স্থির হয়ে গেল।

মা-বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—'কাঁদছ কেন? আমি ত রয়েছি তোমাদের কাছে।'

'ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃ-কুল মাতৃ-কুল দুই উদ্ধারিল॥
আমি তো করিব তোমা দোঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতামাতার মন॥'

মা-বাবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে নিমাই। দাদা ত কোন খারাপ কাজ করেনি। সে বরং তোমাদের কুলের মুখোজ্জ্বল করেছে। তবে তার জন্য দুঃখ করছ কেন। আমি ত আছি। তবে আর ভাবনা কিসের। আমি তোমাদের কখনো ছাড়ব না। দেখো তোমাদের সব দুঃখই দেব ঘুচিয়ে। মাগো, তুমি দাদার জন্য অত আকুল হয়ো না।

শচীদেবী বুকে জড়িয়ে ধরলেন নিমাইকে।

বাম হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ডান হাতে মায়ের চোখ মুছিয়ে দিলে নিমাই।

পাড়াপড়সী ছুটে এলো জগন্নাথের কাছে। নিমাই অর্থাৎ বিশ্বম্ভরকে দেখিয়ে তারা বললে—

"এই কুলে ভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র তোমার হইব বংশধর॥
ইহা হইতে সর্ব দুঃখ ঘুচিব তোমার।
কোটি পুত্রে কি করিব এ পুত্র যাহার॥"

তবুও প্রবোধ মানে না শচীদেবীর অন্তর। থেকে থেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেন তিনি। ভুলাতে চান বিশ্বরূপকে। কিন্তু মন যে কোন বাধাই শুনতে চায় না। মায়ের মন তুষানলের মত। ধিকি ধিকি করে জ্বলতে থাকে সর্বদাই। হাজার হোক তিনি যে মা। সন্তান হারানোর বেদনা সহজে কি ভোলা যায়।

পুড়ছে জগন্নাথেরও হৃদয়। পুরুষ মানুষ তিনি। ধৈর্য ত তাকে ধরতেই হবে। মনকে তিনি কত বোঝান। অবোধ মন কোন যুক্তিই শুনতে চায় না। ঠাকুর ঘরে গিয়ে রঘুনাথকে বুকে চেপে কেঁদে ওঠেন হু-হু করে। চোখের জল কিছুতেই বাঁধ মানে না। নীরবে নির্জনে চোখের জলে বুক ভাসান জগন্নাথ।

নৈবেদ্যের পান খেয়ে সহসা নিমাই অজ্ঞান হয়ে গেল।

শচী-জগন্নাথ হয়ে উঠলেন চিন্তিত। ব্যস্তভাবে কোলে নিলেন নিমাইকে শচীদেবী। পাখার বাতাস করতে লাগলেন জগন্নাথ। দেখতে দেখতে নিমাই-এর জ্ঞান ফিরে এলো।

মাকে দেখে বললে—'জানো মা, আমি দাদাকে দেখলুম।'

'দেখলি বিশ্বরূপকে? কোথায়?' আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন শচী দেবী।

'হ্যাঁ মা, সত্যি আমি দাদাকে দেখলুম সে আমায় নিয়ে যাচ্ছে হাত ধরে।'

'তোকে নিয়ে যাচ্ছে!' চীৎকার করে উঠলেন জগন্নাথ।

'হ্যাঁ গো বাবা। আরো কি বললো জানো, তুই আমার মত সন্ন্যাসী হ।'

বুকে নিমাইকে চেপে ধরে শচীদেবী বললেন—'তুই কি বললি?'

'কি আর বলব। আমি ত এখন ছেলেমানুষ। সন্ন্যাসীর কি বুঝি বলো। আমি আমার মায়ের কাছে থাকব মাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। তুমি চলে গেছ, মা-বাবাকে দেখবে কে? কে তাদের সেবা যত্ন করবে। জানো, তাদের সেবা করলে লক্ষ্মীনারায়ণ খুশি হবেন।'

'আমি কহি আমার অনাথ পিতা-মাতা।
আমি বালক সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা॥
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা-মাতার সেবন
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥

নিমাই-এর কথা শুনে শচী দেবীর হাহাকারে দীর্ণ বক্ষ যেন অনেকটা শান্ত হলো। মুখে চুমু খেয়ে শচীদেবী জিজ্ঞেস করলেন—'তোর দাদা আর কিছু বললে না?'

'বুঝলে মা, দাদা আমার কথা শুনে খুব খুশি হয়ে বললো—মা-বাবাকে আমার কোটি কোটি প্রণাম দিস।'

জগন্নাথের বুকটা কিন্তু হাহাকার করে উঠলো। নিমাই-এর কথা শুনে মনটা শান্ত হলো না কিছুতেই। পুত্র-শোক শেল সম বিঁধে আছে তার বুকে। মন তাঁর বলে উঠলো, এ নিমাই থাকবে না ঘরে। ও মুখে যতই বলুক, একদিন ও-ও ধরবে দাদার পথ।

ভিতরে ভিতরে পুত্র হারিয়ে জগন্নাথের বুকটা কেমন যেন ভেঙ্গে পড়ল। মন তাঁর বিষাদাচ্ছন্ন। কোন কিছু আর ভাল লাগে না। স্ত্রী-পুত্র-এরা কেউ কারো নয়, শুধু মায়া আর মায়া।

জগন্নাথ কিছুতেই সামলে নিতে পারছেন না নিজেকে। ভবনা-চিন্তায় দিন দিন কেমন যেন শুষ্ক হতে লাগলেন।

অবশেষে একদিন পড়লেন জ্বরে। শয্যা গ্রহণ করলেন জগন্নাথ আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন শয্যায়। শচীদেবী স্বামীর অবস্থা দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন।

জরের ঘোরে ভুল বকতে লাগলেন জগন্নাথ।

'হে প্রাণগোবিন্দ, নিমাই আমার ঘরে থাক। সে গৃহস্থ হোক। তাকে আমি সযত্নে রাখব। তুমি কেড়ে নিও না নিমাইকে আমার বুক থেকে। আমি মিনতি করছি, তুমি আমায় পুত্রহারা করো না।'

ছুটে এলেন শচীদেবী। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—'ও সব কি বলছ?'

'জানো, বড্ড দুঃস্বপ্ন দেখলাম।'

'কি দুঃস্বপ্ন দেখলে। কাঁপা কণ্ঠে আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন শচীদেবী

'দেখলাম, নিমাই আমার মাথা মুড়িয়েছে। ধরেছে সন্ন্যাসীর বেশ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নাচছে, কাঁদছে। দলে দলে লোক চলছে তার পিছনে পিছনে। অদ্বৈতাচার্যও জুটেছেন নিমাইয়ের দলে। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ বলে মেতে উঠেছেন কীর্তনে। আর কীর্তনের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠছে। নিমাই পা তুলে দিচ্ছে সকলের মাথায়।'

'এসব তুমি জ্বরের ঘোরে ভুল দেখেছ। স্বপ্ন কখনো সত্যি হয়। ওসব তুমি কিছু ভেব না। নিমাই আমার কখনো অমন করবে না। সে আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবে না। ও সব দুশ্চিন্তা ছাড়ো ত। তুমি একটু শান্ত হও।'

স্বামীব মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সান্ত্বনা দেন শচীদেবী

সেই জ্বরই জগন্নাথের কাল হলো।

সামান্য কয়েক দিনেব অসুখেই মারা গেলেন জগন্নাথ।

'আমার একি হলো গো' বলে শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন শচীদেবী।

মূর্ছা আর কিছুতেই ভাঙতে চায় না। শোকের উপরে শোক। কত সহ্য করবেন তিনি। বিপদ যখন আসে, এমনি করেই আসে। একের পর এক। যেন সার বেঁধেই আসে সে। তাকে প্রতিরোধ করতে পারে না কেউ।

ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছেন আর কাঁদছেন মাথা কুঁড়ে।

নিমাই-এব বয়স এগার কি বাবো। পিতার মৃত্যু দেখে কেঁদে উঠল চীৎকার করে। পিতার মৃত্যু তাকে ব্যাকুল করে তুললো। কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেললো নিমাই। এ তার কি হলো। সে বাঁচবে কেমন করে। 'বাবা' বলে ডাকা এ জন্মের মত শেষ হয়ে গেল তার।

মাকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে সে। মার যে মূর্ছা ছাড়ছে না কিছুতেই। মা ছাড়া এ সংসারে তার ত আর কেউ নেই। যেমন করেই হোক মাকে তার বাঁচাতেই হবে।

নিমাই অনেকটা সামলে নিলে নিজেকে। বললে—"মা গো, তাকাও আমার দিকে।'

'শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরে যে দুর্লভ লোকে বলে।
তাহা আমি তোমারে আনিঞা দিব হেলে॥' চৈ· ভা·

নিমাই আঁকড়িয়ে ধরলে মায়ের গলা। মুছিয়ে দিলে চোখের জল। যেন শচীদেবীর সমস্ত শোক, সমস্ত ব্যথা নিজের হৃদয়ে শুঁষে নিল নিমাই। মাকে সে শান্ত করল।

শচীদেবী পুত্রকে আকড়িয়ে ধরলেন বক্ষে। ভুলে যেতে চাইলেন স্বামী হারানোর ব্যথা পুত্রের মুখ চেয়ে নিজেকে শক্ত করলেন। এ যে তার শেষ সম্বল। এই টুকুই ত শেষ নিদর্শন। যক্ষের ধনের মত একেই আগলিয়ে রাখতে হবে তাঁকে। যত ব্যথাই তিনি পান, বাঁচতে হবে তাকে পুত্রের মুখ চেয়ে।

মুছে গেল চিরতরে শচীর আয়োতির চিহ্ন। ভেঙ্গে ফেললেন হাতের শাঁখা। এ সংসারে তাঁর আর কিছুই রইলো না। একমাত্র নয়নের মণি ঐ নিমাই। ঐ টুকুই তাঁর শেষ সম্বল।

কিন্তু যা দুরন্ত ও। ওকে সামলাবে কেমন করে। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়তে যায়। পড়াশুনায় ভীষণ মন ওর। অনেক বয়সেই হাতেখড়ি হয়েছে নিমাই-এর। বাবা কিছুতেই পড়াতে চাইছিলো না। ও লেখাপড়া শিখিয়ে কি হবে। ওইত একজন লেখাপড়া শিখে সন্ন্যাসী হয়ে গেল। এই ত লেখাপড়ার গুণ। তাই জগন্নাথ চাইছিলেন না নিমাই লেখাপড়া শিখুক।

ছেলের সেকি রাগ। ঢুকলে আস্তাকুঁড়ে গিয়ে। হাঁড়ি-পড্যাতে যত এঁটো হাঁড়ি ছিল পড়ে, পর পর সাজিয়ে সিংহাসন করে বসলে তারই উপরে। গৌর-অঙ্গ হাঁড়ির কালিতে মাখামাখি হয়ে ধারণ করল কৃষ্ণ-বরণ। সঙ্গীরা ছুটে গিয়ে খবর দিল শচীদেবীকে। দেখবে এস তোমার 'নিমু'র কীর্তি।

হায় হায় করে ছুটে এলেন শচী দেবী। এ তুই সেজেছিস কি? কোথায় গিয়ে বসেছিস। আয় আয় দস্যি ছেলে নেমে আয়।

আমি সং সেজেছি। আমি ত মুখ্যু। আমার কি ভদ্রাভদ্র জ্ঞান আছে। আমি কেমন করে জানব ভাল মন্দ। আমার কাছে ত সব জায়গায়ই সমান।

তা বলে তুই এ'টো-কু'টো বুঝিস্ না। ছিঃ ছিঃ নেমে আয়। ও যে অপবিত্র স্থান রে।

কোন কথাই শুনলে না নিমাই। দিব্বি বসে রইলে হাঁড়ির উপরে। মুখে হাসি। দোলাচ্ছে আরাম করে দু'টো পা।

অনুনয় করে শচীদেবী বললেন—লক্ষ্মী মাণিক আমাব। নেমে আয় বলছি। বাবা শুনলে ভীষণ রাগ করবেন যে।

তাহলে আমায় পড়তে দেবে বলো। যেতে দেবে পাঠশালে? যদি কথা দাও তাহলে এখ্‌খুনি নেমে যাব। টুব্ করে ডুবে আসব গঙ্গায়। তুমি যা বলবে, তাই করব।

——হাসতে হাসতে মাথা নাড়তে নাড়তে উত্তর দিলে নিমাই।

সেই থেকে জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে দিয়েছিলেন ভর্তি করে। তারপর থেকেই ছেলের পড়ার প্রতি কি ঝোঁক

ব্যাকরণের অধ্যাপক গঙ্গাদাস। হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন নিমাইকে পড়াতে। গুরুর ব্যাখ্যা মনেই ধরে না নিমাই-এর। গঙ্গাদাস যাই ব্যাখ্যা করুন না কেন, নিমাই তা খণ্ডন করবেই। গঙ্গাদাস যেই নাজেহাল হয়ে পড়েন, নিমাই আবার সেই মূল ব্যাখ্যাই স্থাপন করে।

নিমাই-এর সাথী যত পড়ুয়া—রঘুনাথ, মুরারি—কেউ পেরে উঠে না নিমাই-এর সাথে। পথে, ঘাটে গঙ্গায়, যেখানে যার সাথে দেখা হয়, সূত্র আর টীকা নিয়ে বাধিয়ে দেয় কলহ। নিমাই-এর সঙ্গে এ'টে ওঠা দায়। বিদ্যার দ্বন্দ্বে লেগে আছে সর্বদাই।

কিন্তু যখন রেগে যায়, গোয়ার্তুমি করে, তখন আর রক্ষে নেই কারো। গোঁ ধরলেই দিতে হবে। কি জিগিরে ছেলে। এমন ছেলেকে কেমন করে সামলাবেন শচীদেবী। ভাবতে ভাবতে হু-হু করে বেরিয়ে আসে চোখের জল।

আকুল হয়ে প্রার্থনা করেন—'হে রঘুনাথ, তুমি আমার এই অন্ধের যষ্ঠিকে রক্ষে কর প্রভু। ওকে সুমতি দাও। কমিয়ে দাও ওর এই চণ্ড রাগ। ওকে ভাল করে দাও প্রভু।'

স্বামীহারা শচীদেবীর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান নিমাই। একটু চোখের বার হলেই শচীমাতা হয়ে উঠেন আকুল। তিনি কিছুতেই ধরে রাখতে পারেন না নিজেকে। নিমাই ছাড়া শচীদেবী নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতেই পারেন না।

গৌরহরির শ্রীমুখ দর্শনেই ভুলে যান সব দুঃখ, সব যন্ত্রণা। বুকটা যেন ভরে ওঠে প্রশান্তিতে। বুঝি সব দুঃখ হরণ করে নেয় গৌরহরি।

তা কেন হবে না—

'যার স্ফূর্তি মাত্রে সর্ব পূর্ণ হয় কাম।
সে প্রভু যাহার পুত্ররূপে বিদ্যমান॥
তাহার কেমতে দুঃখ রহিবে শরীরে।
আনন্দস্বরূপ করিলেন জননীরে॥'

শচী মাতা নিমাইকে সঁপে দিলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের হাতে। বললেন—পিতৃহীন অনাথ ছেলেটাকে আমি সঁপে দিলাম তোমার হাতে। একে তুমি একটু যত্ন করে দেখো।

মহা খুশি গঙ্গাদাস। বললেন—"মা, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। নিমাই-এর মত ছাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা। ওকে আমি আদর যত্ন করেই শেখাব। পিতৃহীন বলে অনাদর করব না।"

অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে শচী মাতা ফিরলেন আপন গৃহে।

॥ চার ॥

শচী মাতা আর পারেন না। পারছেন না কিছুতেই। সংসারে দারিদ্রের সীমা নাই। চারিদিকে শুধু নাই আর নাই। কতক্ষণ তিনি কি করেই বা চালাবেন।

তারপর নিমাই-এর জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছেন তিনি। কোন কিছুতেই তর সয়না ওর। চাওয়া মাত্রই দিতে হবে। না দিলে লঙ্কাকাণ্ড করে ছাড়বে।

এই ত সেদিন, কি আর এমন হয়েছিল।

যাচ্ছিল গঙ্গাস্নানে। সহসা বললে—দাও আমাকে মালা-চন্দন। আমি গঙ্গা পুজো করব।

মনে মনে প্রমাদ গুনলেন শচীদেবী। বললেন—'একটু দেরী কর বাবা। এই আনছি মালা-চন্দন।'

'কি, এখন তুমি আবার আনতে যাবে!'

রুদ্র-মূর্তি ধারণ করল নিমাই।—'তুমি এতক্ষণ কি করছিলে ঘরে বসে বসে? উৎরে যাচ্ছে পুজোর সময়। এখন যাবে আনতে?'

আর কোন কথা নাই। দৌড়ে গিয়ে ঢুকল ঘরে। সামনে ছিল গঙ্গা-জলের হাঁড়ি। ভাঙলে এক লাথি মেরে। তারপর ছোট বড় যত হাঁড়ি ছিল, কোনটার মধ্যে চাল, কোনটায় বা ডাল। তেল, নুন—কোনটাকেই রাখল না আস্ত। ভেঙ্গে-চুরে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে সব করলে একাকার। লাঠির এক এক বাড়িতে সব চূর্ণ-বিচূর্ণ। তাতেও কি পড়ল রাগ।

ঘরে যত শিকে ছিল টাঙান। পট্‌পট্‌ করে সবগুলো ফেললে ছিঁড়ে। শুধু শিকে নয়, বাড়ীর কাপড়-চোপড়—যেখানে যা ছিল হ্যাঁচ্‌কা টানে করলো ফর্দাফাঁই। আস্ত রাখল না একটাও। চোখের সামনে আর কোনকিছু না পেয়ে, রাগ পড়ল ঘরের উপরে। দরজা-জানালা সব আরম্ভ করল ভাঙতে। রাগ তবু ঠাণ্ডা হলো না। যে নিম গাছের তলায় জন্মেছিল নিমাই, লাঠি দিয়ে তাকেই প্রহারে জর্জরিত করে তুললো। গাছ ছেড়ে এবার মন পড়লো মাটির উপরে। রেহাই নাই বসুন্ধরা দেবীরও। লাঠির প্রহারে মাটিকে করে তুললো প্রকম্পিত। জর্জরিত হয়ে উঠলো পৃথিবী।

ভয় পেয়ে শচীদেবী লুকোলেন গৃহের উপান্তে। সাহস হলো না ছেলের সামনে যেতে।

ধ্বংস যজ্ঞ সাঙ্গ করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিমাই দাঁড়াল অঙ্গনে। অতৃপ্ত রোষাগ্নি তার। কাছে পিঠে কেউ নেই যে সামলায়। দাঁড়াতে দাঁড়াতে কাউকে না দেখে গড়াগড়ি খেতে লাগল মাটিতে। ধূলায়-ধূসরিত হলো গৌর অঙ্গ। কনক জিনিয়া ভাতি মলিন হলো ধরণীর ধূলিতে। বৈকুণ্ঠপতি আশ্রয় নিলেন ভূমি শয্যায়।

তারপর ?

'চারি বেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণে।
সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে॥'

তখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন শচীমাতা। মালা আনালেন। তারপর নিদ্রিত নিমাইয়ের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ডাকলেন "ওঠ বাপ, ওঠ। এই দ্যাখ, মালা এনেছি। এবার যা গঙ্গাস্নানে। যত ইচ্ছে পূজো করে আয়।'

ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল নিমাই। চারিদিকে দেখলে চেয়ে, একি করেছে সে। লজ্জায় মাথা তার হেঁট হয়ে গেল। যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায় সে।

ছেলের ভাব দেখে শচীদেবী বললেন – 'ভালো হয়েছে। আপদ বালাই গেছে তোর।'

'ভাল হৈল যত বাপ ফেলিলা ভাঙ্গিযা।
যাউক সকল তোমার নিছনি লইযা॥'

লজ্জিত নিমাই কিছু বললে না। উঠে চলে গেল গঙ্গা স্নানে।

চিন্তিত হয়ে পড়লেন শচীদেবী। এখন কি করবেন তিনি। কি দিয়ে কিসে রান্না করবেন। হাড়ি-কুঁড়ি কিছুই ত আস্ত রাখেনি দুষ্ট ছেলে। এখনি স্নান থেকে ফিরে এসে চাইবে খেতে। কি দিবেন সে ছেলেরে। খেতে না পেলে তুমুল কাণ্ড বাঁধাবে।

তাড়াতাড়ি ঘর-বার, উঠোন পরিষ্কার করলেন। ধুয়ে এলেন কাপড়-চোপড়। ছেঁড়া বস্ত্রাদি রাখলেন ঘরে তুলে। কাঁদতে লাগলেন ঘরের অবস্থা দেখে। এ সব কি লঙ্কাকাণ্ড করেছে নিমাই। হে প্রভু রঘুনাথ, তুমি ওকে একটু শান্ত কর। আমি আর ওর জ্বালা সহ্য করতে পারছি না প্রভু।

যাই হোক করে দুটি রান্না করলেন শচীদেবী।

নিমাই ফিরে এলো গঙ্গাস্নান সেরে। পূজো করলো বিষ্ণুর। জল ঢেলে সেবা করলে তুলসীর।

ভোজনে বসল এসে নিমাই। খেতে দিলেন জননী। ভক্তি করে খেল। পেট ভরে। তুষ্ট হলো ছেলে। তারপর পান খেয়ে শুতে গেল ঘরে।

মন বুঝে শচীদেবী এলেন ছেলের কাছে। ভয়ে ভয়ে বললেন—"এসব ঘরের জিনিসপত্র নষ্ট করে কি লাভ। এ সবই ত তোর। মিছেমিছি নষ্ট করলি কেন?'

কোন কথা নেই নিমাইয়ের মুখে। শুধু হাসতে লাগল মৃদু মৃদু।

ঘরে ত আর কিছু নেই। সন্ধ্যায় কি খাবি বল দেখি?

'কেন, কৃষ্ণ খাওয়াবেন।'

'হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন।
প্রভু বলে কৃষ্ণ পোষ্টা করিবে পালন॥'

বলেই পাশ ফিরে শুলে নিমাই। শচীমাতা আর কিছু বললেন না। উঠে গেলেন ছেলেব পাশ থেকে।

একটু পরেই নিমাই চললো পড়তে। খুঁঙ্গি পুঁথি বগলে করে।

চিন্তা করে স্থির করতে পারেন না শচীদেবী। সত্যি ত সন্ধ্যায় কি রান্না করবেন তিনি। ঘরে যে খুদ-কুঁড়ো কিছুই নাই। যা ছিল সব ত নষ্ট করছে দুষ্টু ছেলে। বাবু, তের বছর বয়স হলো। এখনো কি কিছু বুঝতে পারে না। এত অবুঝ কেন। বললে, 'কৃষ্ণ খাওয়াবেন।' ভেবে ভেবে সারা হন। কিছু স্থির করতে পারেন না তিনি।

সন্ধ্যাব দিকে ঘবে এলো নিমাই। মাকে ডাকলে নিভৃতে। দু'তোলা সোনা মায়ের হাতে দিয়ে বললে—'কৃষ্ণ পাঠিয়ে দিলেন। এই নিয়ে চালাও সংসাব। যত দিন পার সংসার খরচ করো।'

'সে কি রে খোকা! সোনা তুই কোথায় পেলি?'

অবাক হয়ে গেলেন শচীদেবী।

কোন উত্তর দিলে না নিমাই। নিশ্চিন্ত হাসি হেসে চলে গেল ঘরে শুতে।

প্রমাদ গুনলেন জননী। একি বিপদে ফেলল নিমাই। সোনা ও কোথায় পেলো। কার কাছ থেকেই বা আনলো। কেই বা ওকে দিলো। বললো—'কৃষ্ণ পাঠিয়ে দিলেন।' তাই বা কেমন করে হয়। এ কি কোনো অমানুষী বিভূতি!

ভেবে কিছু স্থির করতে পারেন না। ভাঙাতে ভয় পান। কি জানি যদি কোন বিপদ ঘটে। শিউরে ওঠেন শচীদেবী। একটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা তাঁর দুরুদুরু করে।

কিন্তু না ভাঙালেই বা চলবে কেমন করে। সংসারে আয় ত কিছু নেই। এমনি সাত পাঁচ ভেবে আকুল হয়ে ওঠেন। শেষে সোনাটা বিক্রি করাই সিদ্ধান্ত করেন।

যাকে সোনাটা দিয়ে পাঠালেন বাজারে, পই-পই করে বলে দিলেন তাকে—'দেখো, পাঁচ-দশ-ঠাঁই দেখিয়ে তবেই ভাঙিও।'

"ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরান বার বার॥'

এমনি করেই চলে শচীর সংসার। যখনি সংসার অচল হয়ে পড়ে, অভাব হয় সংসারে, নিমাই নিয়ে আসে সোনা।

ভারি ভয় করে শচীর। ভাবেন মনে মনে—

'কোথা হইতে স্বর্ণ আনয়ে বার বার।
পাছে কোন প্রমাদ ঘটায় জানি আর॥'

ভাবনা চিন্তায় মুষড়ে পড়েন জননী। সন্দেহ হয় ছেলেকে। কি জানি, ছেলে হয়ত কোন সিদ্ধি জানে। জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না শচীদেবীর।

ভয়ের কী-ই বা আছে নিমাই-ই ত সব ধরে রেখেছে। বিরাজ করছে গুপ্তভাবে।

'হেনমতে মহাপ্রভু সর্ব সিদ্ধেশ্বর।
গুপ্তভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥'

কিন্তু হাত থেকে পুঁথি ছাড়া হয় না কখনো। পড়া-শুনায় সকলের উপরে। মাথায় চাঁচর চিকুর ললাটে সু-অঙ্কিত উর্ধ তিলক। স্কন্ধে উপবীত। প্রসন্ন সহাস্য বদন। টানা টানা কি অদ্ভুত দুটি কমল নয়ন। ত্রিকচ্ছ পরিহিত বসন।

'যেই দেখে সেই এক দৃষ্টে রূপ চায়।
হেন নাহি ধন্য ধন্য বলিয়ে না যায়॥'

॥ পাঁচ ॥

বছর ষোল বয়স। নিমাই ছেড়ে দিলে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল। এবার নিজেই সে টোল করবে। কিন্তু কোথায় পাবে জায়গা। নিজের বাড়ীতে ত স্থান নেই। ধরলে মুকুন্দ-সঞ্জয়কে। বললে—

'তোমাদের অতবড় চণ্ডীমণ্ডপটা ত পড়ে রয়েছে। দাওনা আমাকে, তাহলে আমি একটা টোল খুলে বসি।'

বিদ্যার তীর্থক্ষেত্র নবদ্বীপ। কত বড় বড় পণ্ডিতের টোল রয়েছে। কত পাণ্ডিত্য তাদের। কত খ্যাতি প্রতিপত্তি। টোল খোলা ত আর চাট্টিখানি কথা নয়। তায় নিমাইয়ের স্পর্ধা ত কম নয়। ঐ টুকুন কিশোর। এখনো মুখ থেকে দুধের গন্ধ যায়নি বললে চলে। সে খুলবে নতুন টোল, বিদ্যার মন্দির!

তবু কি জানি কেন মুকুন্দ সঞ্জয় রাজী হয়ে গেল। বললে—'সে ত ভাই উত্তম প্রস্তাব। তোমার যদি মন চায়, দাও বসিয়ে বিদ্যার সমাজ। আমার ত অতবড় চণ্ডীমণ্ডপটা পড়েই রয়েছে। তুমি যদি কাজে লাগাতে পার, তাহলে আমি কৃতকৃতার্থ হবো।'

ওর সম্মতি পেয়ে ভারি খুশি হলো নিমাই।

'আমার ছেলেরাও কিন্তু পড়বে তোমার কাছে।'—আবদার করে বললে মুকুন্দ।

'তা এতে আমার আপত্তি কোথায়। টোল খোলার সঙ্গে সঙ্গে বরং ছাত্রও জুটে গেল।' নিমাই সানন্দে সম্মতি জানাল।

অতএব আরম্ভ হয়ে গেল নিমাইয়ের অধ্যাপনা। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল নিমাইয়ের খ্যাতি-প্রতিপত্তি। একের পর এক আসতে লাগল ছাত্র। ভর্তি হলো নিমাইয়ের টোলে।

বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে অগোচর রইল না খবরটা। তারা ত আমলই দিতে চায় না। ঐটুকুন ছেলে, সে আবার খুলেছে টোল। করছে অধ্যাপনা। ব্যাকরণ, ছন্দ, অলংকার—এ সবের বোঝে কিছু।

ছাত্ররা কিন্তু ভারি খুশি নিমাইয়ের অধ্যাপনা শুনে। সবাইয়ের মুখে এক

কথা। 'না, নিমাই পণ্ডিত কিন্তু পড়ান ভাল। এমন ব্যাখ্যা, এমন সূত্র স্থাপন আর খণ্ডন, শুনি না কোথাও'।

সবার মুখেই নিমাইয়ের প্রশস্তি। সবার মুখেই নিমাইয়ের গুণগান। দেখতে দেখতে কিশোর অধ্যাপকের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সারা নবদ্বীপে। দলে দলে বড় বড় অধ্যাপকের টোল ছেড়ে চলে এলো নিমাইয়ের টোলে ছাত্ররা।

মুকুন্দের অতবড় চণ্ডীমণ্ডপ ভরে উঠল ছাত্রের দলে। এখন অধ্যাপকদের ভারি ঈর্ষা হলো। নিমাই পণ্ডিত কেমন পড়ায়, নাই শুনুক হাজির হলো মুকুন্দের চণ্ডীমণ্ডপে।

বিদ্যারসে নিমাই তন্ময়। কখনো বা পরিহাস, আবার কখনো বা অটল-নিটোল-গাম্ভীর্য। আখ্যান-ব্যাখ্যানে মুগ্ধ সকলে। বুদ্ধ, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বিখ্যাত—কেউ উপেক্ষা করতে পারে না নিমাইকে। ভুল ধরে এমন বিদ্যা নাই কারো। দন্তস্ফুট করবে সে শক্তি কোথায়। যেন বিদ্যার নতুন নটরাজ। তার তলায় সকলকেই নিতে হবে আশ্রয়। ভুল ধরতে এসে নিজেরাই ছাত্র বনে যায়।

ছোট বড় সবার মুখে এক কথা—নিমাই। নিমাইয়ের মত পণ্ডিত আর হয় না। নিমাই নামে মাথা নত করে নদীয়ার নগর-জীবন। শ্রদ্ধা জানায় সসম্ভ্রমে নিমাইকে। সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে আজ তার আসন।

কিন্ত এই নিমাই পণ্ডিত যখন বিদ্যার আসন ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে টোল থেকে। সে আর এক অন্য মূর্তি। কৈশোরের চাপল্য যেন পেয়ে বসে তাকে। শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গার বুকে চলে লম্ফ-ঝম্প। জল ছোড়াছুড়ি করে গুরু-শিষ্যে। কখনো বা ছুটাছুটি করে রাজপথে। রঙ্গরসে মেতে উঠে নিমাই পণ্ডিত।

তাজ্জব বনে যায় সকলে। বলাবলি করে পরস্পরে। এত বড় পণ্ডিত, সারা নদীয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে যার নাম, এ কি তার লঘুচিত্ততা। কেউ কেউ তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে। নিমাই কিন্তু চটে না কারো কথায়। উল্টে তাদের সঙ্গেই যোগ দেয় রঙ্গ রসিকতায়।

শ্রীহট্টিয়াদের দেখলে ছেড়ে কথা কয় না নিমাই। পূর্বাঞ্চলের কথার টান দিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের সঙ্গে। নবদ্বীপে ত আর শ্রীহট্টের লোক কিছু কম নেই।

তারাও ছাড়ে না নিমাইকে। খোটা দিয়ে বলে—'বলি বাপু, তোমার বাপের বাড়ী কোন জেলায়? তুমি যে বড় আমাদের ঠাট্টা করছ'?

ওদের কথায় কানই দেয় না নিমাই। ফেটে পড়ে পরিহাসে। হাতমুখ নেড়ে টেনে টেনে কথার পুনরাবৃত্তি করে পরিহাস ভরে।

তেড়ে আসে শ্রীহট্টিয়ার দল। অমনি ছুট্ দেয় নিমাই। সাধ্য কি ওর সঙ্গে তারা পারে। নিমাই তখন পালিয়েছে অনেক দূরে। কোন মতেই পেরে ওঠে না ওরা নিমাই-এর সাথে। হম্বিতম্বি করে নিষ্ফল রোষে আস্ফালন করে

শেষে নিরুপায় হয়ে পড়ে শ্রীহট্টিয়ার দল। আর্জি করে দেওয়ানে। দারোগা-পেয়াদা আসে তদন্তে। নিমাই বেরিয়ে আসে তাদের সামনে। শ্রীহট্টিয়াদের কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে উঠে হাঃ-হাঃ করে। দারোগা-পেয়াদা, তারাও নিমাইয়ের দেখাদেখি হাসে নিমাইয়ের পক্ষ নিয়ে। হাসতে হাসতেই শ্রীহট্টিয়াদের পিঠ চাপড়িয়ে বলে— এ একটা আবার মামলার বিষয় নাকি। এ হলো নিমাই পণ্ডিতের পরিহাস এ নিয়ে তোমরা মাথা খারাপ করো না যাও, বাড়ী ফিরে যাও সকলে।

ব্যস্, মিটে গেল সব ঝগড়া-ঝাটি

নিমাইয়ের মধ্যে নেই ভক্তির ছিটে ফোটা লেশ মাত্র নেই কৃষ্ণরস।

কিন্তু মুকুন্দ দত্ত গাইছে কৃষ্ণ গীত যেই শুনছে, সেই হয়ে উঠছে তন্ময় কেউ হাসছে, আবার কেউবা কাঁদছে কেউবা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উদ্দাম নৃত্য করছে। কেউ গড়াগড়ি করছে মাটিতে। কেউ বা হুঙ্কার ছেড়ে মালসাট মারছে। আবার কেউ বা মুকুন্দের দু'পা ধরে পড়ছে লুটিয়ে।

নিমাই কিন্তু ও পথ মাড়ায় না। ওসবে মনোযোগ নাই তার মুকুন্দ, ও ত তার সহপাঠী। যদি কখনো পথে দেখা হয়, ছেড়ে কথা কয় না মুকুন্দকে। তর্ক চালায় নিমাই ব্যাকরণ নিয়ে তর্ক শুধু বিদ্যা নিয়ে বাহাদুরি। কেউ পেরে ওঠে না নিমাইয়ের সঙ্গে

অদ্বৈত সভায় গান হচ্ছে মুকুন্দের। নিমাই তার ধারে কাছেই ঘেঁসে না ওসবে নেই তার কোন ঔৎসুক্য। শ্রীবাস পণ্ডিত, যে কৃষ্ণ রসে রসিক। যে শ্রবণে কীর্তনে অনুভব করে আনন্দ কীর্তন করে নিজের ঘরে নির্জনে। শ্রবণ করে অদ্বৈত সভায় কৃষ্ণনাম।

সেই শ্রীবাসের সঙ্গে দেখা হলো পথে নিমাইয়ের। অমনি মনে পড়লো ব্যাকরণের 'ফাঁকি'। জিগ্গেস করলে নিমাই শাস্ত্রের ধাঁধাঁ। প্রশ্ন শুনে শ্রীবাস গেলেন হকচকিয়ে। কি উত্তর দিবেন তিনি নিমাইকে। কৃষ্ণকথায় যিনি তন্ময়, যার কাছে কৃষ্ণকথা শোনার জন্য সকলে উৎসুক, তাঁকে ভাষাতত্ত্বের প্রশ্ন করা কেন। তিনি কি ওসবের কিছু বুঝেন ছাই। যে বাক্যে কৃষ্ণ কথা নাই,

সে কি আবার বাক্য হলো। এমন কথায় রুচি নেই শ্রীবাসের। পাশ কাটিয়ে সরে পড়তে চাইলেন শ্রীবাস।

নিমাই হেসে উঠলো হো-হো করে। হাসতে হাসতে বললে—পারলে না শ্রীবাস। ব্যাকরণের ফাঁকিতে তুমি ফাঁকি দিয়েই পালালে।

শেষে এমন হলো, পথে যেই দেখে নিমাইকে 'ঐ ফাঁকি আসছে রে।' বলে সরে পড়ে পাশ কাটিয়ে। বিব্রত সবাই নিমাই-এর ব্যাকরণের ফাঁকিতে।'

একদিন অমনি পালিয়ে যাচ্ছিল মুকুন্দ

পাশের লোককে জিগ্যেস করলে নিমাই। ও আমাকে দেখে পালায় কেন?

বোধ হয় যাচ্ছে গঙ্গাস্নানে।

ও দিকে গঙ্গা কোথায়? ও ত দেখছি আমাকে দেখে উল্টো দিকে মারছে চোঁচা দৌড়।

বুঝতে পারলে নিমাই, তাকেই দেখে ছুটে পালাচ্ছে মুকুন্দ। উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিলে—ও মুকুন্দ, বলি পালাচ্ছ কোথায়?

মুকুন্দ বুঝি শুনেও শুনলো না পালিয়ে গেল ত্রস্ত পদে।

হেঁকে বললে নিমাই—বলি কদ্দিন এমন পালিয়ে বেড়াবে। তোমায় এমন বাঁধনে বাঁধব, তুমি আর পালাতেই পারবে না। তখন বুঝবে ঠেলা। ঘুচিয়ে দেব তোমার বৈষ্ণবত্ব। বাবা, ঘুঘু দেখেছ, ঘুঘুর ফাঁদ ত দেখনি।

আপন ভাবে আপনি নিমাই হেসে উঠলো হো-হো করে।

যারাই শুনে, তারাই রুষ্ট হয়। এমন সৃষ্টি ছাড়া ছেলে জন্মালো কেমন করে। এযে কাউকে মানে না। মানুষ ত কোন ছার, দেব-দেবীর প্রতিও নাই ভক্তি। ঠাকুর-দেবতা মানে না নিমাই। জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে এমন নাস্তিক জন্মালো কেমন করে।

আক্ষেপ করেন শ্রীবাস পণ্ডিতও। এমন সোনা গলানো রূপ যার। সে যদি বৈষ্ণব হতো। কি সুন্দরই মানাতো। তা না খালি বিদ্যার অহঙ্কার। বিদ্যাই দেখছি নিমাইয়ের কাল হলো ও ছাড়া আর কিছু বোঝেই না। বিদ্যাতেই ওর তৃপ্তি। যেন বিদ্যার বহর দেখাতেই ও ব্যস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো শ্রীবাসের বক্ষ বিদীর্ণ করে।

'মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাঞি।
কৃষ্ণ না ভজয়ে সবে এই দুঃখ পাই॥'

যদি নিমাই ত্যাগ করত পাণ্ডিত্যের অভিমান। যদি মন দিত কৃষ্ণ-কথায়। ভজনা করত নিরবধি প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণকে। তাহলে সুখী হতো সকলে।

সারাটা নদীয়া ধন-পুত্র-রসে উন্মত্ত। সামান্য একটা অজুহাত পেলেই মানুষ খরচ করে হাজার হাজার টাকা। কেউ কাউকে মানে না। উচ্ছল নদীয়ার জীবন।

কিন্তু শ্রীবাস আর তিন ভাই—শ্রীরাম, শ্রীপতি আর শ্রীনিধি—নিজের বাড়ীতেই রাতে করে উচ্চস্বরে কীর্তন। পাড়ার লোকেরা কীর্তনের শব্দে পারে না ঘুমাতে। ভীষণ ক্ষেপে উঠে ওদের উপরে। কীর্তন শুনলেই পরিহাস করে। 'বলি বাপু, ধীরে ধীরে কি কৃষ্ণ নাম করা যায় না? না, তাতে পুণ্য হয় না? কৃষ্ণের নাম করবে, তায় এত উন্মত্ততা কেন। নর্তন-কুর্দন, লম্ফ-ঝম্প—বলি বুড়ো বয়সে কি ভীমরতি ধরেছে নাকি। রাতে খেয়ে-দেয়ে ঘুমুতেও দেবে না?

সাবধান করে দিচ্ছি, এবার যদি শুনি ঐ উচ্চস্বরে কীর্তন, রেহাই পাবে না আমাদের হাতে। ঘর-বাড়ী শুদ্দোধা টেনে ভাসিয়ে দেব গঙ্গায়। তখন বুঝবে কীর্তনের ঠেলা। যত হাড় হা-ভাতে বামুনের দল।

পাষণ্ডীদের আস্ফালনে চুপ করে থাকে শ্রীবাসেরা চার ভাই। মুখ দিয়ে কারো 'রা' টিও বেরোয় না। জীবের কৃষ্ণবিদ্বেষ দেখে বুক ফেটে যায় ওদের।

'শুনিয়া বৈষ্ণব সব মহা দুঃখ পায়।
কৃষ্ণ বলি সবেই কান্দেন উচ্চরায়॥'

কান্নায় আকুল হয়ে শ্রীবাস ডাকেন—'হে দীনদয়াল প্রভু, কবে তুমি আসবে, কবে জাগবে তুমি, কবে দেখা দেবে আমাদের। কতদিনে এসব দুঃখের হৈব নাশ। জগতের কৃষ্ণচন্দ্র করহ প্রকাশ॥'

অবশেষে অসহ্য হয়ে উঠলো পাষণ্ডীদের অত্যাচার। সকল বৈষ্ণব মিলে হাজির হলো আচার্য অদ্বৈতের কাছে। নিবেদন করে বললে—'আর পারছি না আচার্যদেব। আপনি এর একটা বিহিত করুন।'

'শুনিয়া অদ্বৈত হয় ক্রোধ-অবতার।
সংহারিমু সকল বলি করয়ে হুঙ্কার॥'

ভয় নেই তোমাদের। চক্রধারী শ্রীমধুসূদন আসছেন। এই নদীয়াতেই তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। ধৈর্য ধর তোমরা।

'করাইমু কৃষ্ণ সর্ব-নয়নগোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥'

আর কয়েক দিন অপেক্ষা কর ভাইসব। সকলেই অনুভব করতে পারবে কৃষ্ণের আগমন।

আচার্যদেবের আশ্বাস বাণী শুনে আশস্ত হয় সকলে। ভুলে যায় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথা। মেতে উঠে কৃষ্ণ-সংকীর্তনে।

সেদিন পথের মাঝেই দেখা হলো শ্রীবাসের সঙ্গে নিমাইয়ের। সশিষ্য নিমাই চলেছে হনহন করে। যেন কত ব্যস্ত সে। তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করলে নিমাই শ্রীবাসকে।

'বলি ওহে উদ্ধতের শিরমণি, বলি চলেছ কোথায় ?'

জিগগেস করলে শ্রীবাস নিমাইকে ? নিমাই কোন উত্তরই দিলে না। শুধু হাসতে লাগল মৃদু মৃদু।

তাই না দেখে শ্রীবাস বললে—খুব ত বিদ্যার জাহাজ হয়েছ। বলি ও ছার বিদ্যায় কি কিছু আছে, যদি না কৃষ্ণভক্তি মিলে ? লোকে পড়াশুনা করে কেন ? কৃষ্ণভক্তি জানবার জন্যই ত। এত যে পড়াশুনা করলে, বলি পেলে কিছু ? যদি সত্যি কিছু পেতে চাও, শ্রীকৃষ্ণের ভজনা কর কৃষ্ণ ভজনের জন্যেইত এসেছ সংসারে। অতএব তা ব্যর্থ হতে দেবে কেন ?

দাঁড়াল না নিমাই। অত তত্ত্ব কথা শোনার সময় কোথায় তার। যেতে যেতে বললে—'পণ্ডিত, অত অধৈর্য হয়ে উঠছ কেন, ধৈর্য ধরো সবুরে মেওয়া ফলে।'

সেদিন নিমাইকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছিল গদাধর।

নিমাই ছুটে গিয়ে ধরলে তার দু'হাত চেপে। বললে—'কি হে গদাই পণ্ডিত, পালাচ্ছ কোথায়। শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে যাও। কই বল দেখি মুক্তির লক্ষণ কি ?'

হকচকিয়ে গেল গদাধর। এত দেখছি মহাবিপদ। সহজে ত নিমাই ছাড়বে না। উত্তর একটা ওকে দিতেই হবে। তাই আমতা আমতা করে বললে—'আমার ত মনে হয়, আত্যন্তিক দুঃখের নাশই হলো মুক্তির প্রধান লক্ষণ।'

উত্তর শুনেই নিমাই ধরলে ঠেসে। এমন সব দোষ ধরতে লাগল ব্যাখ্যার, গদাধরের সাধ্য নাই খণ্ডন করে তার। এখন কেমন করে নিমাইয়ের কবল থেকে মুক্তি পাবে সেই চিন্তায় হয়ে উঠলো অস্থির। বুঝতেই পারল মুক্তির পথ বড় ধুম্রাচ্ছন্ন।

শেষে গদাধরের অবস্থা দেখে ছেড়ে দিলে নিমাই। বললে—আজকে কোথায় যাচ্ছ যাও। কালকে গিয়ে আবার তোমায় ধরব। আত্যন্তিক দুঃখের নাশ হলো কেমন করে মুক্তির লক্ষণ, তা তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে।

এমনি করে যেই পড়ে নিমাইয়ের সামনে, রেহাই পায় না কেউই। কাউকে সহজে মুক্তি দেয় না নিমাই। সে যত বড়ই পণ্ডিত হোক। ন্যায়, স্মৃতি, দর্শন—হলেই বা বেদান্তের অধ্যাপক। কাউকে কি ডরায় নাকি নিমাই। যেন সর্বশাস্ত্র চূড়ামণি। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী।

পথে ঘাটে, বড় বড় পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে, যেখানেই যাও, সারা নবদ্বীপ জুড়ে শুধু নিমাই পণ্ডিতের কথা। এমন আর হয় না। এমন পাণ্ডিত্য কোথাও যায় না দেখা। বুঝি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পেটেও নেই এত বিদ্যে।

॥ ছয় ॥

পড়শীরা এসে বললে শচীদেবীকে। ছেলে ত ভাল রোজগারপাতি করছে। ছড়িয়ে পড়ছে সারা নবদ্বীপে তোমার নিমাইয়ের নাম। মস্ত বড় পণ্ডিত হয়েছে। এবার ছেলের বিয়ে খা দাও। ঘরে টুকটুকে লক্ষ্মীর পিতিমে বউ আসুক। নিমাই আর এমনি কতদিন থাকবে ?

বেঁধে দাও ওর ঘর। সংসারে বাধা পড়ুক নিমাই।

শচীদেবী খুশি হয়ে বলেন—'তা তোমাদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বাছা, নিমাই ত আমার বড়টিই হয়েছে। এবার বিয়ের কথা ভাবতে হবে'বৈ কি।

তা কে আর ভাববে বলো। তাই, তোমাকেই ত সব ভাবতে হবে। তুমিই ত এখন নিমাইয়ের অভিভাবক।

তা বাছা তোমরা বললেই ত আর হয় না। ছেলের মতামতও ত একটা চাই। তাছাড়া শুধু মতামত চাইলেই ত হয় না। আমরা নিতান্ত গরিব মানুষ। কে কন্যা দেবে বলো ?

যদিও বা কেউ মত করে, তায় সুন্দরী মেয়েই বা কোথায় পাচ্ছি। আমার নিমুর জন্য লক্ষ্মীর প্রতিমার মত কন্যে চাই। শুধু ত আর কন্যে হলে হবে না, পালটি ঘর কিনা তাও ত দেখতে হবে।

হাসতে হাসতে প্রতিবেশীরা বললে—আই, তোমায় অত ভাবতে হবে না গো। তোমার নিমাই-এর কি আর কন্যার অভাব হবে। তুমি যেমনটি চাইছ, তেমনটিই পাবে। একবার শুধু মুখের কথাটি ফেল না, কন্যে আমরা হাজির করে দিচ্ছি।

কি জানি বাছা, তা একবার নিমাইকে জিগ্‌গেস করে দেখি। ওকে আবার কোন কিছু বলতেও বড্ড ভয় করে। যা রাগী ছেলে। শুনলে হয়তো অনর্থ বাঁধাবে।

শচীদেবী বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

প্রবোধ দিয়ে বললে প্রতিবেশীরা—তা অত ভয়েরই বা কি আছে। নিমাই আর তেমনটি নাইগো। এখন বড়টি হয়েছে। টোল খুলে বসেছে। চারিদিকে কত নাম। বুঝলে আই ; সুখ্যাতিতে সারাটা নদীয়া ভরে গেছে। এখন

কি আর সেই রাগ-গোসা ওর আছে। তুমি একবার সাহস করে জিগ্গেস করে দেখো না।

তা তোমরা যখন এত করে বলছ. নিমাই ফিরুক টোল থেকে। ধীরে সুস্থে তখন জিগ্গেস করব।

হ্যাঁ, তাই জিগ্গেস করে রেখো।

উঠে গেল প্রতিবেশীরা শচীদেবীর বাড়ী থেকে

কি আশ্চর্য, একটু পরেই কোত্থেকে বনমালী ঘটক এসে হাজির।

শচীদেবী ভালভাবেই চেনেন বনমালীকে। বিয়ের ঘটকালীতে ওস্তাদ ও। বনমালী ঘটক বললে এক ডাকেই চিনতে পারবে নদীয়াব আবাল, বৃদ্ধবনিতা সকলেই।

সেই বনমালী ঘটক এসে প্রস্তাব রাখলে শচীদেবীর কাছে। বললে—'জানো আই. একটি ভারি ভালো মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। নিমাইয়ের সাথে সুন্দর মানাবে। ছেলের বিয়ে দেবে ত বলো. তাহলে সম্বন্ধ করি।'

উৎসুক হয়ে শচীদেবী বললেন—তা সে কার মেয়ে গো? দেখতে কেমন?

—বল্লভাচার্যের মেয়ে। নাম তার লক্ষ্মী. দেখতেও লক্ষ্মীর পিতিমাব মতো। তাকে দেখলে তুমি অপছন্দ করতে পারবে না।

বনমালীর কথা শুনে যেন আত্মহারা হয়ে ওঠেন শচীদেবী। তুমি কার কথা বলছ, আমাদের সেই লক্ষ্মী। তাকে ত আমি ভালভাবেই চিনি।

—তবে আর কি, মত দাও। যোগাযোগটি পাকা করে ফেলি।

এবার কিন্তু চট্ করে শচীরাণী কোন জবাব দিতে পারলেন না। একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো তাঁর ললাটে। তিনি কেমন যেন নিজের চিন্তায় নিজেই গেলেন ডুবে।

বনমালী তাকিয়ে রইলো আই-এর মুখের দিকে।

তখন— 'আই বলে পিতৃহীন বালক আমার।
জীউক পড়ুক আগে তবে কার্য আর॥' চৈ. ভা.

বনমালী কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়লো। শচীদেবীর ভাবান্তর অবশ্য তিনি লক্ষ্য করলেন। তাই আর কথা বাড়ালেন না। দুঃখিত অন্তরে উঠে পড়লেন শচীদেবীর বাড়ী থেকে। চলে গেল বনমালী।

বসে বসে স্মৃতি রোমন্থন করছেন শচীদেবী।

লক্ষ্মী, বল্লভাচার্যের মেয়ে সেই লক্ষ্মী। যে ছিল শৈশবে নিমাইয়ের খেলার সাথী। ছিল নিমাইয়ের লীলা-সঙ্গিনী। শৈশবে কত খেলাই না খেলেছে দু'জনে। একে একে কত কথাই না মনে পড়ছে। কত স্মৃতি। কত কাহিনী। না, শচীদেবী তার কোন কিছুই ভুলেন নি।

গঙ্গায় কত মেয়েরাই ত স্নান করতে আসত। হাতে নিয়ে আসত পূজোর থালা। তাতে সজ্জিত থাকত ফুল, বেলপাতা আর নারকেল নাড়ু, মিষ্টান্ন মণ্ডা। মনের মধ্যে একটা ভীষণ ভয়। কি জানি নিমাই যদি এসে পড়ে। তা হলেই সর্বনাশ। পূজো অর্চনা কিছুই আর হবে না। সব দেবে পণ্ড করে। ব্যস্ত হয়ে উঠত তারা। ইতিউতি তাকাত। না জানি নিমাই কোথায় ঘুপটি মেরে রয়েছে।

কিন্তু বিরাগের মধ্যেই ত অনুরাগ। বিতাড়নের মধ্যেই যে আমন্ত্রণের আকুতি। তাকে অবচেতন মনে অস্বীকার করবে কেমন করে। যার জন্য ভয়, তিনিই ত হাজির হন বরাভয় নিয়ে।

পূজো করতে বসে নয়ন মুদে স্মরণ করে সেই বিশ্ববিমোহন গোর-সুন্দরকে। আহ্বান করে অন্তরের ভক্তি-চন্দন দিয়ে।

নিমাই ঘরে বসে পড়ছিল। সহসা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। অনুভব করল কেমন যেন একটা অদৃশ্য আকর্ষণ। পুঁথি ফেলে ছুটে চললো গঙ্গার ঘাটে। কোন দিকে খেয়াল নাই তার। নামছে গঙ্গায় নিমাই। পায়ের জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে পড়ছে স্নানার্থীদের গায়ে। ভ্রূক্ষেপ নাই কোন দিকে তার। রেগে আগুন স্নানার্থীরা। গালাগালি করতে লাগল নিমাইকে।

ওরা ত জানে না, এ কার পায়ের জল। এ কার পদ সিঞ্চিত শান্তি বারি। এ পদাম্বু হরণ করে হৃদয়ের সর্বসন্তাপ। এ যে সকল দহন হরণ অমিয় নির্যাস।

এদিকে কোন খেয়ালই নাই নিমাইয়ের। কে কি বললো তাতে কান দেবার অবসর কোথায় ওর। ভক্তের ডাকে ভক্তাধীন ভগবানের প্রাণ যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাই ত ছুটে এসেছে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিমাই। এসেছে ছোট হয়ে। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে।

তাড়াতাড়ি স্নান করে উঠে এল পাড়ে। ছুটে গেল মেয়েদের কাছে। দেখলে মেয়েরা পূজো করছে। করুণার্দ্র ঢল ঢল নয়নে তাকিয়ে বললে, 'তোরা কার পূজো করছিস্। এই আমার পূজো কর। আমি বর দেব তোদের।'

নিমাইকে দেখে রাগে ফেটে পড়লো মেয়েরা।

—'কে রে দস্যি ছেলে! তুই কি দেবতা নাকি। তোকে যে পূজো করব?'

নিমাই এবার আপন ব্যক্তিত্বে হয়ে উঠলো গম্ভীর। বললে—

—'দেবতা নয় ত কি? তোরা ত আমাকেই ডাকছিস।'

—'থাম, দেখাচ্ছি তোর ডেঁপোমি।'

আর যায় কোথা। নিমাই ছোঁ মেরে সাজি থেকে ফুল নিয়ে রাখলে নিজের মাথায়। কেড়ে নিলে মিষ্টি মণ্ডা। খেতে আরম্ভ করলে গপাগপ্ মুখে পুরে। সব শেষ মুহূর্তের মধ্যে।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল মেয়েরা। দুঃখে রাগে যেন ফেটে পড়ল সকলে। বললে—'বড় বাড় বেড়েছিস্, না। ঠাকুর দেবতার সাথে ইয়ারকি। ঠাকুরের নৈবেদ্য খেলি ত। বুঝবি।—তখন টেরটি পাবি।'

ভয় পাবে কি নিমাই। আরো এগিয়ে গেল মেয়েদের দিকে। বললে—'এই, বিয়ে করবি আমাকে।'

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো মেয়েদের মুখ। নীচুর দিকে মুখ করে অস্ফুটে বললে—কি অসভ্য!

লজ্জারুণ মুখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো মেয়েরা। কেউ কোথাও শুনে ফেলেনি ত। কেউ তাকাতে পারে না নিমাইয়ের মুখের দিকে। কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সমস্ত দেহ। থর থর করে কাঁপতে থাকে সারা অঙ্গ।

ওদের ভাবগতিক দেখে নিমাই বললে—

'এই তোদের ঐ ফুলের মালা পরিয়ে দে আমার গলায়।'

গলা বাড়িয়ে দেয় নিমাই। এ মা, ছিঃ-ছিঃ কি লজ্জা। জিব কাটে মেয়েরা। কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না। সকলে যেন জড় পাষাণ। লজ্জায় যেন মরমে মরে যাচ্ছে সকলে।

এবার রাগে ফেটে পড়ে নিমাই। রোষ ভরে বলে—'কি রে দিলি না তো মালা, বুঝবি ঠেলা, বুড়ো বর পাবি।'

বুড়ো বরের কথা শুনে কেউ কেউ হয়ে উঠে বিষাদাচ্ছন্ন। গুমরে উঠে মনে মনে। চাপা কণ্ঠে ভর্ৎসনা করে—'এ মা, একি অলুক্ষুণে কথা গো। অসভ্য ছেলে, মুখে যা আসছে তাই বলছে।'

নিমাই আর সেথায় দাঁড়ায় না। সঙ্গী খুঁজতে ব্যস্ত সে। পুজো চায়। চায় মালা। সে চায় ভক্তের প্রিয় সম্ভাষণ।

ঐ লক্ষ্মীও সেদিন এসেছিল গঙ্গার ঘাটে। এনেছিল সাজি সুসজ্জিত করে পুজোর মাঙ্গলিক। দাঁড়িয়েছিল অদূরে। নিমাই ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো লক্ষ্মীর কাছে। তাকাল মুখের পানে। কচি বাচ্চা ভারী মিষ্টি মেয়ে। নিমাই বললে—

'আমায় তুমি পূজো করবে ?'

চোখের দিকে চোখ তুলে, এক পলক দেখে নিয়ে নত করল তার আঁখি-পল্লব। কোন উত্তর দিল না লক্ষ্মী।

চোখের ভাষায় জানাল বুঝি নীরব সম্মতি। চোখে চোখ রেখে যেন আহ্বান জানাল ওকে। বললে—'এস না, এগিয়ে এস। তোমারই ত পথ চেয়ে আছি। তোমাকেই পূজো করব বলে।'

লক্ষ্মী এগিয়ে এল নিমাইয়ের কাছে। বসে পড়ল চরণ প্রান্তে। ভক্তিভরে পুষ্পার্ঘ্য দিল চরণ যুগলে। ললাটে পরিয়ে দিল চন্দনের টিপ। গলদেশে ঝুলিয়ে দিল মালা। ভ্রূ-সন্ধিতে কুটস্থ চৈতন্যে লাগিয়ে দিল কুমকুমের তিলক। ভাবঘোরে তন্ময় লক্ষ্মীদেবী। যেন মনের মানুষটিকে অনেক দিন পরে একান্ত করে পেয়েছে মনের গভীরে। তাইত সাজাচ্ছে মনের মত করে। যেন আজ লক্ষ্মী ধ্যানমগ্না। অন্তরের ভক্তিঅর্ঘ্য উজাড় করে সমর্পণ করছে প্রাণপ্রিয় প্রাণেশ্বরকে।

তন্ময়তার মধ্যেই শেষ হলো লক্ষ্মীর আরাধনা। হাতে করে নিমাইয়ের সামনে তুলে ধরল নৈবেদ্যের থালি। তাকিয়ে রইল দু'চোখ মেলে নিমাইয়ের দিকে। যেন বললে—'কৈ গো প্রভু, হাতে তুলে গ্রহণ করো আমার নৈবেদ্য !'

নিমাই লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা টেনে তুলে নিল থালা থেকে পূজোর নৈবেদ্য। পরম পরিতৃপ্তিতে গ্রহণ করল মিষ্টান্ন।

ভারি খুশি হলো লক্ষ্মী। থালাটি পাশে রেখে। ঘোমটা টেনে মাথায়, হাঁটু গেড়ে প্রণাম করল নিমাইকে। যেন নিবেদন করল নিজেকে। এ নিবেদন, আত্ম নিবেদন।

তারপর লুটিয়ে পড়ল লক্ষ্মী—

লুটিয়ে পড়ল শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ তীর্থে। এই তীর্থই ত তার সকল তীর্থের সার। এই চরণই ত তার সুখ-শান্তি-স্বর্গ। ইহকাল আর পরকালের কামনা।

ভাবান্তর ঘটে শচীদেবীর। বাল্যের সেই লক্ষ্মী। বনমালী আচার্য বলছে তারি কথা। যদি তা হয়, ভালই ত। কিন্তু !

এই কিন্তুই ভাবিয়ে তুললো তাঁকে। বনমালীকে সে পুরোপুরি মত দেবে কেমন করে। কি জানি নিমাই মত দেবে কি না। যে লক্ষ্মী ছিল নিমাইয়ের খেলার সাথী, বাল্যের সহচরী। তাকে কি আদৌ সে বিয়ে করবে। বুঝতে পারছেন না শচীদেবী। হয়ত শুনলে সে হেসেই দেবে উড়িয়ে।

কেমন করে নিমাইকে কথাটা বলবেন সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন শচী দেবী।

টোল থেকে ফিরছিল নিমাই।

পথেই দেখা হয়ে গেল বনমালীর সঙ্গে।

জিগ্গেস করলে নিমাই—কোথায় গিয়েছিলে ?

তোমাদের বাড়ীতে গো।

কেন, ব্যাপার কি ?

তোমার মাকে, তোমার বিয়ের কথা বলতে। হাতে একটা খুব ভাল মেয়ে ছিল, গিয়েছিলাম, তারই হদিস দিতে।

'তা মা কি বললো ?' মৃদু মৃদু হাসতে লাগল নিমাই।

'কি আর বলবেন। ভাল করে কথাই বললেন না। আই কোন আমলই দিলেন না। বুঝলে বাবা নিমাই, বড় দুঃখ পেলাম। তাই উঠে এলাম তোমার বাড়ী থেকে।'

কোন প্রত্যুত্তর দিলে না নিমাই বনমালীকে। একবার মুখের দিকে তাকিয়ে চলে গেল বনমালী।

গম্ভীর মুখে বাড়ী ফিরে এলো নিমাই।

জিগ্গেস করল শচীদেবীকে—'বনমালী আচার্য এসেছিল। তাকে ফিরিয়ে দিলে কেন ?'

মনে মনে চমকে উঠলেন শচী দেবী। এ কিসের ইঙ্গিত। পরক্ষণে উৎফুল্ল হয়ে তাকালেন নিমুর মুখের দিকে।

—'হ্যাঁ গো মা, আমি ত এখন গৃহস্থ। তাই আমাকে গৃহধর্ম পালন করতে হবে। গৃহিণী না এলে তা সম্ভব হবে কেমন করে।'

যেন বিরাট একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেল শচী দেবীর মাথা থেকে। কত চিন্তাই না তিনি করছিলেন। ভেবে আকুল হচ্ছিলেন, কেমন করে বলবেন নিমাইকে কথাটা। বনমালীর সঙ্গে তাহলে দেখা হয়েছিল নিমাইয়ের। তা না হলে নিমাই জানল কেমন করে বনমালী এসেছিল ওর কাছে।

'আমিও ত তাই চাই। লক্ষ্মী ভারি ভাল মেয়ে। রূপে-শীলে, কুলে-মানে অদ্বিতীয়া। তা তোর যখন অমত নাই আমি ডেকে পাঠাই বনমালীকে।'

খবর পেয়েই বনমালী এলো। আদর করে শচীদেবী বসালেন তাকে। তারপর বললেন—'তুমি যে কাল প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলে, জানো, আমার তাতে অমত নাই।'

বনমালী আই-এর কথা শুনে ভারি খুশি। উৎফুল্ল হয়ে বললে—'ঠিক আছে। আমি এখুনি যাচ্ছি বল্লভ আচার্যের বাড়ী। তোমার সম্মতি যখন পেয়েছি, ও তোমায় কিছু ভাবতেই হবে না।'

চলে গেল বনমালী। মনে মনে ইষ্টদেবকে স্মরণ করলেন শচীদেবী। হে ঠাকুর তাই যেন হয়। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো তুমি।

বল্লভাচার্য বনমালীকে দেখে সসম্ভ্রমে বসতে আসন দিলেন। পাদাঅর্ঘ্য ছিলেন পদপ্রক্ষালনের জন্য! বল্লভাচার্যের বিনয় দেখে অভিভূত হলো বনমালী। খুশি হয়ে বললে—'আচার্যদেব, যদি ভরসা দেন ত একটা কথা বলি।'

'তা তুমি অত কিন্তু করছ কেন। কি বলতে চাইছ বলেই ফেল।'

'তোমার কন্যার জন্য একটা ভাল সম্বন্ধ এনেছি। জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে বিশ্বম্ভর। যদি বল, তাহলে লাগিয়ে দিই বিয়েটা। দুটো হাত এক করে দিই।'

প্রস্তাব শুনে লাফিয়ে উঠল বল্লভাচার্য। বললে—'তা যদি হয়, সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হন, কিংবা কমলা গৌরী যদি সুপ্রসন্না হন আমার লক্ষ্মীর প্রতি, তাহলে ত এমন জামাতা মেলা ভাগ্যের কথা।

এমন সর্বগুণের সাগর, পণ্ডিত শিরোমণি আমার জামাই হবে, এমন কথা ভাবতে যে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। কিন্তু বনমালী, আমি যে নির্ধন। বলতে বড় লজ্জা করছে। কিছু দেওয়ার সামর্থ ত নেই আমার।

'কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া।
এই আজ্ঞা যাহ তুমি আনিবে মাগিয়া॥' চৈ, ভা,

তুমি ত আমার অবস্থা সব জানই। ওর বেশী কিছ আর দিতে পারব না।'

—'তোমায় কিছু দিতে হবে না।'

গঙ্গার স্নানে যাচ্ছে লক্ষ্মী। আর টোল থেকে ফিরছে নিমাই। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল দুজনের। মুহূর্তে 'পূর্বসিদ্ধ ভাব' মনে পড়ে গেল দুজনের। নিমাই শ্রীকৃষ্ণ আর লক্ষ্মী শ্রীলক্ষ্মী।

পূর্বলীলায় লক্ষ্মীর মনে জেগেছিল এক বাসনা।

তিনি হবেন ব্রজ-বিলাসিনী।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব। যিনি ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী। তিনি কেমন করে ধারণ করবেন বিরহিণীর বেশ ?

লক্ষ্মী কিন্তু কিছুতেই ছাড়ছেন না কৃষ্ণকে। এ প্রার্থনা তার মঞ্জুর করতেই হবে। তিনি চান ব্রজরস আস্বাদন করতে।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব।

চাই সাধন ভজন। চাই স্মরণ, চিন্তন, পূজন, অর্চন।

আমি তাই করব প্রভু। জপ তপে তুষ্ট করব আমার শ্যামসুন্দরকে। কাঁদব বিরহিনী বেশে আকুল হয়ে। অশ্রু-পুষ্পে নিজেকে নিবেদন করব শ্যামসুন্দরের পায়। কান্নার এক নামই ত প্রেম। আমার অশ্রুধোয়া সেই প্রেমই নিবেদন করব শ্যামসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের পায়। প্রভু আমি চাই ব্রজেন্দ্রসুন্দরকে দর্শন করতে।

আত্মনিমগ্না হলেন লক্ষ্মী কঠোর তপে। স্মরণ, চিন্তন আর মনন-এর মধ্যেই ধরে থাকলেন শ্রীকৃষ্ণবরতনু। নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে অর্পণ করলেন শ্রীকৃষ্ণকে। নিমগ্ন হলেন কৃষ্ণ সাধনায়।

এক প্রতিজ্ঞা আছে শ্রীকৃষ্ণের। কি সে প্রতিজ্ঞা ?

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

যে আমাকে যেমন ভাবে সাধনা করবে, তাকে আমি সে রূপেই দেখা দেব। 'যে জৈছে ভজে, কৃষ্ণ তার ভজে তৈছে।'

অতএব লক্ষ্মীর সাধনায় সন্তুষ্ট হলেন শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ণ হলো লক্ষ্মীর অন্তরাকুতি। লক্ষ্মীর বাঞ্ছা পূর্ণ করতেই শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন। কোথায় ? এলেন নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন শ্রীলক্ষ্মীকে। কিন্তু পূর্বভাবটি হলো বর্জিত।

এ হলো স্বাভাবিক ভাব। কান্তাভাব। 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্য সার।' এ কথাই ত বলেছিলেন রায় রামানন্দ। ব্রজের প্রীতিই কেবলা প্রীতি। প্রেমানুগা সেবাই কান্তাভাবের সেবা। 'তাতে আছে নিষ্ঠা, পরিচর্যা, মমত্ববুদ্ধির গাঢ়তা, গৌরববুদ্ধির হীনতা, আর নির্বিচার অনুগতি।'

তাই বল্লভাচার্যের গৃহে এসে লক্ষ্মীর ভজন, চিন্তন আর স্মরণে ঘটেনি বিন্দুমাত্র ছেদ। তিনি আস্বাদন করতে চান ব্রজের সেই কান্তাপ্রেম।

গঙ্গার পথে দু'জনেব এই দেখা, স্মরণ করিয়ে দিল সেই পূর্ব-সিদ্ধভাব।

বল্লভাচার্যের গৃহে চলতে লাগল উদ্যোগ আয়োজন। স্থির হয়েছে শুভ লগ্ন। সারা হলো অধিবাস। বিপ্রগণ বেদধ্বনিতে মুখরিত করে তুলল চতুর্দিক। ব্রাহ্মণগণকে দিব্যগন্ধ চন্দন আর মাল্য দিয়ে তুষ্ট করলেন। যথাবিধিরূপে বল্লভ আচার্য পরম সন্তুষ্ট চিত্তে শেষ করলেন অধিবাস।

শুভক্ষণে গোধূলি লগ্নে বিশ্বম্ভর এলো আচার্যের বাড়ীতে। তখন—

'সংভ্রমে আসন দিয়া যথাবিধিরূপে।
জামাতারে বরিলেন পরম কৌতুকে॥' —চৈ. ভা.

আজ বল্লভাচার্যের সত্যি সৌভাগ্যের সীমা নাই। যথাযোগ্য পতি মিলেছে তার লক্ষ্মীর। ক্রমে ঘনিয়ে এলো শুভ লগ্ন। কন্যাকে সাজিয়ে আনা হলো বিশ্বম্ভরের কাছে। সভাস্থ সকলে হরিধ্বনি করে উঠলো।

নিমাইকে ধরে তুললো আপ্তবর্গ। তখন—

'তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সাতবার।
যোড হস্তে রহিলেন করি নমস্কার॥'

অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল চারিদিক থেকে। বরপক্ষ, কন্যাপক্ষ মেতে উঠল পুষ্পযুদ্ধে। লক্ষ্মী দিব্য মাল্য দিয়ে বন্দনা করলো প্রভুর চরণ। তারপর আত্মসমর্পণ করল লক্ষ্মী প্রণাম করে। চারিদিক থেকে জয় জয় শব্দে উঠলো হরিধ্বনি। এই জয়ধ্বনির মধ্যেই নিমাইয়ের বামপাশে গিয়ে আসন গ্রহণ করলো লক্ষ্মী।

বেদবিধি মতে বল্লভাচার্য কন্যা সম্প্রদান করলেন নিমাইকে।

পরের দিন।

লক্ষ্মীকে নিয়ে দোলায় চড়ে নিমাই এলো বাড়ীতে।

পাড়াপ্রতিবেশী ব্রাহ্মণ গৃহিণীগণকে সঙ্গে করে শচীদেবী নববধূকে বরণ করে নিলেন ঘরে।

ব্রজেন্দ্রসুন্দরের পাশে লক্ষ্মী এলো ব্রজবালা হয়ে।

শচীদেবীর হৃদয়ের সর্বসন্তাপ বুঝি হলো দূরীভূত। হলো বুঝি সব দুঃখের অবসান। যেন অনেকটা চিন্তা থেকে মুক্ত হলেন তিনি। নিমাই তার সংসারী হয়েছে। তবে আর ভয় কি। বিশ্বরূপের মত ও আর কাঁদাবে না আমাকে। পালিয়ে যাবে না সংসার ত্যাগ করে।

একটা নিশ্চিন্ততার দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার খুলে এলো বেরিয়ে। যেন বড় শান্তি পেলেন শচীদেবী। হৃদয়টা একটা অনুভূত আনন্দে ভরে উঠল তাঁর।

নিমাইয়ের পাশে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। যেন নারায়ণের পাশে শ্রীলক্ষ্মীর অবস্থান। যেন জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ জ্যোতির্ধাম। ঘর-বার আলো হয়ে আছে। কি এক পরম অদ্ভুত জ্যোতিতে হয়ে উঠছে জ্যোতির্ময়। অদ্ভুত সে জ্যোতি। শচীদেবী দেখেন পুত্রের পাশে যেন অগ্নিশিখা। চোখ পালটালেই অন্তর্ধান করে। বিস্মিত হন মনে মনে শচীদেবী।

ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করেন পদ্মগন্ধ। কোথা থেকে আসে এই গন্ধ। বুঝে উঠতে পারেন না কিছুই। চিন্তা করেন মনে মনে। কেন এমন হয়। এ কি শুভ না অশুভ। পরক্ষণে স্থির করেন। এ কন্যা বুঝি কমলার অংশোদ্ভুত। তাই কন্যা-অঙ্গ থেকেই আসছে এই পরম সৌরভ। মনটা তাঁর ডুবে যায় আনন্দ-সাগরে।

নাই পূর্বের দারিদ্র্য দুঃখ। অভাব অনটন করে তুলে না সংসারকে দুঃখময়। যে দিন থেকে লক্ষ্মী এসেছে ঘরে, যেন কোথা থেকে এসে যাচ্ছে সব। যেন তিনি ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত চরাচর। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, মানুষের শক্তি কোথা তা' বুঝতে পারে।

সেদিন টোল থেকে বাড়ী ফিরছে নিমাই। পথে দেখা হয়ে গেল দশ থেকে বিশ জন একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে। নিমাই পরম ভক্তিভরে তাঁদের বন্দনা করলো। তারপর বললে—'আপনারা যদি অনুগ্রহ করে আমার বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন তাহলে কৃতকৃতার্থ হই। দয়া করে চলুন দরিদ্রের কুটীরে।'

নিমাই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে করে নিয়ে হাজির হলো বাড়ীতে। ডাক দিয়ে বললে মাকে—'মাগো, অতিথি নারায়ণ এসেছেন বাড়ীতে। এঁদের ভিক্ষার বন্দোবস্ত করো।'

মহা বিপদে পড়লেন শচীদেবী। ঘরে যে ক্ষুদ কুঁড়ো কিছুই নাই। এখন কি দিয়ে অতিথি সেবা করবেন তিনি। ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েন।

গৃহের মধ্যবর্তিনী লক্ষ্মীপ্রিয়া। তিনি বুঝতে পারেন সব।

শচীদেবী এসে বললেন—'দেখেছ বৌমা, নিমাইয়ের কান্ড। এখন কি উপায় হবে বলত। আমি ত কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছি না।'

'ও তুমি কিছু ভেবো না। আমি এই ত স্নান করে আসছি। এসেই চাপিয়ে দেব রান্না। তুমি একটু জোগাড়যন্ত্র করে দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'জোগাড়-যন্ত্র যে করতে বলছ বৌমা, ঘরে কিছু থাকলে তবে ত করব।' কোন উত্তর না দিয়ে ত্রস্ত স্নানে যায় লক্ষ্মীপ্রিয়া।

নির্বাক শচীদেবী তাকিয়ে থাকেন প্রিয়ার গমন পথের দিকে।

ক্ষণ পরে দেখেন কে যেন সমস্ত তৈজস-পত্র নিয়ে আসছে বাড়ীতে। সন্ন্যাসীদের সেবার জন্য যা যা প্রয়োজন, এসেছে সবই। আশ্চর্য হয়ে যান শচীদেবী।

লক্ষ্মী যার বাড়ীতে রাঁধুনী, তার কি কখনো কোন জিনিসের অভাব হয়, না হতে পারে।

তাড়াতাড়ি শচীদেবী করে দেন রান্নার আয়োজন। লক্ষ্মীদেবী স্নান সেরে

এসে বললে—'এই ত মা, তোমার সব আয়োজনই প্রস্তুত। আমার বরং আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। ও তুমি কিছু ভেবো না। উনুনটা ধরিয়ে দাও। আমি কাপড় ছেড়ে এলাম বলে।'

যেন সত্যি কত দেরী করে ফেলেছে। সেজন্য কৈফিয়ৎ দিচ্ছে লক্ষ্মীপ্রিয়া। বৌমার বিনয় দেখে ভারী খুশী হন শচীদেবী। ভাবেন, বৌমা নামেও লক্ষ্মী আর বিনয়েও ঠিক লক্ষ্মীরই মতো।

পরম সন্তোষে বিবিধ রান্না করে লক্ষ্মীপ্রিয়া। যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

নিমাই সবিনয়ে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য সন্ন্যাসীদের ডেকে আনে অন্দরমহলে নিজে বসে থেকে খাওয়ায় সকলকে।

নিমাইয়ের সেবায় সন্তুষ্ট সন্ন্যাসীবৃন্দ। অতিথির সেবাই ও গৃহস্থের মূল কর্ম। যে গৃহস্থ হয়ে আতিথ্য ধর্ম পালন করে না, পশুপক্ষীর চেয়েও অধম সে। অতিথিকে কখনো বিমুখ করতে নেই। বাড়ীতে যা আছে তাই দিয়ে করো অতিথিকে সন্তুষ্ট। কখনো আতিথ্য ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হবে না। আর গৃহে অভাবও থাকবে না যেখান থেকে হোক তিনিই দেবেন জুটিয়ে।

অতিথি সেবায় কখনো বিরক্তি নাই লক্ষ্মীপ্রিয়ার। হাসিমুখে একাই করে সব। শুধু কি তাই, সংসারের প্রতিটি কর্ম সেই প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করে প্রিয়া একাই। কিছু করতেই হয় না শচীদেবীকে।

মার্জনা করে দেবগৃহ। আঁকে স্বস্তিক মণ্ডলী। শঙ্খ চক্রের আলিম্পনে সুসজ্জিত করে দেবাঙ্গন।

'গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল।
ঈশ্বর পূজার সজ্জ করেন সকল॥'

অচলা ভক্তি তুলসী সেবায় লক্ষ্মীর। প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে আর সন্ধ্যায় মার্জনা করে তুলসী তল। সিঞ্চন করে গঙ্গাজল তুলসী মূলে ত্রিসন্ধ্যা প্রণাম করে ভক্তি ভরে দেবী তুলসীকে।

কখনো কোন কাজে ত্রুটি নাই তার। ভুল হয় না শচীদেবীর সেবা যত্নও, কোনদিন নিমাইয়ের চরণ বন্দনাও করে। চরণ মূলে বসে পাদসম্বাহন করতে করতে শুনে শাস্ত্র-কথা। যেন একান্ত অনুগত ছাত্রী সে। একাগ্রতার মূর্ত প্রতীক যেন।

'লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
মুখে কিছু নাহি বলেন সন্তোষ অন্তর॥' চৈ· ভা·

সহসা উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন শচীদেবী। যেন কিসের একটা শব্দ না। দরজার কড়া নাড়ার শব্দই বলে মনে হচ্ছে। এত রাতে কে কড়া নাড়ছে।

—'মা, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ ?'

—'নারে এখনো ঘুমাইনি। কে, নিমাই।' উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর শচীদেবীর।

—'হ্যাঁ, মা। দরজাটা খোল।'

উঠে পড়েন তাড়াতাড়ি শয্যা থেকে। একটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা তার টিপ্‌টিপ্‌ করতে থাকে। দরজাটা খুলে দেন তিনি।

ঘরে ঢুকল নিমাই। পিছনে বৌমা—লক্ষ্মীপ্রিয়া।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'এত রাতে তোরা! কি হয়েছে রে ?'

হেসে বললে নিমাই—'না, কই, কিছু না ত। তুমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছ, তাই না ?'

'হ্যাঁ রে।'

'না, না ভয়ের কিছু নাই। আমরা এসেছি তোমার শ্রীচরণ সেবা করতে। বঞ্চিত করো না আমাদের। অনুমতি দাও মা।'

'পাগল ছেলে। এত বড়টি হলি তবু তোর পাগলামি গেল না রে নিমু। তুই এসেছিস্‌, সঙ্গে আবার বৌমাকেও এনেছিস। যা যা ঘুমুগে যা। সারাদিন বৌমা আমার কত খেটেছে। ছেলে মানুষ একটুও বিশ্রাম করেনি। যা, এত রাতে আর পাগলামি করিস নে।'

'দিনের বেলা আজকে ত তোমার সেবা করার অবসরই পাইনি। দাও না, তোমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই।' বিনয়নম্র কণ্ঠে আব্দার করে বললে লক্ষ্মীপ্রিয়া।

'তোরা দুজনেই সমান। দেখছি ছেলে মানুষী কারো এখনো যায়নি।'

একটা পরম তৃপ্তিতে ভরে উঠল শচীদেবীর অন্তর। ওরা দুজনে বসল মায়ের চরণতলে। দুটি পায়ে দুজনে পরম ভক্তি ভরে করতে লাগল পাদ-সম্বাহন।

তোমার চরণই ত আমার সর্বতীর্থ। তীর্থময়ী তুমি মা। তুমিই ত আমাদের প্রত্যক্ষ দেবী। তোমাকে ছেড়ে কোথায় পাব দেবতার সন্ধান। মূর্তিমতী দেবী তুমি। তোমার চরণই আমাদের পরম আশ্রয়। পরম তীর্থক্ষেত্র।

মায়ের চরণ সেবাই সন্তানের পরম ধর্ম। লক্ষ্মীপ্রিয়া সহ নিমাই সেই ধর্মই পালন করছে। অর্চনা করছে মায়ের শ্রীচরণ।

আজ শচীদেবীর মত সংসারে সুখী কে আছে। ওদের দু'টিকে পেয়ে তিনি যেন ভুলে গেছেন সকল জ্বালা-যন্ত্রনা। পরম পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠছে তাঁর বুক। আনন্দে সর্ব শরীর তাঁর থেকে থেকে উঠছে শিউরে। চোখ বুজে এক অনাস্বাদিত স্বর্গীয় সুখ অনুভব করছেন তিনি

॥ সাত

নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে দেখা দিল আতঙ্ক। এ কে এল নবদ্বীপে কেউ দাঁড়াতে পারছে না তার সামনে। বিস্তর হাতি, ঘোড়া, লোকজন নিয়ে দোলায় চড়ে এসেছে সে। বিদ্যার আড়ম্বরে হৃদয় তার টইটম্বুর। বিনয়ের বিন্দুমাত্র ছিটেফোঁটা নাই। হুঙ্কার ছেড়ে বলছে—

'কেউ যদি নবদ্বীপে না থাকে, তাহলে দাও আমাকে জয়পত্র লিখে'

এত দর্প, এত অহংকার কে সে ?

পণ্ডিত কেশব। বাড়ী তার কাশ্মীর। সারা ভারতের পণ্ডিত সমাজকে পরাজিত করেছেন তিনি তর্কে। শুধু বাকী পূর্বভারতের নবদ্বীপ। তিনি শুনেছেন নবদ্বীপের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি। নবদ্বীপ নাকি বিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয়। রঘুনাথ শিরোমণির জন্মস্থান। পক্ষধর মিশ্রকে পরাজিত করে যিনি লাভ করেছিলেন 'শিরোমণি' উপাধি তিনি প্রবর্তক নব্য ন্যায়ের।

রঘুনাথ এই ত সেদিনের ছেলে। কেশব তাকে আমলই দেন না। মনে করেন না ধর্তব্যের মধ্যেই তবে হ্যাঁ, শুনেছেন বাসুদেব সার্বভৌমের নাম। কাশী থেকে সমগ্র ন্যায় শাস্ত্রকে এনেছিল কণ্ঠস্থ করে। উপাধি লাভ করেছিল 'সার্বভৌম।' সেজন্যই এসেছেন কেশব কাশ্মীরী। তিনি দেখতে চান নবদ্বীপের বিদ্যার দৌড় কতখানি।

কিন্তু নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা গেল কোথায়। গর্তে লুকোলো নাকি সব।

সবার এক কথা। কেশব নাকি সরস্বতীর বরপুত্র। তাঁর কণ্ঠায় নাকি বাস করে আছেন স্বয়ং সরস্বতী। সর্বশাস্ত্র তাঁর নখদর্পণে। অতএব তাঁর সামনে দাঁড়াবে কে। সে সাধ্য আছে কার। তাছাড়া বাসুদেব সার্বভৌম তিনি ত নবদ্বীপ ত্যাগ করে অনেকদিন আগেই চলে গেছেন উৎকলে।

বেড়ে ওঠে কেশবের দম্ভ। যদি নবদ্বীপে কেউ না থাকে, কেউ দাঁড়াতে না পারে তার সামনে, তাহলে লিখে দিক জয়পত্র।

ঢেঁড়া পিটিয়ে সদম্ভে সেই কথাই তিনি জানিয়ে দিলেন নবদ্বীপবাসীকে।

কেউ সাড়া দিল না কেশব পণ্ডিতের আহ্বানে।

কি আর করেন কেশব। সন্ধ্যার সময় চললেন গঙ্গার ধারে বেড়াতে। জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রি। চাঁদটা গঙ্গার ঢেউ-এ পড়ে কেটে কেটে যাচেছ। ঠিক এক একটা রজতখণ্ডের মত। ভারি মনোমুগ্ধকর শোভা। কেশব চলতে চলতে দেখলেন গঙ্গার ধারে বটগাছের ছায়ায় বসে কারা যেন কি সব শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করছে। উৎসুক হয়ে এগিয়ে গেলেন কেশব কাশ্মীরী।

সঙ্গের লোক বললে, উনিই নিমাই পণ্ডিত।

কেশবের মধ্যে জেগে উঠল কেমন যেন আক্রমনাত্মক মনোভাব। কেউ যখন আসছে না তাঁর সামনে এগিয়ে, তখন তিনি নিজেই আক্রমণ করবেন প্রতিপক্ষকে। এমনি একটা মনোভাব নিয়ে এগিয়ে গেলেন বটতলের দিকে।

নিমাইকে দেখে আশ্চর্য হলেন কেশব। এতো নিতান্ত শিশু। মাত্র ষোল সতের বছরের বালক। আলোচনা করছে কলাপ ব্যাকরণ নিয়ে। যা সবচেয়ে সরল, শিশু-বোধ্য।

এ আবার পণ্ডিত হয় কেমন করে? অবজ্ঞার হাসি হাসলেন কেশব মনে মনে।

পণ্ডিতকে দেখেই ছাত্র সহ নিমাই, উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো। বললে—'আসুন, আসুন পণ্ডিত মশাই। আসন গ্রহণ করুন এই মহীরুহের সুশীতল ছায়ায়।'

—'তা, তুমিই বুঝি নিমাই পণ্ডিত। তা এই বয়সে পণ্ডিত হলে কেমন করে? দেখছি ত নিতান্ত বালক। এখনো দাঁতুড়ের গন্ধ লেগে আছে মুখে।

'পড়াচ্ছ কলাপ অর্থাৎ বালাশাস্ত্র।'

'তাও কি পড়াতে পারি।' নিমাই বললে সবিনয়ে।

'পারো না, এ ত জলের মত তরল।'

'আপনার কাছে আমি। কোথায় আপনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। কবিত্বে প্রবীণ। কণ্ঠে আপনার সরস্বতীর অধিষ্ঠান। আর আমি বয়সে নবীন। আপনার সঙ্গে কি আমার তুলনা চলে, না তা সম্ভব। বিনয়ে বিগলিত হয়ে নিমাই নিজেকে তৃণের মত জ্ঞান করে উত্তর দিলে।

'আপনার কবিতা শুনতে বড় ইচেছ করে। যখন এসেছেন অনুগ্রহ করে। শোনান না আপনার কিছু কবিতা। আস্বাদন করা যাবে কাব্যরস। সার্থক হয়ে উঠবে এই জ্যোৎস্নাস্নাত যামিনী।'

'কবিতা শুনতে চাও, এই ত! তা কিসের কবিতা শুনবে বলো?'

'এমন স্নিগ্ধরাত্রিতে গঙ্গার কূলে শোনান গঙ্গারই কিছু মাহাত্ম্য। শুনে পাপ বিমোচন করি।' আবার সবিনয়ে বললে নিমাই।

সগর্বে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মনে মনে শ্লোক রচনা করে আউড়ে যেতে লাগলেন ঝড়ের বেগে। অনর্গল। মুখে যেন খৈ ফুটছে তাঁর। সে কি দু'একটি শ্লোক, একাদিক্রমে একশত। থামছেন না একটুও। যেন কোন মুখস্থ কবিতা করছেন আবৃত্তি। ছেদ নাই একটুও। অস্পষ্টতা বা জড়তার বিন্দুমাত্র লেশ নাই কোথাও। উদাত্ত কণ্ঠস্বর। জিহ্বাতে সরস্বতী অধিষ্ঠান না করলে সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করা সত্যি কোন-মতেই সম্ভব নয়।

শুনে সকলেই আনন্দে হরিধ্বনি করে উঠল।

শ্রোতারা বিস্ময়ে অভিভূত। একি কখনো মানুষে সম্ভব। কেশব সত্যি অলৌকিক বিদ্যার অধিকারী সত্যি ত নবদ্বীপে এঁর সমকক্ষ কে আর আছে। কেই বা পেরে উঠবে তর্কে। নিমাই কেশবের কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু ছাড়া কি আর হতে পারে।

নিঃসঙ্কোচ নিমাই। তেমনি সবিনয়ে বললে—"সত্যি আপনার মত কবি আর হয় না। কোন চিন্তা ভাবনা না করে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে শত শ্লোক রচনা করা—একি কম শক্তির কথা। কার সাধ্য এর আদ্যোপান্ত অর্থ বোঝে। তবে কি জানেন, ভাবি ইচ্ছে করে শ্লোকগুলির মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিয়ে যদি আপনি নিজ মুখে ব্যাখ্যা করেন, তাহলে যথার্থ কাব্যরস আস্বাদন করে নিজেদের ধন্য মনে করি।'

তা বেশ ত, বল তুমি কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনতে চাও?

'আমি বলব? আমার কি মনে আছে!' বিনীত উত্তর নিমাইয়ের।

'তা ঠিকই। তবু তুমি আভাষ দাও। অন্ততঃ একটু-আধটু ভাবার্থ বলো। তাহলে আমি সহজেই ধরতে পারব।'

'ও। আচ্ছা তাহলে আমি সেই শ্লোকটাই বলছি—

'মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেবা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ কমলোৎপত্তি সুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্যচরণা
ভবানীভর্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা।'

কেশবের ত চক্ষু স্থির। খানিকক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক। তারপর সহসা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—'সে কি কথা! আমি ঝড়ের বেগে বলে

গেলাম শত শ্লোক, তুমি তার মধ্যে বেছে নিয়ে এই শ্লোকটিই বা মুহূর্তে মুখস্থ করলে কেমন করে? তুমি কি শ্রুতিধর?'

নম্র স্বরে নিমাই বললে—'তা আপনি যেমন সরস্বতীর বরে কবি হয়েছেন, তেমনি কেউ ত শ্রুতিধরও হতে পারে।'

'তা যাকগে ওসব। আপনি দয়া করে শ্লোকটির ব্যাখ্যা করুন।'

কেশব বললে—'এর ব্যাখ্যা ত সোজা। যে শ্রীবিষ্ণুর চরণ কমল থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে সৌভাগ্যবতী, সুরনরগণ যার চরণ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর চরণের মত পূজো করে, যে ভবানী ভর্তার অর্থাৎ স্বামীর মাথায় বিরাজিত বলে অদ্ভুত গুণান্বিতা, সেই গঙ্গার এই মহিমা নিশ্চিতরূপে দীপ্ত পাচ্ছে নিরন্তর।'

'বেশ ভাল কথা।' নিমাই বললে—'এইবার ব্যাখ্যা করুন এই শ্লোকের মধ্যে কি কি দোষগুণ আছে।'

এবার কেশব পণ্ডিত উঠলেন রেগে। 'এ শ্লোকের আবার দোষ কি? তুমি অর্বাচীন বালক। পড়াও কলাপ ব্যাকরণ। কাব্যের বোঝ কিছু। এই শ্লোকে লেশ মাত্র ত্রুটি নেই। দেখতে পাচ্ছ না, এতে আছে দুটো অলংকার। একটা উপমা আর একটা অনুপ্রাস—।'

'কিন্তু দোষ।' তেমনি ধীর অথচ নম্র স্বরে বললে নিমাই।

এবার ক্রোধে যেন ফেটে পড়লেন কেশব পণ্ডিত। চীৎকার করে বললেন—'অর্বাচীন বালক, তুমি অলংকারের বোঝ কিছু? আমার শ্লোকে কবিত্বের যে সারবস্তু আছে, তা বোঝার বিদ্যে আছে তোমার?'

'না পণ্ডিত মশাই অলংকার পড়িনি বটে। শান্ত স্বরে বললে নিমাই। তবু শুনে শুনে যতটুকু জানি বা শিখেছি, তাতে দেখছি আপনার এই শ্লোকে দোষ আছে পাঁচটি।'

'মিথ্যে কথা,' হুঙ্কার ছেড়ে গর্জে উঠলেন পণ্ডিত।

'দেখুন পণ্ডিত মশাই রুষ্ট হবেন না। আমি একে একে বলছি শুনুন।'

নিমাই ধীরে অথচ দৃঢ় স্বরে বলতে আরম্ভ করলো—'যে বস্তু জ্ঞাত নয়, অর্থাৎ জানা নয়, তাকেই ত বলে বিধেয়, আর যে বস্তু জানা, তাকে বলে অনুবাদ। অলংকার শাস্ত্রের এই ত নিয়ম। আগে বসবে অনুবাদ পরে বিধেয়। যদি এ নিয়মের ত্রুটি হয় অর্থাৎ ব্যতিক্রম হয় অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ তাকেই বলে। এবার আসুন আপনার শ্লোকের প্রথম ছত্রে—'মহত্বং 'গঙ্গায়াঃ ইদং।' এতে আপনি কি বুঝাতে চাইছেন? এতে গঙ্গার কি মহত্ব প্রথমে তা জানা যায় না। তাহলে 'মহত্বং' শব্দটি বিধেয়। আর 'ইদং'—জানা বস্তুকে জানবার কথা ত, সুতরাং নিঃসন্দেহে অনুবাদ। তাহলে। মহত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং না বলে, বলা

উচিত ছিল—'ইদং গঙ্গায়াঃ মহত্ত্ব'।' তাহলে বুঝতেই পারছেন বাক্যের গঠনে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ ঘটেছে।

এরকম দোষ কিন্তু আরো একটা আছে। যেমন ঐ 'শ্রীলক্ষ্মীরিব' শব্দটি। এখানে লক্ষ্মী জানা অর্থাৎ জ্ঞাত, তাই সে অনুবাদ। কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষ্মী বলতে কি, কোথায়, কাকে বুঝায়, তা কিন্তু আমাদের অজানা অর্থাৎ অজ্ঞাত। সুতরাং দ্বিতীয় শব্দ বিধেয়, আর লক্ষ্মী শব্দ অনুবাদ। তাহলে কি হলো। দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব বলাতে আগে অনুবাদ না বসিয়ে, বসিয়েছেন বিধেয়। তাহলে দেখুন এখানেও ঘটেছে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ।

বলছি শুনুন আপনার আরো দোষের কথা।'

এ দুগ্ধপোষ্য বালক বলে কি। পণ্ডিতের মুখে বুঝি বাক্যস্ফূর্তি হয় না। তাকিয়ে থাকেন হত চেতনের মত।

এবার বলব 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' দোষের কথা। বলতে আরম্ভ করে নিমাই। এই যেমন 'ভবানীভর্তৃ' কথাটাই ধরুন। এর মানে কি ? মানে হচ্ছে, ভবানীর স্বামী। অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন মহাদেবের কথা। ভব বা মহাদেবের যে পত্নী, তিনি কে ? না দুর্গা—তাঁকেই ত বলা হয় ভবানী। এখন তাহলে কি দাঁড়াল দেখুন। আপনার শ্লোকের কথা মত অর্থ হচ্ছে, মহাদেব ছাড়া ভবানীর আরো একজন স্বামী আছেন। যদি এমন অর্থ করি তাহলে কি অসম্ভব মনে হবে ?'

নিমাই-এর কথা শুনে শ্রোতারা হেসে উঠল 'হো-হো' করে।

নিমাই কিন্তু তাদের থামিয়ে দিয়ে বললে—'প্রকৃত অর্থের প্রতিকুল ইঙ্গিত যদি এসে পড়ে তাকেই বলে বিরুদ্ধমতিকৃৎ দোষ।'

নিমাই মৃদু হেসে উদাহরণ দিয়ে বলতে আরম্ভ করলে—'যেমন ধরুন, যদি বলি 'ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্তা,' তাহলে এর দ্বারা কি বোঝাবে ? খোদ ব্রাহ্মণও হতে পারে, আবার ব্রাহ্মণপত্নীর দ্বিতীয় স্বামীকেও একেবারে বাতিল করা যাবে না।'

এবার সকলে প্রাণখুলে হেসে উঠল 'হাঃ-হাঃ' করে। কেশবের মুখ হয়ে উঠল লজ্জায় মলিন। যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল। চুপসে গেল কেশব কাশ্মীরী।

'পুনরাত্ত' আর 'ভগ্নক্রম'—এ দুটো দোষও আছে। স্বাভাবিক ভাবে বললে নিমাই।

শ্রোতারা হয়ে উঠল উৎসুক। বলুন, আমাদের সকলকে বুঝিয়ে বলুন 'পুনরাত্ত' আর 'ভগ্নক্রম' দোষের কথা।

'কর্তার পরে ক্রিয়া বসে। আর ক্রিয়া পদের ব্যবহারেই ঘটে বাক্যের সমাপ্তি।

'বিভবতি' এই ক্রিয়া পদের পরই বাক্যের শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পণ্ডিত মশাই তা না করে 'অদ্ভুতগুণা' এই বিশেষণ পদটি প্রয়োগ করেছেন। তাই এখানে ঘটেছে 'পুনরাত্ত' দোষ।

'ভগ্নক্রম', সে আবার কি?

আলোচ্য শ্লোকটি চারটি চরণ বা ছত্রে হয়েছে রচিত। প্রথম চরণে দেখা যাচ্ছে 'ত'-এর অনুপ্রাস। ব্যঞ্জন বর্ণের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগকেই ত বলে অনুপ্রাস। এই ধারা অনুযায়ী তৃতীয় চরণে রয়েছে 'র'-এর অনুপ্রাস, চতুর্থ চরণে ঘটেছে 'ভ'-এর অনুপ্রাস। কিন্তু দ্বিতীয় চরণে—'যদেবঃ শ্রীবিষ্ণুশ্চরণ-কমলোৎপত্তি-স্তভগা'। দেখুন এতে কোন অনুপ্রাসই নাই। তাহলে আগাগোড়া মানা হলো না এক নিয়ম। অন্য তিনটি চরণের মত যদি দ্বিতীয় চরণেও থাকত অনুপ্রাস, অর্থাৎ প্রত্যেক চরণই হতো অনুপ্রাসযুক্ত তাহলে ঘটত না ভগ্নক্রম দোষ।

কিন্তু তাহলে কি কাব্যগুণ একেবারে নাই?

বলেছি ত গুণও পাঁচটি আছে। নিমাই বললে—ঐ পাঁচটি দোষেই 'শ্লোক হইল ছারখার।' 'দশ অলংকারে যদি এক শ্লোক হয়। এক দোষে সব অলংকার হয় ক্ষয়॥ সুন্দর শরীরে যদি থাকে একটি ধবল কুষ্ঠের দাগ, তাকে যত ভূষণে ভূষিত করা হোক না কেন, ঐ এক দোষেই সে দেহ হয়ে যায় শ্রীহীন। তেমনি হয়েছে এই শ্লোকের অবস্থা।

নিমাই তাকালে কেশবের মুখের দিকে। কেশব নিরুত্তর। একটি কথাও কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো না তার। বিস্ময়ে স্তম্ভিত পণ্ডিত। কীবা প্রতিবাদ করবে সে। শেষে একটা পড়ুয়া বালকের কাছে ঘটলো তার পরাজয়। এ অপমান সে রাখবে কোথায়। কিন্তু এই বালক যুক্তি দিয়ে যে ব্যাখ্যা করল, এ'ত সাধারণ বালকের পক্ষে সম্ভব নয়। সরস্বতী কি তার কণ্ঠ ত্যাগ করে ঐ বালকের কণ্ঠে গিয়ে অধিষ্ঠান করলেন। যদি তা না হয়, তবে এই বালকই বা কে?

তুমি অলংকার পড়নি, শাস্ত্রজ্ঞানও তোমার নাই। তুমি কি করে জানলে এত সব কথা?

তা ত আমি জানি না। সরস্বতী আমাকে যেমন বলালেন, আমি তাই ত বললাম। লেশ মাত্র দাম্ভিকতা নাই নিমাইয়ের কথায়। নিতান্ত অবোধ বালকের মত উত্তর দিল সে।

এতক্ষণ চুপ করেছিল নিমাইয়ের ছাত্রেরা। দিগ্বিজয়ীর পরাজয়ে এবার উল্লাসে যেন ফেটে পড়ল। ওরে বাবা, কি অহংকার। কি দর্প। আমাদের

অধ্যাপককে বলে কিনা দুগ্ধপোষ্য শিশু। বালা-শাস্ত্র কলাপের পণ্ডিত এখন বাছাধন, তোমার সে দর্প গেল কোথায়। উপেক্ষা আর অবজ্ঞাতে যেন, আমাদের নিমাইকে মানতেই চায় না। সকলে পরিহাস করতে লাগল কেশবকে।

নিমাই ক্ষুব্ধ হলো ছাত্রদের ব্যবহারে। তাদের শাসন করে বললে—এরকম দুর্বিনীত হতে কে তোমাদের শিক্ষা দিল।

কাব্যের দোষগুণ বড় কথা নয়। আসল হলো আবেগ। আবেগই হলো কবিত্ব শক্তির উৎস। কবিত্ব শক্তির অধিকারী না হলে ব্যাকরণ শিখে কবি হওয়া যায় না। সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে কালিদাস আর ভবভূতির রচনাতেও দোষ আছে। আপনার কবিতা গঙ্গার মাহাত্ম্য গঙ্গার স্রোতধারার মতই পবিত্র। যাঁর মুখ দিয়ে এমন অনর্গল নির্গত হয় এমন অনুপম শ্লোকরাজি, তিনি ত মহাকবি—কবি শিরোমণি।

নিমাইয়ের বিনয় দেখে মুগ্ধ কেশব। এত কম বয়স, এরই ত দম্ভ, অহংকার, ঔদ্ধত্য, বাগাড়ম্বর—এসব থাকার কথা। কিন্তু তা না হয়ে কত স্নিগ্ধ, কত বিনম্র, কিন্তু আমি। ···লজ্জায় মুখ তুলতে পারলেন না কেশব কাশ্মীরী।

পণ্ডিতের এমন অবস্থা দেখে নিমাই বললে—

দেখুন, আমার কৈশোর চাপল্য মাপ করবেন। আপনার মত মহাকবির কবিতার সমালোচনা করি সে সাধ্য কোথায়, আমার যোগ্যতাই বা কতটুকুন।

অনেক রাত হয়েছে। তাছাড়া আপনি শ্রান্ত। যান, বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করুন। কালকে তখন আবার দেখা হবে। শুনব আপনার মুখে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা।

কেশব কাশ্মীরী ফিরল বাসায়। কিন্তু ঘুমুতে পাবল না মোটেই। রাত্রিতে বসল সরস্বতীর আরাধনায়। স্বপ্নে দেখা দিলেন কবিকে সরস্বতী। বললেন—তুমি যাঁর কাছে পরাজিত হয়েছ, তিনি আমার প্রভু, আমার স্বামী—আমি তাঁর চরণের দাসী।

'তুমি তার দাসী!' স্বপ্নঘোরে চীৎকার করে উঠল দিগ্বিজয়ী।

হ্যাঁ, তিনি যে আমার প্রাণকান্ত। চির আরাধ্য প্রভু। তুমি যাও, নিজেকে সমর্পণ করো তাঁর শ্রীপাদপদ্মে।

প্রাতঃকালে উঠেই কেশব চললে নিমাইয়ের বাড়ী। গিয়ে লুটিয়ে পড়লে নিমাইয়ের পদতলে। নিমাই ব্যগ্র হয়ে দু'হাত দিয়ে তুললে পণ্ডিতকে।

ছিঃ ছিঃ—এ কি করছেন। আপনি আমার চেয়ে বয়সে কত বড়। শুধু কি তাই, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আপনি। এ দৈন্য শোভা পায়না আপনার।

আমি জেনেছি প্রভু, আপনি কে। আপনিই অনাদির আদি। সর্ব কারণের কারণ। আপনিই সর্ববিদ্যার আধার। আপনি মুক্ত করুন আমাকে অবিদ্যার বন্ধন থেকে। হাউ হাউ করে বালকের মত কাঁদতে লাগল পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী।

বুকে জড়িয়ে আবদ্ধ করল নিমাই কেশবকে। সর্ব অহংকার নাশ হলো তার। এলো নম্রতা, কোমলতা। তৃণের মত তুচ্ছ মনে করল নিজেকে। হাতি ঘোড়া সব বিলিয়ে দিয়ে গ্রহণ করল দণ্ড কমণ্ডলু। সংসার ছেড়ে চলে গেল কেশব।

॥ আট ॥

কথাটা শুনে হাহাকার করে উঠল শচীদেবীর হৃদয়। হে রঘুনাথ, তুমি কি আমার কপালে লেখনি একটুও সুখ? আজীবন দুঃখই আমার সম্বল। দু'টো দিন যেতে না যেতেই নিমাই আমার একি বলছে।

দুখিনী মায়ের অন্তর তুমি কি বোঝ না প্রভু। আর তুমি কত দুঃখ দেবে আমায়। আমি যে নিমাই আর লক্ষ্মীপ্রিয়াকে নিয়ে বাঁধতে চাই সুখের নীড় ভুলে যেতে চাই পতিপুত্র হারানোর দুঃখ। ওদের দেখে আমি যে অনুভব করছি স্বর্গীয় আনন্দ। সে আনন্দ থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করো না প্রভু।

কিন্তু সুখ যে বড় চঞ্চল। বিদ্যুৎ চমকের মত ঝিলিক মেরে অন্তর্হিত হয় নিমেষেই। তাকে ধরে রাখা বড় কষ্টকর। যেন লক্ষ্মীর মত চঞ্চলা সে। তাই ত শচীদেবী তাকে পারছেন না ধরে রাখতে।

নিমাইয়ের সুখ্যাতিতে আজ ভরে উঠছে সারাদেশ। কেশব কাশ্মীরীর পরাজয়ে বেড়ে গেছে নিমাইয়ের খ্যাতি-প্রতিপত্তি। গর্বে ফুলে উঠছে শচীদেবীর প্রাণ। লক্ষ্মীর প্রতিমার মত লক্ষ্মী বধূমাতা তাঁর ঘর রেখেছে আলো করে। অভাব অনটন তাঁকে মাঝে মাঝে ভাবিয়ে তুললেও তাকে তিনি দুঃখ বলে মনেই করেন না। ঘরেই ত তাঁর স্বয়ং লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান।

মহা আনন্দেই কাটছিল শচীদেবীর দিনগুলি। কিন্তু নিমাই আজ একি বলছে। সে নাকি যাবে পূর্ববঙ্গে। পিতৃভূমি দর্শন করতে। একথা বিশ্বাস হয় না শচীদেবীর। একটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা তাঁর কেমন যেন টিপ্‌টিপ করে ওঠে। সে যে ভীষণ নদী নালার দেশ। শুনেছে সে সব নদী উত্তাল। খ্যাপা কুকুরের মত উদ্দাম গতিতে মুখব্যাদন করে ছুটে চলে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে। পদ্মা, মেঘনা আর আড়িয়ালদহের জীবন, কলা মোচার মত অহরহ দোলে। ক্ষ্যাপা ঢেউ মেতে ওঠে তাণ্ডব নর্তনে।

ভাবতে ভাবতে কেমন যেন আত্মহারা হয়ে পড়েন শচীদেবী। আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেন—

না, না নিমাই, আমি তোকে যেতে দিতে পারব না ওদেশে। তুই বল, তোকে না দেখে আমি একা কেমন করে থাকব ঘরে। আমার কিসের অভাব। কেন তুই যাবি, কেন তুই পাড়ি দিতে চাস এ ভয়ঙ্কর বিপদের দরিয়ায়। দরকার নাই আমার ধন সম্পদের, এই ত রে আমাদের বেশ চলে যাচ্ছে।

মা তুমি মিছে চিন্তা করছ। প্রবোধ দিয়ে বললে নিমাই—কে বললে তোমায় আমি যাচ্ছি অর্থ উপায়ের জন্য। তুমি বিশ্বাস কর মা, আমি যাচ্ছি পিতৃভূমি দর্শনের আশায়। আমার বড় বাসনা জেগেছে, দেখব কেমন সে দেশ। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি আমায় বাধা দিও না। অনুমতি দাও।

'কিন্তু বৌমা ?' কান্না ভেজা দুটি আঁখি তুলে প্রশ্ন করেন শচীদেবী।

সে ত তোমার কাছেই থাকবে। তাকে রেখে যাব তোমার অঞ্চল ছায়।

'না, নারে নিমাই, আমি সে কথা বলছি না। আমি বৌমাকে রাখব কেমন করে। সে যে তোকে ছাড়া থাকতে পারবে না রে।' ' ডুকরে কেঁদে ওঠেন শচীদেবী।

তুমি বড় অবোধ মা। এ কি বলছ, তোমার কাছে থাকতে পারবে না লক্ষ্মী। তুমি সত্যি হাসালে মা।

লক্ষ্মী হতবাক। ঘরের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে সব। আয়ত দুটি আঁখি তার স্থির, অপলক। এ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে করতে পারছে না সে। কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। একটা পাষাণ মূর্তির মত নিশ্চল, নিষ্পন্দ, নীরবে দুগণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তপ্ত অশ্রু ধার। অন্তর মোথিত করে আকুল নিবেদনের ভাষায় সে যেন বলতে চাইছে—'না, তুমি যেও না, তুমি গেলে আমি বাচব না।'

কিন্তু সে কথা সে বলবে কেমন করে। হৃদয়টা তার কেমন যেন বোবা হয়ে গেছে। বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে প্রিয়া চেপে ধরে মুখম ডল। কোন রকমে ধরে রাখতে পারে না বুকের কান্নাকে। সিক্ত হয়ে উঠে তার বস্ত্রাঞ্চল।

হৃদয়ের নিভৃতে অরুন্তদ আর্তি স্পর্শ করলো না নিমাইকে। সে বুঝতে পারল না প্রিয়ার হৃদয়। প্রিয়ার হৃদয়ের উত্তাপ পারলো না নিমাইকে সংকল্প-চ্যুত করতে।

তাকে ডাকছে পূর্ববঙ্গ। পদ্মার ঢেউ আছড়ে পড়ছে তার হৃদয়ে। নিমাই কোন বাধা মানবে না। সে যাবেই। বেঁধে রাখতে পারবে না তাকে প্রিয়া। মায়ের স্নেহাঞ্চল ও পারবে না তাকে আবৃত করে রাখতে। আকুলি-বিকুলি করে উঠছে তার হৃদয়। ভক্তের আকুল আহ্বান অন্তরকে তার করে তুলছে উদ্বেল। অস্থির তাই নিমাই। যেতে হবেই তাকে। ভক্তের ডাকে ভক্তাধীন ভগবান সাড়া না দিয়ে থাকবেন কেমন করে।

শেষ পর্যন্ত শচীদেবী অনুমতি না দিয়ে পারলেন না।

লক্ষ্মীপ্রিয়া ?

সে ত অবলা। কান্না ছাড়া কিইবা সম্বল আছে তার। মা যেখানে পারলো

না তাকে ধরে রাখতে, সেই বা বাঁধবে কেমন করে। নীরব কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো তার হৃদয়।

যাওয়ার সময় মাকে বললে নিমাই—

আমি কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরে আসব। তুমি কিছু ভেবো না। সাবধানে থেকো। ঘরে লক্ষ্মী রইলো। তাকে তুমি দেখো।

তারপর লক্ষ্মীর কাছে গিয়ে বললে—

মায়ের সেবাযত্নে যেন কোন ত্রুটি না হয়। রঘুনাথের সেবাপূজো নিয়মিত করো।

মায়ের চরণে নমস্কার করে বেরিয়ে পড়ল নিমাই। লক্ষ্মী মাথায় ঘোমটা টেনে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলো স্বামীর চরণযুগলে।

কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পূর্ববঙ্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো নিমাই।

শাশুড়ী-বধূ, ওরা দু'জনে তাকিয়ে রইলো গঙ্গার দিকে। গঙ্গার বুকে যতক্ষণ দেখা গেল নৌকো চোখ ফেরাল না ওরা। তারপর ধীরে ধীরে এক সময় গঙ্গার দিক্‌ চক্রবালে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল নিমাইয়ের নৌকা।

মনে মনে প্রার্থনা জানাল রঘুনাথকে—'হে ঠাকুর, তুমি ওর যাত্রাপথ করো বিঘ্ন মুক্ত। ও যেন শীঘ্রই ফিরে আসে নির্বিঘ্নে। শূন্য হৃদয়ে শ্বাশুড়ী বধূ ফিরে এলো ঘরে।

নদী-মাতৃক বাংলাদেশ। প্রাণ-মন ভুলিয়ে দেয় নদীর সৌন্দর্য। কি অপূর্ব মনোহরণকারী নদীর দু'তীরের প্রাকৃতিক লীলাবৈচিত্র্য। শ্যামল কোমল বৃক্ষরাজি। তার ভিতর থেকে যেন উঁকি মেরে দেখছে অসংখ্য দেবালয়ের উচ্চ শির। চোখছানি মেরে নিমাইকে যেন ডাকছে তারা। ভক্তিভরে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে মন্দিরের দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায় মনে মনে নিমাই।

ঢেউ-এর তালে তালে যেন নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে ওদের বিজয় তরণী। পিছনে সরে সরে যায় কত নদ-নদী, কত দেশ জনপদ। কখনো কখনো ভ্রম হয় ওদের। দু'পাশের গাছপালাগুলো যেন ছুটে চলেছে বিপরীত দিকে তীরের মত গতিতে।

উদাস হয়ে ওঠে মনপ্রাণ। ভিতরের বিবাগী হৃদয়টা সকল বন্ধন কেটে কোথায় যেন উড়ে যেতে চায়। নিমাই হয়ে ওঠে আত্মহারা।

অবশেষে একদিন পদ্মার তীরে ভিড়ল ওদের তরী। সঙ্গীসাথীদের নিয়ে

কুলে উঠল নিমাই। সাড়া পড়ে গেল ওদেশে। এ সাড়া আনন্দের সাড়া। নিমাইয়ের আগমন বার্তা ইতিপূর্বে প্রচারিত হয়েছে ওদেশে। নদী-নালা পেরিয়ে কেমন করে যেন ইতিমধ্যেই সংবাদ পৌঁচেছে। নিমাইয়ের কাছে পরাজিত হয়েছেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী। নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য, বিনয় মুগ্ধ করল পূর্ববঙ্গবাসীদের। দলে দলে শত শত লোক ছুটে এলো নিমাইকে দেখতে। নিমাইয়ের মুখ থেকে দুটো কথা শুনতে।

সঙ্গীসাথীরা দেখল যে সব পড়ুয়া আসছে নিমাইয়ের কাছে, তারা পড়েছে নিমাইয়ের ব্যাকরণের টিপ্পনী। নিমাইয়ের এই টীকাগ্রন্থ তাদের কাছে নাকি ভারী প্রিয়। সকলেই শতমুখে প্রশংসা করছে, এমন টীকা ইতিপূর্বে আর কেউ রচনা করেনি।

টীকার কথা শুনে নিমাইয়ের মনে পড়ে গেল বাল্যের স্মৃতি।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চৌপাঠিতে সবে মাত্র ব্যাকরণ শেষ করে ভর্তি হয়েছে বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে। ন্যায় পড়তে তার ভারী ইচ্ছে। জুটল সতীর্থ রঘুনাথ। বয়স তখন সবে মাত্র চৌদ্দ। ব্যাকরণ পড়তে পড়তেই লিখেছিল ব্যাকরণের টীকা। সঙ্গে সঙ্গে এ বইয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা নবদ্বীপে। বিদ্যান সমাজে বেশ চালু হয়েছিল তার এ গ্রন্থ।

সেই ব্যাকরণের টীকা এতদূর এই পূর্ববঙ্গেও এসে পৌঁচেছে, একথা ভাবতে পারেনি নিমাই।

এরপর নিমাই লিখতে আরম্ভ করেছিল ন্যায়ের ভাষ্য। কিন্তু সে আর লেখা হলো না। তাকে ফেলে দিল নিমাই গঙ্গার জলে। সে এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ইতিহাস।

সতীর্থ রঘুনাথের ইচ্ছে সে লিখবে 'দীধিতি'র টীকা। রঘুনাথের উচ্চাশা সে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হবে। সর্বমান্য হবে তার বই। এই ভেবেই লিখতে আরম্ভ করল দীধিতির ব্যাখ্যা।

রঘুনাথ শুনল নিমাইও লিখছে ন্যায়ের ভাষ্য। কথাটা শুনেই কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়ল রঘুনাথ। নিমাইয়ের ভাষ্যের কাছে তার ভাষ্য টিকবে না প্রতিযোগিতায়। কেউ গ্রহণ করবে না তার ভাষ্য।

একদিন নির্জনে পেয়ে জিগ্যেস করলে রঘুনাথ—'হ্যাঁ ভাই নিমাই, তুমি নাকি ন্যায়ের ভাষ্য লিখছ? আমায় একটু দেখাবে?

'তা দেখাব না কেন। আজ যখন গঙ্গা পার হব, তখন নৌকায় বসে তোমায় পড়ে শোনাব।' অকপটে বললে নিমাই।

ফেরার পথে নৌকায় বসে বসে নিমাই পড়ছে তার পুঁথি। রঘুনাথ শুনছে

মনোযোগ দিয়ে। কি সুন্দর লিখেছে নিমাই। কঠিন তত্ত্বকে অতি সরল করে লিখেছে মধুর ভাষায়। এই না হলে প্রসাদ কান্তি। যে কথা বুঝাতে রঘুনাথ নিয়েছে পুরো এক পৃষ্ঠা। সেখানে নিমাই নিয়েছে মাত্র দু'টি ছত্র। শোনা মাত্রই অর্থের প্রত্যয় হয়। রচনা জলের মত স্বচ্ছ। ভাষা যেমন মধুর, তেমনি সাবলীল।

দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল রঘুনাথ।

পড়া বন্ধ করে জিগ্যেস করল নিমাই—'কি হলো তোমার, কাঁদছ কেন ভাই ?

'ভাই, তোমার এ রচনা প্রকাশ হলে, আমার এ বই কেউ আর পড়বে না। আমার প্রতিষ্ঠার আর কোন আশাই নাই।' এই বলে বালকের মত ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল রঘুনাথ।

রঘুনাথের দুঃখ দেখে নিমাইয়েব চোখ ছলছল করে উঠল। একটা সামান্য পুঁথি রঘুনাথের সুখের প্রতিবন্ধক হবে। খ্যাতির পথে দেবে কাঁটা। না না, এ কিছুতেই হতে পারে না। এই ভেবে পুঁথিটা ফেলে দিলে গঙ্গার জলে নিমাই।

'এ তুমি' কি করলে ভাই আমার উপর রাগ করে গঙ্গায় দিলে ফেলে অমন সুন্দর লেখাটা। এত পরিশ্রম, এত অধ্যবসায়, এত গবেষণা—সব তুমি মুহূর্তে নস্যাৎ করে দিলে ? এতটুকু মায়া হলো না তোমার। একটুও আঘাত লাগল না হৃদয়ে।' কান্নাভেজা স্বরে জিগ্যেস করলে রঘুনাথ।

'অফলা বিদ্যার জন্য আবাব মায়া কি ভাই। নামের জন্য কান্না, প্রতিষ্ঠাব জন্য কান্না। তার থেকে কাঁদো না কৃষ্ণের জন্য। আকাঙ্খা করো না কৃষ্ণেব সান্নিধ্যলাভেব জন্যে।' আবেগপ্লুত স্বরে বললে নিমাই রঘুনাথ কে।

কি গভীর ভালবাসা। সতীর্থের জন্য কি অপূর্ব স্বার্থত্যাগ।

স্মৃতি মন্থন করতে করতে নিমাই কেমন যেন আত্মহারা হয়ে উঠল। পদ্মা-মেঘনার ঢেউ তার হৃদয়-তন্ত্রীতে তুললো অপূর্ব ঝঙ্কাব। বেজে উঠল তার হৃদয়ের একতারাটা।

যে ছিল সদা চঞ্চল, বিদ্যারসে সর্বদা থাকত ডুবে। বৈষ্ণব দেখলে বিদ্রূপ করত যে, সেই নিমাই কেমন যেন হয়ে উঠল তন্ময়। সংকীর্তনে ভাসিয়ে দিল পূর্ববঙ্গ। মেতে উঠল পূর্ববঙ্গবাসী কীর্তন রসে।

স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলো টোল। দু'মাসেব মধ্যেই ছাত্ররা হয়ে উঠল বিদ্যান। উপাধি নিয়ে তাবা ফিবে গেল ঘরে।

'কত শত শত জন পদবী লইয়া।
ঘরে যায় আর কত আইসে শুনিয়া॥'

প্রসার প্রতিপত্তি বেড়ে উঠল নিমাই পণ্ডিতের। দলে দলে শত শত ছাত্র আসতে লাগল টোলে। উদ্বোধিত হলো পূর্ববঙ্গ জীবন দীক্ষার অমর মন্ত্রে। নিমাই পেল ওদের প্রাণের ছোঁয়া। উত্তাল নদ-নদীর স্পর্শ আর দিগন্তপ্রসারিত মাঠ আত্মমগ্ন করে তুললো নিমাইকে। অশ্রান্ত নদীর লহরীর সঙ্গে অবিশ্রান্ত কীর্তনের স্বর-ঝঙ্কার একসূত্রে বেঁধে দিল ওদের হৃদয়কে। নাম-যজ্ঞের রস-বন্যায় আপ্লুত হলো পূর্ববঙ্গ। নিমাইয়ের জয়ধ্বনিতে মুখরিত গ্রাম, জনপদ, নগর, বন্দর।

এদিকে নবদ্বীপে। নিমাই হীন নদীয়া। শচীদেবী প্রায় পাগলিনী। বিরহ ব্যথায় লক্ষ্মী বিধুরা, উদাসিনী প্রায় উন্মাদিনী।

গৃহকাজে মন বসে না কারোর। থেকে থেকে হয়ে উঠেন উন্মনা। যখন আষাঢ়ের কালি ঢালা মেঘ হয়ে ওঠে ঘনঘটা। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকে কেঁপে কেঁপে উঠে ধরণী, শুরু হয় বজ্রের তাণ্ডব নৃত্য। লক্ষ্মীর মনেও ওঠে ঝড়।

লক্ষ্মী তখন পারে না কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে। সে শুনেছে নদী-নালায় সমাকীর্ণ পূর্ববঙ্গ। এই বর্ষায় ক্ষেপে ওঠে ওদেশের নদ-নদী। বন্যায় প্লাবিত করে দেশ, জনপদ। ভাসিয়ে নিয়ে যায় মানুষ জনকে। ভেসে যায় ঘরবাড়ী।

'তা হলে আমার প্রভু!'

আর ভাবতে পারে না। বুকটা কেমন যেন তার টিপ্‌টিপ্‌ করে ওঠে। কাঁপতে কাঁপতে ছুটে যায় শচীর কাছে। কম্পিত কণ্ঠে শুধায়—'মাগো, এমন বাদলে ওদেশের নদীতে কি বান ডাকে!'

শচীদেবী আঁকড়িয়ে ধরেন পুত্রবধূকে বুকে। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রবোধ দেন। মায়ের বুকে মাথা রেখে লক্ষ্মী কাঁপে থর্‌থর্‌ করে।

কখনো কখনো নিমাইয়ের কথা ভেবে শচীদেবী নিজেই হয়ে উঠেন আকুল। বলতে পারেন না কাউকে কিছু। জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েন ভূতলে। লক্ষ্মী ছুটে আসে মায়ের কাছে। পুত্র-বিরহে কাতরা জননীর শিয়রে বসে তৎপর হয় সেবা করতে। পুত্রের স্থান অধিকার করে নিজের ব্যথাকে চেপে রাখে হৃদয়ে। মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পায় না লক্ষ্মী। মুখখানা কেমন যেন কালো হয়ে উঠে। মনে পড়ে প্রভুর আদেশ। প্রভু যে তাকে

বলে গেছেন মায়ের সেবা যত্ন করতে। সে আদেশ পালন করতেই হবে তাকে। এযে তার দায়িত্ব। কর্তব্যে অবহেলা করবে কেমন করে।

মাসের পর মাস কাটে। তবু আজো কই ও ত ফিরে এলো না। প্রভুর কি অভাগিনী লক্ষ্মীর কথা একবার মনেও পড়ছে না। কিংবা হয়ত এত ব্যস্ত, তার কথা ভাবতে তিনি সময়ই পাচ্ছেন না। এমনও ত হতে পারে।

কখনো কখনো গঙ্গার ঘাটে স্নানে গিয়ে একা বসে থাকে লক্ষ্মীপ্রিয়া। তাকিয়ে থাকে আকুল আগ্রহে নদীর দিকে। কত নৌকো আসা-যাওয়া করছে। যদি দেখতে পায় তার প্রভুর নৌকো। সেই ত কত দিন আগেই না গিয়েছেন প্রভু। প্রিয়া ঠিক ঠিক হিসাব করতে পারে না। কেমন যেন সব হুড় হয়ে যায়। হৃদয়কে সে ধরে রাখতে পারে না কিছুতেই। তখন—

'সজল নয়ন করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয়ে যুগ চারি।'

কখনো বা প্রিয়া নিজেকেই অপরাধী মনে করে। নিজের উপরে তার নিজের বড় অভিমান হয়। কেন সে পারল না প্রভুকে বেঁধে রাখতে। কেন সে দিল না বাধা। এমনি নানান চিন্তায় অধীর হয়ে উঠে প্রিয়ার বুক! লক্ষ্মীর অবস্থা দেখে পাড়া পড়শীরা বলাবলি করে—

'যে দেখি যে শুনি শুন বিনোদিনি
পরাণ হারাবে পারা।
সোনার বরণ হইল মলিন
পাঁজর দেখি যে সারা॥'

পরব্রহ্মের ঐশ্চর্যের অধিশ্বরী লক্ষ্মী। সে কি কখনো সইতে পারে ব্রজের বিরহ। সে কি কখনো বিরহের কি বেদনা, কি নিদারুণ সে অন্তর জ্বালা পারবে অনুভব করতে। এ যে বড় কঠোর কঠিন। কান্তা প্রেমের মর্ম অনুভব করতে পারবে কি ঐশ্চর্যের অধিশ্বরী শ্রীলক্ষ্মী।

ব্রজরস আস্বাদন করতে হলে চাই বিরহীর প্রাণ নিঙড়ানো আর্তি। চাই শ্রীরাধিকার মত অন্তরে বিরহের তুষানল। সে সাধনা বড় কঠিন।

লক্ষ্মী কেমন করে পারবে তা সহ্য করতে। রুক্মিনী, সত্যভামা তারাও কি পেরেছিল? তারাও ত ছিল কৃষ্ণ ঘরণী। তবুও তাদের সৌভাগ্য হলো না ব্রজরস আস্বাদনের।

লক্ষ্মী, তিনি ত বরদাত্রী, ভাগ্যদায়িনী, ঐশ্চর্যের অধিশ্বরী। দুঃখের দহন হৃদয় তার সইবে কেমন করে। লক্ষ্মী যে কাঁদতে জানে না। কাঁদতে পারে না সে। দিনে দিনে বিরহের জ্বালা তাই হয়ে উঠে অসহনীয়।

'নির্জনে শয্যায় উপাধানে বুক চেপে ডুকরে কেঁদে উঠে লক্ষ্মী। 'প্রভু, তুমি কেন এখনো আসছ না? আমি যে আব পারছি না গো তুমি যদি এ ভরা ভাদরেও না এলে, তবে আর কবে আসবে আমি যে আর পারছি না প্রতীক্ষা করতে।'

এমনি কাঁদতে কাঁদতে উন্মাদিনী লক্ষ্মী কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

রাতে, সহসা ঘুমের ঘোরে আর্ত চীৎকার করে উঠলো লক্ষ্মীপ্রিয়া।

'মাগো, আমায় যেন কি কামড়ালো!'

পাশের ঘর থেকে আলুথালু বেশে ছুটে এলেন শচীদেবী। ভয়ার্ত কম্পিত কণ্ঠস্বরে ডাকলেন—'বৌমা, কই, কোথায় দেখি —কি কামড়ালো?'

কথা বলতে পারলো না লক্ষ্মীপ্রিয়া শুধু হাত দিয়ে পায়ে দেখিয়ে দিল দংশনের স্থান। তখন সর্ব অঙ্গ তার বিষে হয়ে গিয়েছে নীল।

চীৎকার করে ডাকলেন শচীদেবী পাড়াপড়শীদের। তারা ছুটে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলো ওঝা। তারা মন্ত্র পড়ল, মন্ত্রপূত বারি সর্ব অঙ্গে দিল ছিটিয়ে, তবুও জ্ঞান ফিরল না লক্ষ্মীপ্রিয়ার শেষে এই দহন-দীর্ণ ধরণী থেকে বিদায় নিল লক্ষ্মী।

বিরহ-বিষধর সর্প বুঝি দংশন করলো তাকে। নিমাইয়ের বিরহ সহ্য করতে পারল না লক্ষ্মী। তাই সে ফিরে গেল ঐশ্বর্যের অমরাবতীতে।

জ্ঞান হারালেন শচীদেবী। দুঃখে মুহ্যমান হলো পড়শীরা। ছুটে এলো নদীয়াবাসী। উঠল কান্নার রোল। শচীদেবী কাঁদছেন আর করাঘাত করছেন শিরে। ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা যাচ্ছেন।

প্রিয়জনরা হতবাক। কি বলে সান্ত্বনা দেবেন শচীদেবীকে বুঝতে পারছেন না তারা। সকলের চোখেই জল। আত্মীয় স্বজন কাঁদছে সকলেই।

কিন্তু শচীদেবীর কান্না, এ কান্নার যে শেষ নেই। নেই কোন সান্ত্বনার ভাষা। বড় হতভাগিনী তিনি। সুখ বুঝি তার কপালে লেখেন নি বিধাতা।

নিমাই এলে কি বলে সান্ত্বনা দেবে তাকে। সে যে রেখে গিয়েছিল লক্ষ্মীকে তার কাছে। তার গচ্ছিত ধনকে কোথায় হারা করল সে। কেমন করে মুখ দেখাবে পুত্রের কাছে শচীদেবী।

এমনি বিলাপ করতে করতে আবার মূর্ছিত হলেন। একটা শোকের জমাট অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেললো শচীদেবীর সারা অন্তরাকাশ। তিনি কিছুতেই ধরে রাখতে পারছেন না নিজেকে। লক্ষ্মীর বিচ্ছেদ শেল সম বিঁধেছে তার বুকে। তিনি অধীর হয়ে উঠলেন এক অব্যক্ত হৃদয়-যন্ত্রনায়।

'এ সকল দুঃখ কথা না পারি বর্ণিতে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে ক্রন্দন শুনিতে॥' —চৈ. ভা.

আপ্তবর্গ চিন্তা করলেন মনে মনে। লক্ষ্মীর নশ্বর দেহ যতক্ষণ থাকবে শচীদেবীর সম্মুখে, ততক্ষণ তাঁকে প্রবোধ করা যাবে না কোন মতেই। তাই তাড়াতাড়ি সৎকারের বন্দোবস্ত করলেন তাঁরা।

লক্ষ্মীর মরদেহ আনা হলো গঙ্গাতীরে। আপ্তবর্গ সকলে মিলে সম্পাদন করল তার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য। লক্ষ্মীর পঞ্চভূতাত্মক দেহ দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল পঞ্চভূতে। শুধু কতকগুলো ছাই পড়ে রইল চিতায়। গঙ্গার সুশীতল বাতাস চিতাভস্ম উড়িয়ে নিয়ে মিশিয়ে দিল গঙ্গার জলে। হু হু করে বয়ে চললো উদাসী বাতাস। তা যেন শচীদেবীর বুক ফাটা দীর্ণ হাহাকার

এদিকে নিমাই হয়ে উঠল চঞ্চল। লক্ষ্মীর জন্য হলো উন্মনা। মায়ের কথা ভেবে ব্যাকুল হলো হৃদয়। অনেক দিন নিমাই ওদের ছেড়ে এসেছে। না জানি কি ভাবে কেমন করে দিন কাটাচ্ছে তারা। যা সম্বল রেখে এসেছিল সে, এতদিনে সব বুঝি শেষ হয়ে গিয়েছে। তাহলে এখন তাদের চলছে কেমন করে।

এসব ভেবে নিমাই গৃহে ফেরার জন্য হয়ে উঠল তৎপর। আর ত কোন-মতেই দেরী করা চলে না। সঙ্গের সাথীদের জানালো নিজের মনোবাঞ্ছা। সকলেই প্রস্তুত হতে লাগল গৃহে ফেরার জন্য।

গুরুদেব গৃহে ফিরবেন শুনে ওদেশের শিষ্যরা হয়ে উঠল চঞ্চল। দিল তারা যথোপযুক্ত গুরুদক্ষিণা। যে যেমন পারল তাই নিয়ে এলো।

'স্বর্ণ রজত জলপাত্র দিব্যাসন।
সুরঙ্গ কম্বল ভোট সুন্দর বসন॥
উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে।
সবেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে॥' চৈ. ভা.

নিমাই সাদরে এসব দান পরিগ্রহ করলো। সকলের প্রতি তাকালো কৃপা দৃষ্টিতে। তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে সবার কাছে বিদায় নিয়ে নৌকায় আরোহন করার জন্য চললো ঘাটের দিকে এগিয়ে। দল বেঁধে চললো শিষ্য ছাত্র আর ওদেশের গুণগ্রাহী সকলে। আর ওদেশের অনেক ছাত্র ও সঙ্গী হলো প্রভুর। তারা নবদ্বীপে আসবে। তারা পড়াশুনা করবে গুরুগৃহে, গুরুর সান্নিধ্যে।

ঘাটে এসে দেখলে কয়েকটা নৌকা পরিপূর্ণ হয়েছে প্রচুর ধনসম্পদে। এযেন সদাগরের বাণিজ্য তরণী, ফিরে চলেছে বাণিজ্যের পণ্যসামগ্রী বোঝাই করে।

নিমাই উঠতে যাচ্ছে নৌকায় এমন সময় ছুটতে ছুটতে এসে দণ্ডবত হয়ে প্রণাম করলো এক ব্রাহ্মণ।

'তুমি কে?'

'আমি হতভাগ্য তপন মিশ্র।'

'কিছু বলবে?'

নম্র বিনীত উত্তর—'আমি বুঝতে চাই সাধ্য-সাধন তত্ত্ব। অনেক শাস্ত্র পড়াশুনা করে আমার ঘুচেছে চিত্ত বিভ্রম। তাই ছুটে এসেছি আপনার কাছে।'

'কিন্তু আমি সাধ্য-সাধনের কিই বা জানি?'

'প্রভু আপনি না জানলে কে আর জানবে।' দয়া করে আমায় প্রতারিত করবেন না। কাল রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম, মূর্তিমান দেবতার মত একজন আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে বললো—'তপন, বৃথা তুমি ব্যাকুল হচ্ছো। নিমাই ত এসেছে এই দেশে। তুমি যাও তার কাছে। প্রার্থনা জানাবে তার শ্রীচরণে। সেই নিমাইই নরনারায়ণ, সেই ত পূর্ণ ব্রহ্ম। যাও, তার কাছ থেকেই জেনে নাও এই সুগুপ্ত রহস্য। কিন্তু সাবধান, এই ঈশ্বর তত্ত্বের কথা কাউকে যেন বলো না। প্রকাশ করলে দুঃখ পাবে জন্মজন্মান্তর।'

'শুন শুন ওরে বিপ্র পরম সুধীর।
চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির॥
নিমাঞি পণ্ডিত পাশ করহ গমন।
তিঁহ কহিবেন তোমায় সাধ্য সাধন॥
মনুষ্য নহেন তিঁহো নরনারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁর জগৎ কারণ॥
বেদগোপ্য এ সকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম জন্মান্তরে॥' চৈ. ভা.

বিনম্র মস্তকে যোড় হস্তে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইল তপন। দীনতার প্রতিমূর্তি যেন। প্রভু কোন উত্তর করছেন না দেখে, অনুনয় করে বললে—

'বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময়॥'

কেটে নিমাই বললে—"ছিঃ ছিঃ, এ তুমি কি বলছ, জীবে ভগবত বুদ্ধি এ যে মহাপাপ। তারপর সহজভাবে বললে যাকে পাওয়ার জন্য লোকে ভজনা

করে তাঁর নাম সাধ্য। আর এই সাধ্যবস্তুকে পাওয়ার জন্য যে সব অনুষ্ঠান বা আচরণ তাকেই বলে সাধন।'

নিমাই আরো সরল করে বললে—'তুমি যদি চাও পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে, তাই যদি তোমার সাধ্য হয়, তাহলে তোমার সাধন হবে যোগ। আর যদি কামনা কর ব্রহ্ম-সাযুজ্য, তাহলে জ্ঞানই হবে তোমার সাধন। আর যদি ভগবৎ সেবাকেই সাধ্য মনে করো, তাহলে সাধনের আচরণ করো ভক্তি।

কিন্তু সাধ্য-সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—এর কোনটা?

নিমাই বললে—'কৃষ্ণই সাধ্য, আর ভজনই সাধনা।'

ব্রজের শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাই সাধ্য, জেনো তাই একমাত্র কাম্যবস্তু। সাধন হলো নাম সংকীর্তন। ভগবানের নাম হলো মধুর থেকে মধুরতম, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল নিগমলতার শ্রেষ্ঠ ফল আর অপ্রাকৃত চৈতন্যস্বরূপ।

'কিন্তু আমার মন যে বড় চঞ্চল! আপনি সাধনের যে উপদেশ দিলেন এ বড় কঠিন। অশক্ত আমি। আমাকে সহজ কোন পথ বাৎলে দেন।' সানুনয়ে নিবেদন করলো তপন।

'বেশ, তোমায় আরো সহজ সাধনের কথা বলছি। কিছু না পারো, শুধু গোবিন্দের নাম কীর্তন করো। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়, ঘুমুতে যেতে যেতে, ঘুম থেকে চোখ মেলে, এমন কি আপদে-বিপদে বলবে গোবিন্দ, গো-বি-ন্দ। দেখবে ধীরে ধীরে চলে যাবে মনের চঞ্চলতা। যদি চিত্ত চাঞ্চল্যও আসে, তখনো করবে নাম সংকীর্তন।'

জেনো নাম কীর্তনই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

'কলি যুগে ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম জীবের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥'

কলির যুগধর্মই হলো নামকীর্তন। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চনা, আর কলিতে হলো শুধু নাম সংকীর্তন। নিমাই বললে—

'অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্যসাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল॥' চৈ· ভা·

জিজ্ঞেস করলে তপন মিশ্র—কিন্তু সেই সংকীর্তনের মন্ত্র কি প্রভু কৃপা করে আমায় বলুন।'

'তারক ব্রহ্ম নামই কলি কল্মষনাশক।' বললে নিমাই আপন ভাবে তন্ময় হয়ে। তারপর দিব্যভাবে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলে—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'

বুঝলে তপন, এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরই হলো মন্ত্র।

'প্রভু, এই মন্ত্র জপের বিধি কি?'

'বুঝলে তপন, এর কোন বিধি নেই। নেই আসন, বসন। নেই কোন রীতি-নীতি। নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা পূরণের দায়িত্বও নেই তোমার। আর গোপনতারই বা কি প্রয়োজন। তুমি বিজনে-নির্জনে, কিংবা মনে মনে, নিম্ন স্বরে কিংবা উচ্চস্বরে—যেমন ভাবে পার জপ করো। তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই।'

'প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা তুমি জপ গিয়া করিয়া নির্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধ হইব সভার।
সর্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর॥'
'দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্তন করিহ সভে হাথে তালি দিয়া॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥'

এই নাম করতে করতেই দেখবে মন স্থির হয়ে আসবে তখন পরিণত হবে অভ্যাসে। অভ্যাস ঠিক ঠিক হলে জন্মাবে অনুরাগ। আর তখনই বুঝতে পারবে সাধ্য-সাধনত্ব এর গূঢ় রহস্য।

'সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাংকুর হবে।
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥'

প্রভুর মুখনিঃসৃত অমিয় বাণী শুনে তপন মিশ্র বার বার প্রণাম করতে লাগল নিমাইকে। তারপর করযোড়ে বললে—'প্রভু, যদি অনুমতি করেন, তাহলে আপনার সঙ্গে যাই।'

'না, নবদ্বীপে নয় তপন। তুমি সোজা চলে যাও কাশী। সেখানেই তোমার সঙ্গে হবে আমার মিলন।'

নিমাই তপনকে বদ্ধ করলো আলিঙ্গনে। প্রেমে পুলকিত হলো ব্রাহ্মণের

অঙ্গ। বৈকুণ্ঠনারায়ণের আলিঙ্গন সে পেয়েছে। তারমত ভাগ্যবান এ পৃথিবীতে কে আর আছে। পরমানন্দ সুখে আত্মনিমগ্ন হয়ে তপন বললে—

'আপনার সঙ্গ ছেড়ে আমি কাশী যাব প্রভু ?'

'হ্যাঁ, তুমি কাশীতেই যাও। আমি সেখানে শীঘ্র যাচ্ছি। সেখানে তুমিই হবে আমার একমাত্র সহচর। আর দেখো, খুব সাবধান—

আর কারে না কহিবা এসব চরিত ॥
পুনঃ নিষেধিল প্রভু সযত্ন করিয়া।'

'সমাগত যাত্রার শুভলগ্ন। আর দেরী করা যায় না। এবার নৌকায় উঠি। তুমি আয়োজন কর গে কাশী যাত্রার।' নিমাই সঙ্গী-সাথী ছাত্রদের নিয়ে উঠে পড়ল নৌকায়।

তপন রাত্রের স্বপ্নের সার্থকতায় নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করল। বহুজন্মের সাধনা না থাকলে এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়। আজ তপন মিশ্র সত্যই সৌভাগ্যবান। আজ সে দেখা পেয়েছে বৈকুণ্ঠের শ্রীহরিকে। শ্রীহরির অঙ্গ স্পর্শে পূত পবিত্র তার দেহ। তাই প্রেমে পুলকিত তনু মন প্রাণ।

বাড়ী ফিরে গিয়ে সে কাশী যাত্রার আয়োজন করতে লাগল। সংসারের ধনজন ঐশ্বর্যের কোন আকর্ষণই আজ আর তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না। আজ সর্বমুক্ত ব্রহ্মানন্দে হৃদয় তার তন্ময়।

'প্রেমে পুলকিত তনু হৃদয় তন্ময়।
তরুলতা হেরে যাহা সবই কৃষ্ণময় ॥'

॥ নয় ॥

পূর্ব বঙ্গ থেকে নিমাই ঘরে ফিরে এলো। সন্ধ্যার সময় নিমাইয়ের নৌকা লাগল নবদ্বীপের ঘাটে। মন্দিরে মন্দিরে বেজে উঠছে মঙ্গল শঙ্খ। বাজছে কাঁসর ঘণ্টা। আরাত্রিকের প্রদীপ নেচে নেচে দেবতাকে করছে আত্মসমর্পণ।

সন্ধ্যার পূর্বেই বহু ধন-সম্পদ নিয়ে ঘরে ঢুকল নিমাই। পড়ুয়া ছাত্ররাও এলো সঙ্গে। নিমাই মায়ের কাছে সব উপঢৌকন দিয়ে বললে—'আমাদের রান্নাবান্না করো। আমরা এখন গঙ্গায় স্নানে যাচ্ছি। ফিরে এসেই আহার করব।'

একটিও কথা বললেন না শচীদেবী। যন্ত্রচালিতের মত নীরবে সব তুলে রাখতে রাখলেন ঘরে। নিথর নির্বাক তিনি। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঠিকমত দেখা গেল না তাঁর মুখ।

আঃ, কি আরাম। বহুদিন পরে নিমাই গঙ্গায় অবগাহন করছে। কি সুন্দর নির্মল জল। মনের আনন্দে অনেকক্ষণ ধরে প্রাণভরে সাঁতার কাটল ওরা। জল ছোঁড়াছুড়ি করে মত্ত হলো জল কেলিতে।

এ সেই পূর্বের নিমাই। সেই দম্ভের শিরোমণি, সেই ঔদ্ধত্যের চূড়ামণি। যে নিমাই পূর্ববঙ্গকে ডুবিয়ে এল প্রেম বন্যায়, প্রমত্ত করে এলো সংকীর্তন রসে। এ নিমাই, আর সে নিমাই যেন এক নয়।

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শিষ্যরা প্রভুকে দেখে বিস্মিত। এমন চপলতা, এমন সারল্যের প্রতিমূর্তি কই ওদেশে ত এমন ভাবে তারা দেখেনি কখনো। এ যে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। ভিন্ন প্রতিমূর্তি। তারা কিছুতেই বুঝতে পারল না এই জলকেলির লীলামাধুরী। যিনি নিজেকে রেখেছেন প্রচ্ছন্ন করে, তাকে সাধারণে মনুষ্য—বুদ্ধিতে হৃদয়ঙ্গম করবে কেমন করে?

কতক্ষণ পরে রাত্রির অন্ধকারে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে নিমাই ফিরে এলো ঘরে। তখন শচীদেবীর রান্না শেষ। সবাইকে নিয়ে নিমাই শেষ করল ভোজন পর্ব। তারপর এলো বাইরে। বিষ্ণুগৃহের দালানে।

ইতিমধ্যে পাড়াপড়শীরা এসে মিলিত হয়েছে সকলে। ঘিরে বসল তারা নিমাইকে। শুনবে ও দেশের—পূর্ববঙ্গের গল্প। বন্ধুদের দেখে ভারী প্রীত হলো গৌরহরি। মেতে উঠল গল্পে। ও দেশের গাছপালা, আচার ব্যবহার, আন্তরিকতার কথা নিমাই বলতে লাগল রসিয়ে রসিয়ে। সকলে

হৃদয় দিয়ে উপভোগ করছে। গল্প করতে করতে নিমাই একসময়—

'বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥'

কথা শুনে প্রিয়জনরা হেসে লুটোপুটি। কি আশ্চর্যভাবে অনুকরণ করেছে নিমাই। কে বলবে নিমাই নবদ্বীপের মানুষ। যেন পূর্ববঙ্গ থেকে পুরো আস্ত বাঙ্গালটি হয়ে এসেছে। কথার মধ্যে এতটুকুও খুঁত নেই। পুরো বাঙালের টান।

এমনি ভাবে গল্পে গল্পে রাত হলো অনেক। তবু নিমাই উঠছে না। সঙ্গীসাথীদের যেন কারো বাড়ী ফেরার তাড়া নেই। কি যেন তারা বলতে চায়, অথচ বলতে পারছে না কিছুতেই।

'লক্ষ্মীর বিজয় কেহ না করে কথন॥'

ক্রমে রাত বেড়ে চলে। যেন গল্প শেষ হতে চায় না কিছুতেই। শেষে এক সময় আপ্তবর্গ ফিরে যায় যে যার ঘরে।

তখনো নিমাই জানে না কিছুই। বসে বসে পরম পরিতৃপ্তিভরে চর্বণ করে চলেছে তাম্বুল।

পারছেন না শচীদেবী বাইরে আসতে। কেমন করে তিনি এসে দাঁড়াবেন পুত্রের সম্মুখে। নিজেকে তিনি কিছুতেই সামলিয়ে উঠতে পারছেন না। নিভৃতে নির্জনে ঘরের মধ্যে বসে আছেন একাকী। অন্তর তাঁর দহন জ্বালায় জ্বলছে দাউ দাউ করে। শুধু গৃহ-অন্তরাল থেকে প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে বিচ্ছুরিত হচ্ছে স্বর্ণাভ রেখায়।

নিমাই উঠে চললো মায়ের কাছে। গিয়ে দেখলো মাতা বসে আছেন একা। বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল। আনত আঁখিযুগল দরদর ধারে ঝরে পড়ছে বেদনাশ্রু।

এমন অবস্থায় মাকে দেখে হু-হু করে উঠল নিমাইয়ের হৃদয়। কম্পিত কণ্ঠে মধুর স্বরে বললে—

'দুঃখিতা তোমারে মাতা দেখি কি কারণ।'

তারপর অভিমান ভরে অনুযোগ করে বললে—'কতদিন পরে ঘরে ফিরলাম। কোথায় আমার কুশল জিগ্গেস করবে। কাছে এসে বসবে। আদর-যত্ন করবে, তা না, এমন করে কাঁদছ কেন? দেখছি তোমাকে দুঃখিতা। সত্য করে বলো, কি হয়েছে তোমার?'

তবুও কিছু বলতে পারলেন না শচীদেবী। শুধু চোখ দিয়ে অজস্র ধারে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রু। কিছুতেই পুত্রের দিকে তাকাতে পারছেন না

মুখ তুলে। যত অনুনয় করে নিমাই। মা শুধু অধোমুখে কাঁদেন। মুখ দিয়ে একটি কথাও হয়না উচ্চারিত।

কেমন যেন সন্দেহ হয় নিমাইয়ের। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা অজানা আশংকা জেগে উঠে তার হৃদয়ে। মাকে জিগ্যেস করে নিমাই।

'তোমার বধূর কি কিছু অমঙ্গল হয়েছে?'

এবার ডুকরে কেঁদে উঠেন শচীদেবী। অন্তরাল থেকে কারা যেন বললো—'কিছু করা গেল না কালসাপে কেটেছিল তাকে। কত বদ্যি, কত ওঝা ডাকলাম। কেউ কিছু করতে পারল না। লক্ষ্মী সব মায়া কাটিয়ে, আমাদের কাঁদিয়ে চলে গেল স্বর্গে।'

বলতে বলতে অন্তরাল থেকে তারাও কেঁদে উঠল ডাক ছেড়ে।

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল নিমাই। প্রিয়ার বিরহে নিমাইয়ের হৃদয় যেন হাহাকার করে উঠল। নিমাইয়ের দু'চোখ বেয়ে নামল অশ্রুর বন্যা। বড় দুঃখে, বড় অভিমানে প্রিয়া তাকে চলে গেছে ছেড়ে। প্রিয়ার মুখমণ্ডল ভেসে উঠল হৃদয়ে। দরদর ধারে ঝরছে চোখের জল। একটা কথাও বলতে পারছে না নিমাই। প্রিয়া তার নেই, একথা যে সে ভাবতে পারছে না কিছুতেই। সে তবে এ-সংসারে আর কাকে নিয়ে থাকবে। কার জন্য সে ছুটে গিয়েছিল পূর্ববঙ্গে। প্রিয়া হারানোর বেদনা কেমন করে সহ্য করবে নিমাই।

একটা অসহনীয় ব্যথায় নিমাই যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

শচীদেবী বুঝতে পারলেন ছেলের মন। লক্ষ্মী হারানোর ব্যথা কতখানি বিদগ্ধ করছে তার অন্তরকে। তাই আকুল হয়ে বললেন -

'তুই রেখে গিয়েছিলি তোর হৃদয়-নিধিকে আমার কাছে গচ্ছিত করে। আমি তাকে হারা করে ফেলেছি। সে পাপিষ্ঠ সর্প আমাকে কেন দংশন করল না, আমি গেলে দুঃখ ছিল নারে, আমার ঘরের লক্ষ্মী, তাকেই নিয়ে গেল কালসাপে। আমি কি বলে তোকে প্রবোধ দেব রে।' এমনি ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শচীদেবী লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতে।

'নয়নে গলয়ে জল—ভিজে হিয়াবাস।
শিরে কর হানি ছাড়ে তপত-নিঃশ্বাস॥' চৈ. ম. লোচন।

নিমাই মায়ের কান্না দেখে সংযত করলে নিজেকে। প্রিয়া-বিরহ-বিধুর অন্তর তার যদিও ভরে উঠেছে হাহাকারে, তবুও আবেগ সংযত করে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, জীবনে এর চেয়ে কি আর বড় আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে।

'স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায়ে যে সুকৃতি।
তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী ॥'

নিমাইয়ের হৃদয়-তন্ত্রীতে তখন বেজে উঠল বৈরাগীর একতারা। মনে হলো কে তার স্ত্রী, কে তার আত্মীয় পরিজন। এ সংসার ত অনিত্য। মৃত্যু, কোথায় মৃত্যু? সমস্ত শোকের পরপারে ত একমাত্র আনন্দ স্বরূপেরই অবস্থান তাই—

'প্রভু বলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণ।
ভবিতব্য যে আছে তা খণ্ডিবে কেমন ॥
এই মত কালগতি কেহো কারো নয়।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কয় ॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে পার ॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
সেই সে হইল আর কি কার্য দুঃখ তায় ॥' চৈ· ভা·

কালকে ত আর কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না। আমরা সকলেই কালের বশ। তিনি পরিচালিত করছেন এই চরাচর। অতএব মা তুমি কান্নাকাটি করে কি করবে। ধৈর্য ধরো। নিজেকে সংযত করো।'

এমনিভাবে নিমাই মাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে, নিজের হৃদয়কেও শান্ত করতে চাইল। লক্ষ্মী হারানোর ব্যথা যতই হৃদয়-বিদারক হোক, তাতে ত অধীর হলে চলবে না। এখনো যে অনেক বাকি। তাকে হাঁটতে হবে অনেক পথ।

এই বিরহই তাকে পৌঁছে দেবে প্রেমের বৃন্দাবনে। আস্বাদন করতে সহায়তা করবে ব্রজের লীলা মাধুর্য। ব্যথা না পেলে দেখা যে দেবেন না ব্যথিতের ভগবান। ব্যথাতুর গৌরহরি, লক্ষ্মী হারানোর ব্যথাকে তাই গ্রহণ করলো আশীর্বাদরূপে।

এক এক সময় সনাতনের মনটা বড় বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে দুঃখে। তিনি পারেন না নিজেকে ধরে রাখতে, তার ত কোন কিছুর অভাব নাই। লক্ষ্মী-সরস্বতী বাঁধা তাঁর ঘরে। তবে কেন এই হাহাকার। কেন বিষণ্ণতা।

পিতা দুর্গাচরণ মিশ্র ছিলেন বড় পণ্ডিত। আদি বাড়ী ছিল মিথিলায়। পূর্বপুরুষরাই এসেছিলেন নদীয়াতে। এখানে এসে প্রতিষ্ঠা লাভে কোন অসুবিধা ঘটেনি। দুর্গাচরণ সহজেই নদীয়ার বিদ্বান সভায় স্থান পেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশ। কুলমর্যাদা তার ছিলই। বিজয়া দেবী পণ্ডিত দুর্গাচরণ মিশ্রের স্ত্রী।

সনাতন ছিলেন পিতার যোগ্য পুত্র। নিজের গুণে তিনি রাজপণ্ডিত উপাধি পেয়েছেন। গৃহ তাঁর আনন্দে পরিপূর্ণ।

কিন্তু তবু তাঁর কেন এই দুঃখ। কেন এই হাহাকার। মনে কেন নেই শান্তি। সংসারটা তার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় মরুময়। মনে হয়, এই সংসারে সুখ শান্তি বলে কিছু নাই।

এ সংসারে কালিদাস ছাড়া সবই শূন্য মনে হয়। মনে হয় বিষাদমগ্ন এ সংসার।

কচি বউ তার বিধুমুখীর পানে তাকালে সনাতনের বুকটা হাহাকার করে ওঠে। তিনি পারেন না নিজেকে ধরে রাখতে কিছুতেই। শুভ্রবস্ত্র পরিহিত। এয়োতীর চিহ্ন নাই কপালে। হাতে নাই এয়োতীর শাখা। সনাতনের চোখের জল বাধ মানে না কিছুতেই। স্ত্রী মহামায়া বিধুমুখীকে দেখলেই কেঁদে উঠেন হাউ হাউ করে।

অথচ কি বা তার বয়স হয়েছিল। একটা ছেলে হতেই মারা গেল কালিদাস। সনাতন বড় ভালবাসত ছোট ভাই কালিদাসকে। সেই ছিল তার সংসারের সব। লক্ষ্মণের মত ভাই তার। সে ভাইকে হারিয়ে চারিদিকে অন্ধকার দেখছেন তিনি। হয়ে পড়েছেন বড় দুর্বল। যেন ডান হাতটাই ভেঙে গেছে তার।

আহা, স্বামীহারা বিধুমুখী। জীবনে কি আছে তার। যৌবনের স্বাদ

আহ্লাদ পেল না কোন কিছুই উপভোগ করতে। শুধু কান্না, কান্না দিয়েই যেন তার জীবন। দুঃখের প্রকাশ ঝরে পড়ে অশ্রু হয়ে। মাঝে মাঝে বিষাদাক্লিষ্ট মুখে বসে থাকে বিধুমুখী। কোন সান্ত্বনা দিতে পারেন না সনাতন তাকে।

বিধুমুখীর দিকে তাকিয়ে মহামায়ার চোখ ফেটে আসে জল। পরম স্নেহ-ভরে টেনে নেন আপন বুকে। টপ টপ করে বিধুমুখীর মাথায় ঝরে পড়ে মহামায়ার চোখের জল। এই চোখের জলই একমাত্র সান্ত্বনা তার।

সনাতন নিজেকে যেন গুটিয়ে নিতে চান অনেকখানি। বিষ্ণু-গৃহে বিষ্ণু আরাধনায় কাটে তাঁর দিনের অধিকাংশ সময়। জপ তপ এই যেন হয়েছে তার জীবনের সম্বল। তবুও মাঝে মাঝে বুক ফেটে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেই ছুটে যান মাতা বিজয়া দেবীর কাছে। প্রণাম করেন ভক্তিভরে তাঁর দুটি চরণে। ন্যায়ে নিষ্ঠায় সনাতনের তুলনা হয় না।

স্বামীর বিশুষ্ক মুখ দেখলে শুকিয়ে যায় মহামায়ার হৃদয়। তিনি হয়ে ওঠেন চিন্তিত। স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি অপরিসীম তাঁর। স্বামী অনুরাগে অনুরাগিণী দেবী মহামায়া।

এমনি অচলা ভক্তি না হলে অন্তরে বিশ্বাস জন্মাবে কেমন করে। বিশ্বাসই ত নিয়ে যায় বিশ্বপিতার সান্নিধ্যে। প্রার্থনা করেন মহামায়া—

'হে দয়াময়, তোমার দয়াতেই বেঁধেছি এ সংসার। আমি ত তোমারই সেবাদাসী। হে প্রভু, তুমি দয়া কর। আবির্ভূত হও শিশুরূপে।'

ভক্তের ডাকে সাড়া দিলেন ভগবান। তিনি যে ভক্তবৎসল শ্রীমধুসূদন। না সাড়া দিয়ে থাকবেন কেমন করে। হল করুণাময়ের করুণা। মহামায়া দেবী হলেন সন্তানসম্ভবা।

দিন যায়, মাস যায়। কেমন যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন দেবী মহামায়া। প্রথম সন্তান-সম্ভাবা তিনি। ভীষণ ভয় করে তার। কি জানি কত কষ্ট, কত যন্ত্রনা, না জানি সহ্য করতে হবে তাকে। মাঝে মাঝে ভাবনা চিন্তায় বড় অধীর হয়ে ওঠেন।

সনাতন মিশ্র আকুল প্রার্থনা জানান বিষ্ণুর পাদপদ্মে। 'হে প্রভু, তুমি ত সর্ব সন্তাপহারী। তুমি পার কর এ বিপদ থেকে মহামায়াকে।'

দেখতে দেখতে এসে গেল মার্গশীর্ষ। অর্থাৎ শুভ মাঘ মাস।

১৪১৫ শকাব্দ।

শুভ শুক্লা পঞ্চমী তিথি।

প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে উঠলেন দেবী মহামায়া। ঢুকেছেন প্রসব গৃহে। কাঁদছেন ব্যথায় আকুল হয়ে। অস্থির সনাতন। ঘরবার হচ্ছেন ঘন ঘন। মুখে উচ্চারণ করছেন ব্রহ্ম সনাতন নাম। স্মরণ করছেন বিষ্ণুকে।

হে দুঃখহারী শ্রীমধুসূদন, তুমিই ত দাও মানুষের হৃদয়ে সন্তাপ, আবার তুমিই শোনাও সন্তাপ-হরণের মহামন্ত্র। শোনাও শান্তির অমিয় বাণী। ব্যথা সইবার শক্তি দাও মহামায়াকে প্রভু।

সনাতন সহসা চমকে উঠলেন। দেখলেন বিদ্যুৎ চমকের মত একটি আলোকরশ্মি যেন বিচ্ছুরিত হলো মহাকাশ থেকে একটা আনন্দের ধারা যেন নেমে এল মিশ্র-ভবনের অঙ্গনে।

গৃহে বেজে উঠল শুভ শঙ্খ। হুলু ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল প্রসূতির গৃহ। পুরললনাদের সহর্ষ কণ্ঠধ্বনি উচ্চকিত করে তুলল সনাতনকে।

সনাতন মন্থর চরণে এগিয়ে গেলেন মহামায়ার গৃহের দিকে। সনাতনকে দেখে পুরাঙ্গনাগণ সরে দাঁড়ালো। উঁকি মেরে দেখলেন সনাতন।

কিন্তু একি!

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন রাজপণ্ডিত।

এ যেন একটা আলোর পুতুলী। সারা ঘর আলো করে আছে।

এ জ্যোতির্ময়ী কে এলো তার গৃহে। মহামায়ার আঁধার ঘর যেন হয়ে উঠেছে আলোকিত। এ কোন দেবী এলো তার গৃহে মানবী রূপে। সনাতনের পলক আর পড়ে না। তিনি তাকিয়ে থাকেন অবাক বিস্ময়ে।

ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে তাঁর হৃদয়। তিনি প্রণাম জানান এই আদ্যাশক্তিকে। বার বার প্রশ্ন করেন নিজেকে নিজেই—

'কাঞ্চন বর্ণা কে এই শিশু। কি এই শিশুর পরিচয়। যেন একটা আলোর ঝর্ণা। নেমে এসেছে স্বর্গের মন্দাকিনী থেকে। ব্যথায় পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে মহামায়ার মুখমণ্ডল। বেদনার্দ্র আঁখিযুগল তার। কিন্তু সৃষ্টি যন্ত্রণার অবসানে একটা প্রশান্তির আভাস প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে কপাল কুণ্ডনে।

পরম স্নেহভরে শিশুকে কোলে তুলে নিয়েছে মহামায়া। বার বার চুমু খাচ্ছে আদর করে। হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মাথার কৃষ্ণ কুন্তলে। শিশু কাঁদছে, অবিরল কেঁদে চলেছে একটানা।

রাজপণ্ডিত সনাতন দেখছেন অপলক নয়নে। শিশু-কন্যার চোখ, মুখ, ভ্রু-যুগল, হস্ত, পদ করাঙ্গুলি—এ সবই দেবকন্যার মত। যেন ভক্তের আকুল আহ্বানে তিনি এসেছেন, শিশু হয়ে ধরা দিতে মানবীরূপে।

আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল সনাতনের হৃদয়। তিনি বলে উঠলেন—'ওরে, কে কোথায় আছিস, তোরা আনন্দ কর। জ্বেলে দে মঙ্গল দীপ। দীপান্বিতার মত আলোকমালার সুসজ্জিত কর গৃহাঙ্গন। বাজা, আরো বাজা মঙ্গল শঙ্খ।'

আনন্দের সীমা নাই সনাতনের। মহামায়াও ভারী খুশি এমন অপূর্ব শিশু কন্যা কোলে পেয়ে। তাঁর হৃদয় মন যেন জুড়িয়ে গেছে। শ্রীবিষ্ণু পূরণ করেছেন তাঁর প্রার্থনা। আজ তাঁর মত ভাগ্যবতী কে আর আছে।

দিন যায়। মাস যায়।

ধীরে ধীরে বেড়ে চলে শিশু-কন্যা। কি অপূর্ব হৃদয় জুড়ান কান্তি, কি প্রশান্তিময় নয়ন জুড়ান দীপ্তি। চন্দ্রের কলার মত বেড়ে চলে রূপমাধুরী।

আট মাস হতে না হতেই যেন অষ্ট সিদ্ধা হয়ে ওঠে কন্যা। কথা বলে আধো আধো। অস্পষ্ট, অব্যক্ত সে ধ্বনি। তবু অমিয় মাখা। যেন সুধা ঝরে আধ আধ বোলে।

কখনো কখনো হাত-পা নেড়ে খেলা করে। ছোট ছোট দুটি হাতে তালি দিয়ে গান করে। ভাষাহীন সে এক অপূর্ব সঙ্গীত লহরী। শোনা যায় শুধু আ-আ একটানা। আবার কখনো কখনো বা দুহাতের করাঙ্গুলি মুখে পুরে চুষে চুকচুক করে। চুষতে চুষতে ইতিউতি তাকায় এদিকে ওদিকে। আবার কখনো কখনো বা হেসে উঠে খিলখিল করে। নিজেকে নিজেই।

আবার, হাসতে হাসতে কখনো বা কাঁদে। কেঁদে উঠে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করে।

গৃহকাজ ফেলে ছুটে আসেন মহামায়া। আস্তেবাস্তে কোলে করেন কন্যাকে। স্তন্য দিয়ে শান্ত করেন মাথায় হাত বুলিয়ে। বড় বড় একমাথা কালো চুলে ধীরে ধীরে চিরুণী দেন আদর করে।

সহসা স্তন্যপান ছেড়ে কন্যা তাকায় মায়ের মুখের দিকে। কি সুন্দর টানা টানা দুটি চোখ। সুবঙ্কিম সুঅঙ্কিত ভ্রূযুগল। শিশু-কন্যাকে দেখে পরিতৃপ্তিতে ভরে ওঠে মহামায়ার বুক। থাকতে পারেন না কিছুতেই। দুহাতে অঞ্জলিবদ্ধ করে দুগণ্ডে চুম্বনে চুম্বনে উৎফুল্ল করে তুলেন। খিলখিল করে প্রাণখুলে হেসে ওঠে কন্যা।

হামাগুড়ি দিতে দিতে এক সময় উঠে দাঁড়ায় শিশু। চলতে গেলে আছাড় খায়। আবার মাটি ধরেই উঠতে চেষ্টা করে। কি সুন্দর পদ্মের পাপড়ির মত

পদাঙ্গুলি। শুভ্র ননীর পুতুলি যেন। বাঁকা ঠোঁটে কান্না ভরা মিঠে মিঠে হাসি। চোখে তার চকিত চাহনি।

খেলা করে মহামায়া অবসর ক্ষণে। কন্যাকে নিয়ে। দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে আয়! আয়!! মায়ের হাত ধরতে চেষ্টা করে শিশু কন্যা। ছোট দুটি হাঁত বাড়িয়ে দেয় মায়ের হাতের নাগাল পাওয়ার আশায়। উঠতে গিয়ে পড়ে যায়। কেঁদে উঠে।

মহামায়া থাকতে পারেন না। দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন কন্যাকে। শিশু কন্যা মুখ লুকায় মায়ের বুকে

সনাতন আর দেরী করতে পারে না। উদ্যোগ আয়োজন করে কন্যার অন্নপ্রাশনের।

ধুম পড়ে সনাতনের ঘরে।

নদীয়ার ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ। কেউ কোথাও যেন বাদ না পড়ে। রাজ-পণ্ডিতের কন্যার মুখে ভাত। সে কি সামান্য আয়োজন। অতএব বাদ পড়বে কেন কেউ। বার বার করে স্মরণ করেন, না জানি কাউকে নিমন্ত্রণ করা হলো বা বুঝি।

দীন, দুঃখী, ধনী-দরিদ্র—এলো সকলেই। মহা উৎসব লেগে গেল মিশ্র বাড়ীতে। একটা তৃপ্তির হাসি উথলে উঠল সনাতনের মুখে। ভারি খুশি তিনি। এসেছে গরীব দুঃখী—সকলকেই তিনি যথাযোগ্যভাবে পরিবেশন করছেন। সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন, যেন কোথাও কোন ত্রুটি না হয়।

সকলেই দেখতে চায় কন্যাকে। যাকে উপলক্ষ্য করে এত আয়োজন, এত দীয়তাং ভুজ্যতাং ব্যাপার। তাকে না দেখে, তাকে আশীর্বাদ না করে তারা যাবে কেমন করে।

সনাতন কোলে করে নিয়ে এলো কন্যাকে।

দেখবে তোমরা, দেখ।

কন্যা দেখে সকলেই মুগ্ধ। সকলেই কোলো করতে চায়। সকলেই চুমু খেতে চায়। একে দেখে শুধু তৃপ্ত হয় না। বুকে করে আদর করতে ইচ্ছে করে। বুকে নিলে আর ছাড়তে ইচ্ছা করে না। কেমন যেন নেশা ধরে যায়।

সকলে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করল। একজন জিগ্যেস করলে—

'তা রাজপণ্ডিত, কন্যার নাম কি রেখেছ?

'বিষ্ণুপ্রিয়া।' ভক্তিনম্র কণ্ঠে সনাতন বললে।

বিষ্ণুর প্রসাদী ফুল এটি। গৃহদেবতা শ্রীবিষ্ণু দিয়েছেন কৃপা করে

ভারী সুন্দর নাম। সত্যি এ বিষ্ণুরই প্রসাদী ফুল। সনাতন তুমি ধন্য। তুমি মহা ভাগ্যবান। সার্থক তোমার বিষ্ণু আরাধনা।

কোলছাড়া করতে চায় না পাড়ার মেয়েরা। সকলে নিয়ে টানাটানি করে। সকলেই নিয়ে যেতে চায় আপন গৃহে। যে নিয়ে যায় সহজে দিয়ে যেতে চায় না।

এত ভাল লাগে না মহামায়ার এত করলে মেয়ে তার খাবে কখন, ঘুমাবে কখন। শরীর যে খারাপ হয়ে যাবে কন্যার। আবার তিনি কাউকে কিছু মুখ ফুটে বলতেও পারেন না। নিরুপায় হয়ে মাঝে মাঝে লুকিয়ে রাখেন কন্যাকে। কখনো বা বলেন—'এখন ঘুমুচ্ছে আমার প্রিয়া। তোমরা ফিরে যাও। ঘুম থেকে উঠুক, তখন তোমরা এসো।'

হতাশ হয়ে ফিরে যায় পাড়াপড়শী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন মহামায়া।

দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠে বিষ্ণুপ্রিয়া পদার্পণ করে কৈশোরে। মনের মত করে সাজান মহামায়া কন্যাকে নানা অলংকারে ভূষিত করেন। সোনার কঙ্কণ দেন ছোট দুটি হাতের মনিবন্ধে। গলদেশে রত্নহার। রুপোর নূপুর গড়িয়ে দেন পায়ে। ঝুম ঝুম নূপুর বাজে চরণে।

কিন্তু এত অলংকারের অলংকরণে বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ কি বাড়ে। বুঝি অলংকারও ম্লান হয় বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপে রূপাতীতকে অলংকারের রূপে কি শ্রীমণ্ডিত করা যায়।

কাঞ্চনা আর অমিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার কৈশোরের সাথী। তারা আসে ছুটে। দুজনেই তারা ভালবাসে প্রিয়াকে। খেলার ঘর গড়ে তুলে তারা প্রিয়াকে নিয়ে।

সব থেকে প্রিয়ার প্রিয় খেলা হলো গঙ্গাস্নান। ত্রিসন্ধ্যা মায়ের সঙ্গে যাওয়া চাই। একদিন বাদ পড়লে কান্নাকাটি আরম্ভ করে প্রিয়া। মহামায়া কোনমতেই ফাঁকি দিতে পারেন না তাকে

গঙ্গায় গিয়ে মাকে ধরে ডুবে ডুবে স্নান করে প্রিয়া। এ স্নানে ভারি তৃপ্তি তার। অন্তর দিয়ে ভালবাসে জাহ্নবীর পুণ্য সলিল। শ্রদ্ধা, শুধু কি গঙ্গার প্রতি। মা বাবাকে প্রতিদিন ভক্তিভাবে প্রণাম করে বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া তাকে ছাড়া থাকতে পারে না।

গৃহদেবতা শ্রীবিষ্ণু, একমাত্র আরাধ্য দেবতা বিষ্ণুপ্রিয়ার। বিষ্ণুর শ্রীচরণে অন্তরের সব ভালবাসা, সব ভক্তি উজাড় করে দিয়ে নিজেকে সমর্পণ করে সে। ভালবাসা দিয়েই ত গড়া তার বরতনু। নিজের ভালমন্দ, সুখ দুঃখ, হাসিকান্না সব কিছুই উৎসর্গ করে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ পদ্মে। এই কৈশোর থেকেই কি যেন এক দুর্বার আকর্ষণে বিষ্ণু বিগ্রহের কাছে ছুটে যায় সে।

মন তার টানে। কিছুতেই ধরে রাখতে পারে না অবোধ মনটাকে। মন ত দেহেরই। অতএব মনেরই অনুসারী দেহ। তাই—

'দেহ মন সব করিয়া অর্পণ
দেবতারে পূজে প্রিয়া—
স্থির আঁখি তার ঢল ঢল ভাব
নিবেদন করে হিয়া।'

অন্তর নিবেদনের প্রিয়ার এই আর্তি, বয়ে আনছে কি যেন এক নতুন বার্তা এ সাধনা বুঝি 'আপনারে প্রিয়া করি প্রিয়কে দেবতা' করার সাধনা বিষ্ণুপ্রিয়া হয়ত বয়ে এসেছে এই নতুন সংবাদ।

দেবতা আর মানুষের দূরত্ব, সে ত স্বর্গ আর মর্তের মতো আকাশ-পাতালের ব্যবধান নয়। তিনি আছেন আমাদেরই মত, আমাদের ঘরে ঘরে, মনের নিভৃতে অত্যন্ত একান্তে। অত্যন্ত সংগোপনে।

তাকে চিনতে হবে। তাকে আবিষ্কার করতে হবে তাকে নিতে হবে খেলার সঙ্গী করে। মনের দোসর করে।

সেই সাধনাই ত মানুষের সাধনা সেই সাধনার সাধ্যবস্তু, হলো—অর্চন, পূজন আর বন্দন।

দেখতে দেখতে চোখের সামনে বিষ্ণুপ্রিয়া কেমন যেন বড় হয়ে উঠে।

দেহে মনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে তার। এ পরিবর্তন, বয়ঃসন্ধির পরিবর্তন। যৌবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁচেছে প্রিয়া। সাজতে ইচ্ছে করে, নিজেকে সাজাতে চায় সে। রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা সে। তার ত কোন অভাব নাই। তাই কাঞ্চনে কেয়ূরে ঝলমল করে ওঠে প্রিয়ার দেহ। কর্ণে দুলে কুণ্ডল। কণ্ঠে মণিহার। চরণে নূপুর।

সেজেগুজে যখন নিজের ঠমকে বঙ্কিম চরণে প্রিয়া চলে গঙ্গার ঘাটে, তখন তাকে দেখে প্রশ্ন জাগে বৈকি—

'কাঞ্চন বরণী কে বটে এ ধনী
বাঁকা গতি চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায়॥'

আহা, কি সুন্দর মুখমণ্ডল তার। আঁখি সুবিশাল, মানসভ্রমে বুঝি ছুটে আসে মরাল। আর এমন সুন্দর আঁখিতারা দুটি, বুঝি বিধাতা সৃষ্টি

করেছিলেন বিরলে বসেই। যেই দেখে সেই থাকে তাকিয়ে। প্রশ্ন জাগে মনে—

'কাহার নন্দিনী এই সুবদনী
নদেতে এমন কে।
কোন পুণ্য ফলে বল বল ওরে
এ কন্যা পাইল সে॥'

প্রিয়া আজ যেন আপন সৌরভে আপনি বিভোর। কস্তুরী মৃগসম উন্মনা সে। ভাবী সুন্দর মনে হয় এ ধরণীকে তার। ধীরে ধীরে গিয়ে বসে গঙ্গার ঘাটে। সিঁড়ির শেষ ধাপে। একেবারে জলের সান্নিধ্যে।

জলে ফুটে উঠে প্রতিবিম্ব তার। দেখে তন্ময় হয়ে নিজেকে নিজেই। যৌবনের বিপুল সমারোহ অঙ্গে অঙ্গে যেন উঠছে ঝলমল করে। ঐশ্চর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে তার দেহ। বিহ্বল হয়ে পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়া নিজের রূপ দেখে। নানা দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হয় তার তনু-মন-প্রাণ। দেখে, সে নিজেকে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে—

'পহিল বদরি কুচ, পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাড়য়ে, পীড়য়ে অনঙ্গ॥
সো পুন ভৈ গেল বীজক পোর।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর॥
প্রিয়ায়ত পেখলুঁ আপনি সন্ধান।
কি করতি করতহুঁ সিনান॥
তনু-সুখ বসন হিরদয় লাগি।
যো পুরুখ দেখব তা-কর ভাগি॥
উরহি লোলিত চাঁচর কেশ।
চামরে ছাঁপল কনক মহেশ॥'

জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে প্রিয়া হয়ে পড়ে ব্রীড়াবনত। ওদিকে আর তাকাতে পারে না। অবনত হয়ে আসে আঁখি-পল্লব তার। মুখে ফুটে উঠে মৃদু হাসির রেখা। লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠে মুখমণ্ডল। নবোদ্গত কুচযুগ প্রলুব্ধ করে তাকে। বারে বারে বক্ষ হতে খসে পড়ে আঁচল। লজ্জায় আচমকা জিব কাটে প্রিয়া চাঁচর চিকন কুন্তল বক্ষের কনক সদৃশ মহেশকে যেন আবৃত করে যৌবন-নিকুঞ্জে যেন বেজে উঠে শ্যামের বাঁশরী।

এমনি ভাববিহ্বল অবস্থায় অতীতের দিনগুলো কেমন যেন কানে কানে

কথা বলে উঠে। শচীদেবী তার সম্মুখে। আশীর্বাদ করে মাথায় হাত রেখে বলছেন—দেবপ্রিয়া হও তুমি—বিষ্ণুপ্রিয়া। হও তুমি চির এয়োত্রী।

ভারী স্নেহ করেন প্রিয়াকে শচীদেবী। এই ত সেদিন, মাকে উনি বললেন—'পণ্ডিত গৃহিণী, তুমি সত্যি রত্নগর্ভা। তোমাকে বিধাতা বেশ সুন্দর কন্যাটি দিয়েছেন। একে সুপাত্রে পাত্রস্থ করো।'

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। সহসা শচীদেবীর সঙ্গে চোখাচোখি হল ওর। মাথাটা নত হয়ে পড়ল লজ্জায়। জড়সড় হয়ে অধোবদনে একপাশে দাঁড়িয়েছিল ও। একটিও কথা বলতে পারেনি।

আজকাল কি যে ওর হয়েছে, বুঝতে পারে না কিছুই। ঘন ঘন আসতে ইচ্ছে করে গঙ্গাস্নানে। কাকে যেন দেখতে ওর খুব ইচ্ছে করে। গঙ্গার ঘাটে এসে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকায় এদিক ওদিক। কিন্তু কই, যাকে সে খুঁজছে, সে কোথায় ?

সহসা দেখতে পায় শচীদেবী উঠে আসছে স্নান করে। ওর কাছে যেতে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ কেমন আনচান করে ওঠে। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে কাছে। কিন্তু কি বলে সে যাবে! তার মনে জেগে ওঠে একটা উপলক্ষ্য। ধীরে ধীরে গিয়ে ভক্তি বিনম্র হৃদয়ে প্রণাম করে শচীদেবীকে। প্রণাম করে অধোমুখে দাঁড়িয়ে থাকে এক পাশে। কিছুতেই শচীদেবীকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না ওর। কেন যে ওঁকে প্রিয়ার এত ভাল লাগে, ও বুঝতে পারে না নিজেই। যদি দুটো কথা বলেন শচীদেবী। যদি বুকে টেনে নেন স্নেহভরে।

শচীদেবীও বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে পারেননি স্থির থাকতে। স্নেহভরে ডাকেন কাছে। এগিয়ে যায় বিষ্ণুপ্রিয়া।

মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে চুমু খেয়ে বলেন দেবী—'মাগো, তুমি একদিন আমাদের বাড়িতে যাবে? এই ত সামনেই আমার বাড়ী।'

কিছু বলতে পারে না প্রিয়া। লজ্জায় কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। ঈষৎ মাথা অবনত করে। সে জানায় নীরব সম্মতি।

শুধু বেড়াতে কেন, সে ত যেতে চায়। সেবা করতে চায় শচীদেবীর। তার মন ত সর্বক্ষণ পড়ে আছে ওখানেই। গোপন মনের যে বাসনা কেমন করে ব্যক্ত করবে শচীদেবীর কাছে। মনের গোপন আশা কি পূর্ণ হবে না বিষ্ণুপ্রিয়ার।

প্রিয়ার লজ্জারুণ ভক্তিমাখা মুখটি, শচীদেবীর খুব সুন্দর লাগে।

॥ এগারো ॥

শচীদেবীর মন প্রবোধ মানে না কিছুতেই। বুকটা তাঁর হাহাকার করে ওঠে। পুত্রের মতি গতি কেমন ভাল ঠেকছে না মোটেই। টোলে যায়। ছাত্র পড়ায়। তাদের নিয়ে স্নান করে গঙ্গায়। বাইরে বেশ হাসিখুসি দেখায়। তা দেখে কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

কিন্তু শচীদেবী যে মা, পুত্রের ব্যথা কোথায়, তা তিনি বুঝেন। বুঝতে পারেন অন্তর দিয়ে। বাইরে নিমাইকে যতই হাসিখুসি দেখাক, অন্তরে জ্বলছে তার লক্ষ্মী-বিরহের অগ্নি দাউ দাউ করে। তুষের আগুনের মত নিমাই পুড়ছে ধিকি ধিকি। সে কিছুতেই ভুলতে পারছে লক্ষ্মীকে। তাকে ভালবাসত হৃদয় দিয়ে। নিমাইয়েব প্রাণ-প্রিয়া ছিল—লক্ষ্মীপ্রিয়া।

তার বিরহ-ব্যথা সে কেমন করে মুছে দেবে পুত্রের হৃদয় থেকে। ভাবতে গিয়ে তার মনটা কেমন যেন বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ভেবে কোন কিনারা করতে পারেন না। কেমন যেন নিজেকে অসহায় বোধ করেন। হয়ে পড়েন নিরুপায়। এখন কি করবে শচীদেবী।

ভাবতে ভাবতে অনেক কথাই মনে পড়ে তাঁর। জ্বল জ্বল করে ওঠে পুরানো স্মৃতিগুলো। মনে পড়ে লক্ষ্মীদেবীর কথা। বিয়ে করতে যাবে নিমাই। দোলাতে ওঠার সময় কেঁদে উঠল হু-হু করে। সকলে বিস্ময়ে হতবাক। জিগ্যেস করে সকলে। কাউকে কিছু বলতে চায় না।

তখন বলেছিলেন তিনি। আজকের দিনে বাছা কাঁদতে নেই। তা তুমি কাঁদছ কেন? কান্না ভেজা চোখে বলেছিল তখন। তোমরা কেন মনে করিয়ে দিলে দাদা আর বাবার কথা। তাঁদের কথা ভেবেই আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারছি না। যদি আজকের দিনে তাঁরা বেঁচে থাকতেন।

তখন তিনি সান্ত্বনা দিয়েছিলেন ছেলেকে। এখন বুঝতে পারছেন শচীদেবী, সে কান্নার অর্থ কি। কোথায় বিঁধে আছে শেলসম সে ব্যথা পুত্রের হৃদয়ে। সংসারকে ও ভাবতে শিখছে অনিত্য বলে। মৃত্যু আর বৈরাগ্য। ঝড় তুলেছে ওর মনে।

ও বুঝেছে পত্নীপ্রেম, সেও ত একটা মায়ার খেলা। মিথ্যে মরীচিকা মাত্র। যাকে ও ভালবেসেছিল হৃদয় দিয়ে। যাকে সঙ্গী করে নিয়েছিল শৈশবের খেলা

ঘর থেকে। মল্লিকার মালা দিয়ে সেই শৈশবে যে ওকে বরণ করে নিয়েছিল। তিল তিল করে হৃদয়ে জমে উঠেছিল যে ভালবাসার পাহাড়। মুহূর্তে সেই ভালবাসার পাহাড় কোথায় গেল মিলিয়ে। সেই লক্ষ্মী কোথায় গেল হারিয়ে।

লক্ষ্মী সত্যি ভাল বৌমা ছিল তাব। অমনটি আর হয় না। লক্ষ্মীর ব্যথায় কেমন যেন মুহ্যমান হয়ে পড়েন শচীদেবী। অমন দেব-দ্বিজে ভক্তি। সংসারের প্রতি অমন হৃদয় ছেড়া টান……। ভোলা যায় না, ভুলতে পারেন না তিনি।

নিজের অবস্থা তার যদি এই হয়। তাহলে পুত্রের মনের অবস্থা— সহজেই অনুমান করতে পারেন তিনি। সান্ত্বনার ভাষা মুখে যোগায় না তাঁর।

তিনি ত দেখেছেন, খেতে বসে নিমাই কেমন আনমনা হয়ে পড়ে। এটা ফেলে ওটা খায়। খেতে মন বসে না তার। নিশ্চয়ই মনে পড়ে বৌমাকে। ভক্তি ভরে, পরিপাটি করে বৌমা খেতে দিত নিমাইকে। পাশে বসে বাতাস করত পাখা দিয়ে। মাছিটিও বসতে দিত না পাতে। রান্নাও করত কি সুন্দর। যা কিছু করত কোনটাতেই যত্নের অভাব ছিল না তার।

কখনো বিরক্ত হতো না কোন কিছুতেই। প্রায়ই অসময়ে দশ-বিশজন অতিথি আসত। হাসিমুখে ঢুকত সে হেঁসেলে। বাড়িতে সব কিছুই বাড়ত। তাই বলে কখনো নিজেকে বিব্রত বোধ করত না লক্ষ্মী।

শচীদেবীই বরং চিন্তায় হয়ে উঠতেন বিষণ্ণ। সাহস দিয়ে শাশুড়ীকে বলত সে, মা তুমি আয়োজন করো, আমি আসছি। রান্না করতে আর কতক্ষণই বা যাবে।

কোথা থেকে সব অভাব পূরণ হয়ে যেত বৌমা যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ছিলো। এমন বৌমা তার চলে যাবে, সে কথা কখনো ভাবতে পারেনি শচীদেবী।

তাহলে কেমন করে সে লক্ষ্মীর স্মৃতি ভুলাবে নিমাইকে। যে লক্ষ্মী তার সারা হৃদয় জুড়ে বিরাজ করছে, তাকে হৃদয় থেকে অপসারিত করবে কেমন করে।

কিন্তু না ভুলালে যে চলবে না। হয়ত ঘরে ধরে রাখা যাবে না নিমাইকে। ভাবতেই বুকটা কেমন যেন 'ছ্যাং' করে উঠলো। আপনাআপনি বলে উঠলেন 'না না, তা কখনো হতে পারে না।' এ তিনি হতে দেবেন না। দিতে পারেন না। তাহলে তিনি বাঁচবেন আর কি নিয়ে।

আত্মীয়বর্গকে জনে জনে ডেকে পরামর্শ করতে লাগলেন শচীদেবী। দয়া করে তারা পরামর্শ না দিলে, তিনি যে ডুবে মরবেন আড়াতেই। সর্বনাশ হয়ে যাবে তাঁর। এ বিপদে আত্মীয়-স্বজনই একমাত্র ভরসা শচীদেবীর।

ছুটে এলেন শ্রীবাসের পত্নী মালিনী দেবী। শচীদেবীর একান্ত সখী সে। নিভৃতে অন্তরের ব্যথা খুলে বললেন তাঁকে। সখি, তুই এর একটা বিহিত করে দে।

'শুনি বিপ্র পত্নী আদি আপ্তবর্গ সহে।
লাগিলা করিতে যুক্তি বুঝি কে কি কহে॥' চৈ· ভা·

সকলেই সিদ্ধান্ত করলে—'যদি নিমাইয়ের মনকে সংসারী করতে হয়, যদি বেঁধে রাখতে হয় সংসারে, তাহলে আবার বিয়ে দাও নিমাইকে।'

যুক্তিটি শুনে খুব মনে ধরল শচীদেবীর। তারও ত মনের বাসনা এই। তিনি কন্যা ঠিক করেই রেখেছেন। রূপে, গুণে, কুলে শীলে কোন অংশে হেয় করার মত নয়। যথার্থ সুন্দরী বিষ্ণুপ্রিয়া। বিনয়, নম্রতা, লজ্জা—এ সব ত আছেই—তাছাড়া বিষ্ণুপ্রিয়া বড় ভক্তিমতী। খুব পছন্দ তার বিষ্ণুপ্রিয়াকে।

এসব মনের কথা খুলে বললেন সইকে। শুধু সই কেন, তখন—

সবে বলিলেন আর কি কার্য বিচারে।
সর্বথা এ কর্ম গিয়া করহ সত্বরে॥' চৈ· ভা·

সকলের সম্মতি পেয়েও তবু শচী দেবী হয়ে ওঠেন চিন্তিত। কেমন যেন ভয় ভয় করে তাঁর তিনি পুত্রের কাছে প্রস্তাব রাখবেন কেমন করে। কাউকে দিয়ে জিগ্গেস করবেন, সে ভরসাও হয় না তাঁর। নিমাইয়ের যা মনের অবস্থা, এ অবস্থায় জিগ্গেস করাটাই অসংগত। শুধু তাই নয় একান্ত অসম্ভব। হয়ত বিয়ের কথা শুনলে না জানি কি কাণ্ড করে বসে।

পণ্ডিত বর্গের সঙ্গে তেমনি ঔদ্ধত্য আছে তার, শিষ্যদের নিয়ে হাস্য-কৌতুকও করে। কিন্তু—

'সবে পরস্ত্রী প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন একপাশ॥'—চৈ, ভা,

এ থেকে ত বোঝাই যায় নিমাইয়ের মনের অবস্থা। অন্ততঃ শচীদেবীর বুঝতে ভুল হয় না। এ অবস্থায় তাহলে তিনি কি করবেন। তাহলে কি নিমাইকে না জানিয়েই অগ্রসর হবেন এ পথে।

গঙ্গার ঘাটে ত কত নর-নারীই না এসেছে স্নান করতে। কত কিশোর-

কিশোরী, কত যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। কই এমন করে ত কেউ তাকিয়ে নেই। বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে যে পলক পড়ে না কিছুতেই। সে দেখছে, তাকিয়ে শুধু দেখছে। সে দেখছে তার রূপময়ের রূপ। তার মনের দিগন্তে যেন রঙ লেগেছে ফাগুনের। সে যুবতীর চোখ নিয়ে দেখছে তার কাঙ্খিত পুরুষটিকে। কি এক দুর্দমনীয় আকর্ষণ যেন টেনে নিয়ে গেছে তার চোখকে। লজ্জা, সরম, ভয়, ভীতি কিছুতেই সে আকর্ষণ পারছে না বিষ্ণুপ্রিয়ার দৃষ্টিকে প্রতিহত করতে। ঐ হৃদয় চোর বুঝি তার নিয়েছে হৃদয় চুরি করে। হৃদয়ে বেজে উঠেছে তার অনুরাগের বাঁশি। প্রিয়ার মনে রঙ লেগেছে। গোরা রঙে রঞ্জিত তার দেহ-মন।

যখন সম্বিত ফিরে আসে। অনুশোচনা আর লজ্জায় যেন ইচ্ছে করে মাটির সাথে মিশে যেতে। লোকে শুনলে ভাববে কি। কোন উপায় খুঁজে পায় না প্রিয়া। তার প্রাণ যে হয়ে উঠেছে গোরাগত। তাকে বিযুক্ত করবে কেমন করে। সেত যোগে-যাগেই হয়ে আছে যুক্ত। তাহলে কি বিয়োগে বিবাগী হবে।

কিন্তু রক্ত-মাংসের ভিতর দিয়ে সর্ব অস্থিময় অংকিত হয়ে গেছে যে গোরা রূপ, তাকে ত সে মুছতে পারবে না। শুধু ত আকুল নয়, ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তার প্রাণ-মন। সাগরের উত্তাল ঊর্মীমালার মত উদ্বেল হয়ে উঠেছে বিষ্ণুপ্রিয়া।

'না জানি সে গোরা রূপ লাগিল কেমনে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে॥
যেদিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি॥
কি ক্ষণে দেখিনু গোরা কিনা মোর হৈল।
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসু ঘোষ বলে গোরা রমনী মোহন॥'

এ জ্বালা বড় বিষম জ্বালা। এ জ্বালার জ্বলুনি মেটে না কিছুতেই। বিষ্ণুপ্রিয়া যেন জ্বলেপুড়ে নিজেকে নিজেই দগ্ধ হতে থাকে। কাঞ্চনা প্রাণের সই তার। তার কাছেও যেন বলতে পারে না। মরে যায় শরমে। এ যে বড় অকথন ব্যাধি। বুদ্ধিমতী কাঞ্চনার চোখ কিন্তু এড়ায় না। সে একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে ধরে নিয়ে যায় বিষ্ণুপ্রিয়াকে একান্ত নিভৃতে—নির্জনে।

হাত ধরে বলে—'সই, তুই সত্যি করে বলত, তোর কি হয়েছে। দ্যাখ অনুনয় করে বলছি, লুকাসনে আমার কাছে। আমি ত তোর সই, বল না, কিসের লজ্জা তোর!'

বিষ্ণুপ্রিয়া আর ধরে রাখতে পারে না নিজেকে। সখীর কোলে মাথা রেখে, দুবাহু দিয়ে সখিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে—

'নিরবধি মোর মনে গোরা রূপ লাগিয়াছে
কহ সখি কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরারূপে বিদরএ যায় বুক
পরাণ বাহির হৈতে চায়॥
কহ সখি কি বুদ্ধি করিব।
ভয় নাহি মোর মনে গুরুপতি গরজনে
গোরা লাগি পরাণ তেজিব॥
সব সুখ তেয়াগিলু কুলে তিলাঞ্জলি দিলু
গোরা বিনু আন নাহি ভায়।
নিঝরে ঝরয়ে আঁখি শুনহে মরম সখি
বাসু ঘোষ কি বলিবে তায়॥'

স্তব্ধ হয়ে যায় বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠ। কাঞ্চনাকে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে সে। কাঞ্চনা বুঝতে পারে সখির হৃদয়-ব্যথা। মুখে মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোতে বুলোতে সহমর্মী হয়ে উঠে সে। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয় প্রিয়ার চোখের জল। আলুলায়িত সুদীর্ঘ বিক্ষিপ্ত কেশভার, ধীরে ধীরে আঙুল দিয়ে সুবিন্যস্ত করতে চেষ্টা করে কাঞ্চনা। হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা দিতে চায় প্রিয়াকে।

সোহাগে বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুরাগ হয়ে উঠে উদ্বেল। বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মত হু হু করে বেরিয়ে আসে চোখের জল। বাধা মানে কিছুতেই। প্রিয়া আবেগে কাঞ্চনাকে সজোরে আঁকড়িয়ে ধরে বলে—

'গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে।
নিরবধি ছলছল আঁখি জল ঝরে॥
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল বেয়াধি।
নিরবধি পড়ে মনে গোরা গুণনিধি॥
কি করিব কোথা যাব গোরা অনুরাগে।
অনুক্ষণ গোরার প্রেম হিয়া মাঝে জাগে॥
গৌরাঙ্গ পিরিতি খানি বড়ই বিষম।
বাসু কহে নাহি রহে কুলের ধরম॥'

বিষ্ণুপ্রিয়া কেমন ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে, নীরব হয়ে যায়। মুদ্রিত নয়ন যুগল। থেকে থেকে ফুলে ফুলে কেঁদে ওঠে শুধু।

॥ বার ॥

শচীদেবী বড় নিঃসঙ্গ মনে করেন নিজেকে। তিনি আর পারেন না, পারছেন না এই অন্ধকার ঘরে একা একা থাকতে। শোকে দুঃখে যেন অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। নিমাই বড় একা। তার দিকে তাকাতে এখন বড় ভয় করে। একটি বধূ একান্ত অপরিহার্য তাঁর সংসারে।

মনে পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার স্নিগ্ধ শান্ত মূর্তি। অমনটি না হলে নিমাইকে ভোলান যাবে না লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিরহ ব্যথা। বড় ভাল মেয়ে। বড় ভক্তিমতী। ওকে যদি কোন মতে ঘরে আনতে পারে শচী, তাহলে নিমাইকে তার আপন গুণেই বশ করবে সে। এ বিশ্বাস বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি হয়েছে তাঁর।

প্রথম দর্শনেই শচীর হৃদয় হরণ করেছিল প্রিয়া। তাইত—

'শচীদেবী তারে দেখিলেন যেই ক্ষণে।
সেই কন্যা পুত্র যোগ্যা বুঝিলেন মনে॥'

কিন্তু সংশয় যে তার কাটতে চায়না কিছুতেই। সনাতন রাজপণ্ডিত। ধনে-জনে-মানে অনেক বড় তিনি। তার মত ফকীরের ঘরে তিনি কি কন্যাকে দিতে চাইবেন। ইচ্ছে করলে তিনি ত অনেক যোগ্য পাত্রই পাবেন। তবে কেন দিতে চাইবেন তার লক্ষ্মীকে এমন হা-ভাতের ঘরে।

বার বার সংশয়ের দোলায় দুলে উঠে শচীর মন।

অনেক ভাবনা চিন্তা করে ঘটক কাশী মিশ্রকে ডেকে পাঠালেন শচীদেবী। বললেন 'চেন তুমি সনাতন মিশ্রকে ?'

'কি বলছেন, চিনি না তাকে রাজপণ্ডিত। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। নদের তাবৎ লোকে এক ডাকেই সনাতন মিশ্রকে চেনে। তা আমি আর চিনব না।'

উৎফুল্ল হয়ে উঠল শচীদেবীর চোখমুখ। পরক্ষণে কেমন যেন মিইয়ে পড়লেন তিনি। তাহলে কাশীকে বলা কি ঠিক হবে। ও যে তাঁর হাড়হদ্দ জানে দেখছি। যদি মনের বাসনা ওকে খুলে বলি—ও মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হাসবে না তো!

হয়ত ভাবতে পারে, স্পর্দ্ধা ত কম নয়, সনাতন মিশ্রের মেয়েকে বুকে আশা পোষণ করে রেখেছে পুত্র বধূ করার। কি আছে ওর। দিনান্তে হয়ত হাড়িই

চড়ে না। ছেলে টুলো পণ্ডিত। সে খাওয়াতে পারবে সনাতন মিশ্রের মেয়েকে।

শেষ পর্যন্ত সব দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে মনের ভাব ব্যক্ত করে বললেন—

'সনাতনের একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, সুচরিতা, ভারি সুশ্রী। তাকে নিমাইয়ের জন্য দাও না ঠিক করে।'

কাশী যেন কথাটা বুঝতে পারছে না, এমনি ভাব করে তাকিয়ে রইল মুখের দিকে।

'আমার বড় ইচ্ছে ওকে বৌ করে ঘরে আনি।' আগ্রহ ভরে বললেন শচী-দেবী। কি জান, ওকে গঙ্গার ঘাটে প্রায়ই দেখি। দেখে দেখে কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। দেখলেই ইচ্ছে করে কোলের কাছে টেনে নিতে। ওকে ভারী ভাল লাগে আমার।'

মাথা চুলকোতে চুলকোতে কাশী মিশ্র বলে—'কাজটা বড় কঠিন মনে হচ্ছে। আসলে কি জানেন, রাজপণ্ডিত কি দিতে চাইবে তার কন্যাকে আপনার ঘরে।'

'তবু একবার চেষ্টা করে দ্যাখো না কাশী।' অনেকটা যেন হতাশা হয়ে নিস্তেজ কণ্ঠে অনুরোধ করলেন শচী মাতা।

'তবে কি জানেন, চেষ্টার অসাধ্য অবশ্য কিছু নেই। আপনি যখন বলছেন, যাচ্ছি সনাতনের বাড়ী।'

এই বলে উঠে পড়লে কাশী মিশ্র। রঘুনাথকে মনে মনে স্মরণ করলেন শচীদেবী। 'তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো প্রভু।'

সনাতনের বাড়ীর উঠানে পা দিতেই কাশীকে সাদর আহ্বান জানালেন রাজপণ্ডিত—'আসুন, আসুন। অনুগ্রহ করে বসে পড়ুন এই চৌকিটাতেই।'

সনাতনকে নমস্কার জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন কাশী মিশ্র।

—'তা আপনি, একেবারে ঘামে নেমে উঠেছেন যে। বসুন, খানিক জিরান। তারপর কথা হবে।'

'নানা, ও এমন কিছু নয়। একটু গরম পড়েছে। তা বয়স ত আর কম হলো না। তা যাকগে ওসব কথা। আপনি বসুন। কথাবার্তা বলি।'

সনাতন মিশ্র আগ্রহ ভরে তাকালেন কাশীর মুখের দিকে। চোখে তার ফুটে উঠল জিজ্ঞাসা।

'আপনি মায়াপুরে বৈদিক পাড়ার বিশ্বম্ভর পণ্ডিতকে চেনেন?'

'সে আবার কে? আপনি কার কথা বলছেন?'

'ঐ যে আমাদের নিমাই পণ্ডিত গো। তারি ভাল নাম হলো বিশ্বম্ভর

পণ্ডিত। তাকে আপনি চেনেন না?' যেন অনেকটা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন কাশী।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনি বিশ্বম্ভর বলতেই ত খুঁজে পাচ্ছিলাম না। নিমাই নামেই চেনে তাকে সকলে। এই ত কিছুদিন আগে যেন শুনলাম, কেশব কাশ্মীরী নামে কে যেন দিগ্বিজয়ী এক পণ্ডিতকে তর্কে হারাতেই সারা নদীয়ায় ভীষণ নাম ছড়িয়ে পড়েছে তার। তা যাকগে। এখন বলুন, কেন, কি হয়েছে তার?'

'না, আমি তারি কথাই বলছিলাম। আপনি তাকে দেখেছেন?'

'তা আর কেমন করে দেখবো বলো। নবদ্বীপে ত কত পণ্ডিতের বাস। আমি কি আর সকলকে চিনে রেখেছি, না দেখেছি। কেন, সে কি দেখতে খুব সুন্দর?'

'আপনায় বর্ণনা দিয়ে বলতে পারব না সে কথা। একদিন গিয়ে দেখে আসুন গঙ্গার ঘাটে। স্নানের সময় যাবেন। তাহলেই দেখা হয়ে যাবে।'

'তা না হয় গেলাম। কিন্তু চিনব কেমন করে? গঙ্গায় অমন কত ছেলেই ত স্নান করে?'

'তাকে আপনায় চিনিয়ে দিতে হবে না। সে, আপনি দেখলেই চিনতে পারবেন।' অনেকটা যেন গর্বভরে বললে কাশী মিশ্র।

'তা তুমি এমন করে বলছ কেন?'

'আগে দেখে আসুন। তারপর কেন বলছি পরে বলব। তবে—শুধু এইটুকু বলে যাই—এমন পাত্র সারা নবদ্বীপে আপনি আর দ্বিতীয়টি পাবেন না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, যখন এত করে বলছেন, দেখে আসব একদিন। তারপর সংবাদ দেব আপনায়।'

'না, আপনাকে ঠিক সংবাদ দিতে বলছি না। যদি ছেলে দেখে আপনার পছন্দ হয়, আর কন্যার বিয়ে এখন দেবেন বলে স্থির করেন, তাহলেই আমাকে জানাবেন।'

'নানা, এ কি বলছেন আপনি। বিষ্ণুপ্রিয়া আমার দেখতে দেখতে ত বেশ বড়টিই হয়ে পড়ল। এই এগার পেরিয়ে বারোয় পা দিয়েছে। এবার বিয়ে দিতে হবে বৈকি। বুঝলেন, আমি বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছি।'

সনাতন রাজপণ্ডিত বেশ আগ্রহ ভরে আন্তরিকতার সঙ্গে কথাগুলি বললেন।

'এখন আসছি তাহলে।' বলে নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়লেন কাশী মিশ্র।

এদিকে শচী দেবী ভাবছেন, কি জানি সনাতন কথাটা কেমন ভাবে নেবে। সে কি চাইবে তারমত গরিবের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে। কিংবা কাশী যদি আবার উল্টোপাল্টা কিছু বলে বসে। এমনি নানান্ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলছে তাঁর মন।

গঙ্গার ঘাটে কিনা বলা যায় না। হয়ত পথেই সনাতম দেখলেন নিমাইকে।

'এ কি মানুষ, না দেবতা।' স্তম্ভিত শুধু নয়, বিস্মিতও হলেন মনে মনে। এত রূপ, মনুষ্য শরীরে কখনো কি সম্ভব। যেন জ্যোতি ঠিকরিয়ে পড়ছে দেহ থেকে। ঠিক জ্যোতি বললে হয় ত ভুল হবে, একটা জ্যোতির আভা। এ জ্যোতি চিন্ময়। মায়াতীত এর অবস্থান।

সত্যি, এ অপরূপ, অসামান্য। এ কি মনোনীত করবে আমার কন্যাকে।

বাড়ীতে ফিরে মহামায়াকে বললেন সনাতন। 'বুঝলে গৃহিনী, বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য একটি ভাল ছেলে পেয়েছি। আমাদের পালটি ঘর।'

'তা সে ছেলেটি কে গো ?' আগ্রহ ভরে জিগ্যেস করেন মহামায়া।

—ওই যে জগন্নাথ মিশ্র, 'পুরন্দর' ছিল যাঁর উপাধি। তারই ছেলে নিমাই।

মহামায়া আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে সনাতন বললেন। "কি করে, কেমন ছেলে—এ সবই ত তুমি জিগ্যেস করবে। তা তোমায় বলছি শোন। বুঝলে, ছেলেটি প্রকাণ্ড পণ্ডিত। সারা নবদ্বীপ জুড়ে তার সুখ্যাতি। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে তর্কে হারিয়েছে সে। তার টোলে অসংখ্য ছাত্র। ঠাঁই দিতে পারেনি।

'আচ্ছা, তাই নাকি ?' বেশ কৌতুহল ভবে উত্তর দিলেন মহামায়া।

সনাতন বললেন—'কি বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার ?'

'অবিশ্বাসের কথা আবার বললুম কখন। তুমি তার মায়ের নাম কি জান ?'

'হ্যাঁ, কেন জানব না। নিমাইয়ের মায়ের নাম হলো শচীদেবী।'

'তা, এতক্ষণ বলনি কেন ?'

'তুমি কি তাকে চেন ?' বেশ আগ্রহ ভরে মহামায়াকে জিগ্যেস করলেন সনাতন।

'শুধু চেনা নয়, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপও হয়েছে।'

এবার উৎফুল্ল হয়ে সনাতন বললে—'কই, সে কথা ত আমায় বলনি কোন দিন। তা তুমি যখন সবই জান, এ বিষয়ে তোমার মতামত কি তাই বলো ?'

'কিন্তু তার মত বিদ্বান আর পণ্ডিত ছেলোক আমার বিষ্ণুপ্রিয়াকে পছন্দ করবে? তাছাড়া তুমি কি ঐ ঘরে তোমার মেয়েকে দেবে?' বেশ গম্ভীর ভাবেই মহামায়া কথা কটি বললেন।

ঠিক তোমার শেষের কথাটা বুঝতে পারলাম না। কি বলতে চাইছ তুমি? নিমাইয়ের বাবা নেই। একটা মাত্র বিয়ে করেছিল, সে বৌ সর্প দংশনে মারা গেছে। ছেলেপুলে কেউ নেই। আর……

বাধা দিয়ে মহামায়া বললেন—'না না, ওসব কথা বলছি না।'

'তবে কি বলতে চাইছ, তা খুলে বলো। কি আর বলবে, খুব গরিব এই তো। অর্থের জন্য ত এ যুগে কোন বাধা হচ্ছে না। আজকাল ধনবানের চেয়ে বিদ্বানেরই মান বেশি। কৌলিন্য ত কাঞ্চনে নয়, কৌলিন্য হলো পাণ্ডিত্যে। ধনী দোলা আরোহনে গমনাগমন করলেও পথে পণ্ডিতের সাথে দেখা হলে দোলা থেকে নেমে তাকে প্রণাম করতে হয়। বুঝলে গিন্নি, এ যুগে অর্থের কোন মর্যাদাই নাই। তা ছাড়া শাস্ত্রেই ত আছে—

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥"

কন্যা চায় বরের রূপ। বর যেন সুপুরুষ হয়। যার রূপে বিক্রম এবং পৌরুষ আছে। কন্যার মাতাই চায় বরের বিত্ত। যাতে মেয়ে খেয়ে পরে সুখে থাকে। বিদ্যা চায় কন্যার পিতা। যা থাকলে বর সভা-ভব্য, সম্মানিত রুচিমার্জিত আর বিবেকসম্পন্ন হতে পারে। আকাট মূর্খের হাতে কোন পিতাই চান না কন্যাকে সম্প্রদান করতে। বান্ধবেরা সংকুল ইচ্ছা করেন। এরা পিতৃবন্ধু, মাতৃবন্ধু এমন কি শ্বশুরেরও বন্ধু। আর অন্যান্যেরা মিষ্টান্ন পেলেই সন্তুষ্ট।

মহামায়া হেসে বললেন—'বুঝেছি। তার মানে আমি চাইছি বিত্ত। এই ত তোমার বক্তব্য। তা নয় গো, তুমি ভুল বুঝেছ। তুমি দেখো, ছেলে যদি মত করে। আমার ওতে কোন আপত্তি নেই। নিমাইয়ের মত ছেলে পাওয়া সে ত মহাভাগ্যের কথা।'

'তাহলে কাশী মিশ্রকে বলে দিই। তুমি কি বলো?'

'আমি ত ঐ বললাম। তুমি দেখ চেষ্টা করে।'

সনাতন মিশ্র অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এলেন বৈঠকখানায় কাশী মিশ্রের কাছে। বললেন—

'দেখুন মিশ্র মশাই, নিমাইয়ের মত জামাই বহু পুণ্যে মেলে। আপনি শচীদেবীকে গিয়ে বলুন, আমরা রাজী আছি কন্যা দিতে, এখন তিনি যদি

কন্যা নিতে সম্মত হন, তাহলে আমাদের নদীয়া বসতি সার্থক হয়।'

উৎফুল্ল হয়ে কাশী মিশ্র বললেন—'তাহলে এখন উঠি। শচীমাতার কাছে গিয়ে আপনার কথা বলি। তাঁর মতামত শীঘ্র নিয়ে আসছি।'

—'নমস্কার। আসুন, আসুন। বিষ্ণু যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।'

আড়ালে দাঁড়িয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া শুনেছিল সব কথা। আনন্দ তার আর ধরে না। নবানুরাগে পাগলিনী কিশোরী। সে যেন দেখছে গোরাময় অখিল চরাচর। দু'চোখ তার যেন ধরে রাখতে পারছে না গোরা মাধুর্যামৃত। দু'কূল প্লাবিত করে পড়ছে উছলে। সে আর পারছে না নিজেকে ধরে রাখতে।

বিষ্ণুপ্রিয়া চলেছে গঙ্গাস্নানে। এ ত স্নান নয়, শুধু ছল। যদি দেখতে পায় স্থূল চোখে তার বরকে। তাঁর গৌরসুন্দরকে। এই ত স্নানের সময় হয়েছে। তবে সে কি আসবে না পড়ুয়াদের নিয়ে গঙ্গাস্নানে। শচীদেবীকে দেখতে পেয়েই ছুটে আসে তাঁর কাছটিতে। প্রণাম করে শ্রীচরণে ভক্তিভরে। দূরে সরে যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে কাছটি ঘেঁসে। অধোমুখে, লজ্জাবিনম্র ভঙ্গিতে।

তা ছাড়া সে ঐ স্নেহাঞ্চল ছেড়ে যাবে কোথায়। সে যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ঐ অঞ্চল ছায়ায়। যেন মুখের বোবা ভাষায় বলতে চায়—আমাকে নিয়ে চল তোমার ঘরে আমার চির আবাধ্যের সান্নিধ্যে। আমি যে তোমাদেরই নিবেদন করে দিয়েছি আমার জীবন-যৌবন।

কাশী মিশ্র চলেছে বড় উৎফুল্ল হয়ে। আজ সার্থক তার দৌত্য। খুশি যেন ধরে রাখতে পারছে না কিছুতেই। দ্রুত হেঁটে চলেছে সে। তবু পথ যেন কিছুতেই ফুরোতে চায় না। কোনমতে একটি বার পেঁাছাতে পারলে হয় শচীদেবীর কাছে।

গিয়ে শোনাবেন শুভ সংবাদ। কৃতকার্য হয়েছেন তিনি। সার্থক করে তুলেছেন তাঁর স্বপ্নকে। অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করে তুলেছেন। এ কেবল সম্ভব হয়েছে কাশী মিশ্র বলেই। অন্য কেউ হলে পারত না। নবদ্বীপে কত ঘটকই ত আছে। কই করুক দেখি, এমন অসম্ভবকে সম্ভব। দেখা যাবে ঘটকাগিরির কত কেরামতি।

কাশী মিশ্রের হৃদয় ভরে উঠে আত্মশ্লাঘাতে। সে নিজেকে নিজে তারিফ

না করে পারে না। এবার বকশিস্ তার যায় কোথা। শচীদেবীর কাছে তিনি ঘটকমান্য আদায় না করে ছাড়বেন না। নিশ্চয়ই দিতে তিনি কাতর হবেন না। কেন, সে কি কষ্টটা কম করেছে নাকি।

ভাবতে ভাবতে কখন পৌঁছে গেছে শচীদেবীর বাড়ীর কাছে। যেন এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না তার।

কাশী মিশ্রকে দেখে বাইরে বেরিয়ে এলেন শচীদেবী। সদর দরজার কপাট খুলে দিয়ে বললেন—এসো কাশী। বসে পড ঐ পিঁড়িটাতেই।'

শচীদেবীকে প্রণাম করে কাশীনাথ বসে পড়লে পিঁড়িটাতে। জিগ্যেস করলেন শচীদেবী—'তা খবর কি বলো ?'

কাশী যেন আর আনন্দ চেপে রাখতে পারছেন না। বললেন, সনাতন মিশ্রের একান্ত আগ্রহের কথা। এখন আপনি যদি দয়া করে তার কন্যাটিকে গ্রহণ করেন। তবে তাঁদের নদীয়া বাস সার্থক হয়।

কথা শুনে ভারী প্রীত হলেন শচীমাতা। আশীর্বাদ করলেন তিনি কাশীনাথকে। বললেন, এজন্য তিনি যথোপযুক্ত মান্য দেবেন তার।

'তাহলে শুভস্য শীঘ্রম্। আপনি পাঠিয়ে দেন গণক ঠাকুরকে। সে স্থির করে আসুক শুভদিন। এদিকে আপনি লেগে যান উদ্যোগ-আয়োজনে। কাল বিলম্ব করবেন না আর অযথা।'

'আমি উঠি। ওদিকে গিয়ে বলি আপনার সম্মতির কথা। ওদেরইত ঝামেলা বেশী।' কাশীনাথ আর যেন ক্ষণমাত্র বিলম্ব করতে চায় না। উঠে চলে গেল সে।

॥ তের ॥

নিমাই সম্ভবত টোল থেকে বাড়ী ফিরছিল।

পথেই দেখা হয়ে গেল গণকের সঙ্গে। গণক হেসে বললে—'পণ্ডিত, কোথায় যাচ্ছি জান?'

'তা, আমি কেমন করে জানব বলুন?'

'সে তো ঠিকই। যাচ্ছি এখন সনাতন মিশ্রের বাড়ী।'

'তা, এই অসময়ে কেন চলেছেন সেখানে?'

'তার মেয়ের বিয়ে। দিন-ক্ষণ লগ্ন ঠিক করতে যাচ্ছি।'

'সে তো খুব ভাল কথা' নিমাই পাশ কাটিয়ে চলতে আরম্ভ করল। কথাটা শুনে গণক ঠাকুরের খুব যেন ভাল ঠেকল না। ডেকে বললে—'মেয়ের বিয়ে কার সঙ্গে হচ্ছে জানো না?'

'সে কথা আমি কেমন করে জানব' অবাক হয়ে নিমাই তাকিয়ে রইল গণক ঠাকুরের মুখের দিকে।

'সে কি! তোমার বিয়ে, আর তুমিই জান না। অবাক করলে দেখছি'

নিমাই হেসে উঠল হো-হো করে, হাসতে হাসতে বললে—'তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? আমার বিয়ে, অথচ আমি কিছু জানলাম না।'

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে তেমনি হাসতে হাসতে নিমাই চলে গেল হন্‌হন্ করে।

কেমন যেন গম্ভীর হয়ে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে রইল গণক ঠাকুর। তারপর চলতে লাগল ধীরে ধীরে

সনাতনের বাড়ীতে এসে দেখলে গণক, বিয়ের উদ্যোগ-আয়োজন চলছে পুরোদমে। সামনের উঠোন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তকতক করছে। জ্বালানের জন্য কাঠ চেলা হচ্ছে। জন মজুর কাজ করছে আনন্দের সঙ্গে। ব্যস্ত সমস্ত সকলেই? ওকে দেখে খুশী হয়ে বেরিয়ে এলেন রাজপণ্ডিত মশাই।

আসন গ্রহণ করে নিরুদ্যমের মত বসে রইলো গণক ঠাকুর। সনাতন বললেন—'দেরী করছেন কেন। পাঁজি-পুঁথি খুলুন। দেখে লগ্ন স্থির করুন।'

ম্লান মুখে বললে গণক—"পথে আসতে আসতে দেখা হলো নিমাইয়ের সঙ্গে।'

'তাই নাকি। সনাতন আগ্রহভরে বললেন—'কথা হল কিছু?' তুমি তাকে কিছু জিগগেস করলে নাকি?

গণক তখন বলতে আরম্ভ করলে—

"তারে দেখি আনন্দিত ভেল মোর মন।
কৌতুকে তাহারে আমি যে কৈল বচন—॥
কালি শুভ অধিবাস হইব তোমার।
বিবাহ হইব শুন বচন আমার॥
এ বোল শুনিয়া তেঁহো কহিল উত্তর।
কহ কোথা কার বিভা কে বা কন্যা বর॥
আমার সাক্ষাতে কথা কহিল এমন।
বুঝিয়া কার্যের গতি কর আচরণ॥" চৈতন্যমঙ্গল লোচন

গণকের কথা শুনে সনাতন চমকে উঠলেন। মাথায় হাত দিয়ে অধোমুখে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তাহলে তো এ বিয়েতে বুঝি নিমাইয়ের সম্মতি নাই। সম্মতি থাকলে নিশ্চয়ই এমন কথা বলতে পারত না।

বাড়ীতে আগত আত্মীয়দের ডেকে বসলেন পরামর্শ করতে। ছেলে এখন বড় হয়েছে। নিশ্চয়ই তার একটা স্বাধীন মত আছে। শচীদেবী এখন বৃদ্ধা। তাঁর কথা যে পুত্র শুনবেন, এমন তো কোন নিশ্চয়তা নেই। তার কথায় কি এসে যায়। এক্ষেত্রে ছেলের মতই প্রবল। অতএব ছেলের যখন মত নেই, তখন এ বিয়ে হবে কেমন করে।

সনাতনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এখন কি করবেন তিনি। নিজের ভাগ্যকে দোষ দেওয়া ছাড়া, কাকে আর দোষ দেবেন। আক্ষেপ করতে লাগলেন বন্ধুবর্গের কাছে—

"নানা দ্রব্য কৈল নানা উপহার
কাহারে কি দোষ দিব করম আমার॥
আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি
অকারণে আদর ছাড়িলা গৌরহরি॥" চৈতন্যমঙ্গল লোচন

চারদিকের আনন্দ কোলাহল মুহূর্তের মধ্যে বিষাদে ম্লান হয়ে এল। সংবাদ গেল অন্তঃপুরে।

পতিব্রতা কুললক্ষ্মী মহামায়া খবর শুনে হয়ে উঠলেন শোকসন্তপ্ত। হাহাকার করে উঠল তাঁর হৃদয়। বিষ্ণুভক্তিমতী তিনি। স্বামীর দুঃখ দেখে হয়ে উঠলেন দুঃখিতা। লাজলজ্জা পরিত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন সদরে—বৈঠকখানায়। বললেন স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে—

'আপনে যে বিশবম্ভর না করিল কাজ।
তোমারে কে দোষ দিবে নদীয়া সমাজ॥
আপনে সে না করিলা বিশ্বম্ভর হরি।
তোমার শকতি কিবা করিবারে পারি॥
শকতি সম্ভবে নাহি দুঃখ অকারণ।'
বলিতে ডবাও দুঃখ ঘুচাহ এখন॥

'তুমি এত ভেঙ্গে পড়ছ কেন' মানের ভয় করছ ত। এতে লজ্জার কি আছে বলো। বিশ্বম্ভর ত নিজেই রাজী হচ্ছে না। সেই বিয়ে করতে চাইছে না। এ কথা কি নদীয়ার সমাজ বুঝবে না। দেখো ঠিকই বুঝতে পারবে। এতে তোমার কতটুকু দোষ আছে বল। তুমি শুধু অকারণ দুঃখ পাচ্ছ। এতে ভয়ের কিছু নাই।'

সনাতন তবুও নিজেকে স্থির করতে পারেন না। জীবনে এত বড় আঘাত, এত বড় অসম্মান কখনো তিনি পান নি। মহামায়া যতই বলুক। নদীয়ার সমাজে তিনি মুখ দেখাবেন কেমন করে। তিনি কি বা কৈফিয়ৎ দিবেন তাঁদের। এ যে প্রত্যাখানের বেদনা। বড় দুঃসহ। বড় মর্মান্তিক।

ডুকরে কেঁদে উঠেন বৃদ্ধ সনাতন। তিনি পারছেন না কিছুতেই সহ্য করতে। ভেঙ্গে পড়েন কান্নায়। বিলাপ করেন কাঁদতে কাঁদতে—

"মোরে ঘৃণা না করিবে পতিত বলিয়া।
কত কত পতিতেরে লৈয়াছ তরিয়া॥
জয় বিশ্বম্ভর জনগণ-ত্রাণ দাতা।
জয় সর্বেশ্বরেশ্বর বিধির বিধাতা॥
মুঞি সে অধমাধম মতি অতি মন্দ।
কভুনা পাইল তোর ভজনের গন্ধ॥ —চৈ. ম. লোচন।

এ যে আত্মনিবেদনের বিলাপ। এ যে নিজেকে সর্ব সমর্পণ করছে সনাতন। নিজের মনের সব আবিলতা, সব গ্লানি কান্নার অশ্রুতে ধুয়ে দিতে চাইছে বিশ্বম্ভরের শ্রীচরণে। ভাসিয়ে দিতে চাইছে খ্যাতির গৌরব। পাণ্ডিত্যের অহংকার বিসর্জন দিতে চাইছে নিমাইয়ের কাছে। আজ যেন তিনি রিক্ত, শূন্য। একান্ত অনুরক্ত তার। অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠে সনাতনের হৃদয়।

তিনি তাকাতে পারেন না বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে। সে হতভাগী বুঝি, না জানি কত ব্যথা পেয়েছে তার এতটুকু বুকে। এ নিদারুণ ব্যথা সে কি পারবে সহ্য করতে। পারবে নিজেকে সামলিয়ে নিতে। নিথর হয়ে গেছে সে। ধিক্কারে হয়ত ভরে গেছে অভাগীর জীবন।

সনাতন আর ভাবতে পারছেন না। তাইত কাঁদছেন। বিলাপ করছেন দিন-রাত।

মহামায়া বুঝতে পারেন স্বামীর হৃদয় বেদনা। ধীর স্থির তিনি। তবুও হৃদয় তাঁর হয়ে উঠে উদ্বেল। যত দুঃখই তিনি পান না কেন, স্বামীকে যে তার শান্ত করতেই হবে। তা না হলে কিসের প্রকৃতি তিনি। জামতা করে যাকে ঘরে আনতে চাইছেন, তিনি যে—

"স্বতন্ত্র পুরুষ সেই সভার ঈশ্বর।
ব্রহ্মা-রুদ্র-ইন্দ্র আদি যাহার কিঙ্কর॥
সে জন কেমনে হইব তোমার জামতা।
শান্ত কর মন—স্মর কৃষ্ণের বারতা॥ —চৈ· ম· লোচন।

মহামায়ার কথা শুনে সনাতন যেন অনেকখানি স্থির করল নিজেকে। খুলে গেল তাঁর দিব্য দৃষ্টি। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল গৌরসুন্দরের স্নিগ্ধ মূর্তি। শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করে শান্ত করতে চাইলেন নিজেকে।

কিন্তু তিনি যে মায়াবদ্ধ জীব। সংসারের মায়া কাটাবেন কেমন করে। পরক্ষণে শিশুর মত কেঁদে উঠলেন হাহাকার করে। লুটিয়ে পড়লেন ভূমি-তলে। বিলাপ করতে লাগলেন পাগলের মত—

'হাহা গোরাচান্দ বলি ভুমেতে পড়িলা।
গৌরাঙ্গ সম্বন্ধ সুখ ধন হারাইলা॥
ফুৎকার করিয়া কান্দে বলে হরি হরি।
তোমারে না পাইলে বিশ্বম্ভর আমি মরি॥' —চৈ· ম· লোচন।

কান্নার অশ্রুতে বুঝি স্নাত হয় সনাতনের হৃদয়। কাঁদতে কাঁদতে অনেকটা হাল্কা মনে করেন নিজেকে। তিনি যেন আর কাঁদতে পারছেন না। দুর্বল নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মানুষ তিনি। হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয় শ্যামসুন্দরের রূপমাধুর্য। রুক্মিণীসুন্দরকে মনে মনে স্মরণ করে দীক্ষা নেন এক নতুন কান্নার। অন্তর্নিসিক্ত অশ্রুর অর্ঘ্য দিয়ে নিবেদন করেন গৌরসুন্দরকে—

'জয় পাণ্ডবের পরিত্রাণ বিশ্বম্ভরে।
রাখিলে ভীষ্মক বাঞ্ছা বিদর্ভ নগরে॥
জয় রুক্মিণীর বাঞ্ছা রক্ষক মুরারি।
আনিলেন অকুমারী যতেক সুন্দরী॥
তা সভারে করিল বিভা জানি তার মর্ম।
মোর কন্যা বিভা কর পালি সত্য ধর্ম॥' —চৈ· ম· লোচন।

দির্জন গৃহ-প্রকোষ্ঠে বিষ্ণুপ্রিয়া যেন বন্দিনী। একাকিনী শায়িত শয্যায়। তার হৃদয় ব্যথা অবর্ণনীয়। গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ সে সহ্য করবে কেমন করে। সে যে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে তারই শ্রীরাঙা চরণে। উন্মুখ হয়ে আছে দর্শনের আশায়। এ পোড়া কপালে বিধি তার কি লেখা রেখেছেন লিখে। কপাল চিরে বড় ইচ্ছে করে দেখতে। কাকে সে কি বলবে। কাকেই বা জানাবে মনের এ দুঃসহ ব্যথা। কেইবা বুঝবে।

আকুল আবেগে মনে মনে স্মরণ করে বাসুদেবকে। এ ঘোর বিপদে তাকেই জানায় মনের আকুতি। সে কি দিতে পারবে না এ অকথিত বেয়াধির নিদান।

'কহ সখি জীবন উপায়।
ছাড়ি গেল গোরা নটরায়॥
ভাবি ভাবি তনু ভেল ক্ষীণ।
বিচ্ছেদে বাচিব কতদিন॥
নিরমল গৌরাঙ্গ বদন।
কোথা গেলে পাব দরশন॥
কি বিধি লিখিল মোর ভালে।
চিরি দেখি কি আছে কপালে॥
হিয়া জরজর অনুরাগে।
এ দুখ কহিব কার আগে॥
কহ বাসু ঘোষ নিদান।
গোরা বিনা না রহে পরাণ॥'

গোরা অনুরাগে বঞ্চিত বিষ্ণুপ্রিয়ার বরতনু হয়ে পড়ে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর। কোন কিছু রুচে না মুখে। ইচ্ছে হয় না আহারে। দৃষ্টি অপলক। ভাল লাগে না কোন কিছু। মমতায় বিগলিত প্রিয়া। সে যে বসে আছে প্রাণমন নিবেদন করে। সে তার হৃদয় যৌবন দিয়ে বাঁধতে চায় যুবক নিমাইকে।

সহসা ডুকরে কেঁদে ওঠে প্রিয়া। তার নিভৃত মনের গোপন কথাটি আর কেউ না বুঝুক, অন্ততঃ মনের মানুষ বুঝবে। মনে মনে অভিমানে ফেটে পড়ে অনুনয় করে বলে— 'ওগো, তুমি ত বোঝ, প্রিয়ার মনের দহন কত দুঃসহ। আমি যে, তোমাকেই আমার সব কিছু সমর্পণ করে নিঃস্ব হয়ে বসে রয়েছি গো। তুমি কি আমি অবলা বলে ঠেলে দেবে পায়ে। ওগো, মিনতি করে বলছি তুমি এত নিঠুর হয়ো না গো। অত বড় দাগা দিয়ো না আমাকে।'

সহসা প্রিয়ার কর্ণে ভেসে আসে পথ-ভিখেরীর কণ্ঠস্বর। সে যেন প্রিয়ার মনের গোপন কথাটিই ব্যক্ত করছে, গাইছে একতারা বাজিয়ে—

'না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিৎ তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥' —চণ্ডীদাস

ঐ গানের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া কেমন যেন খুঁজে পায় আত্মনির্ভরতা। সে ত তার মনের সবটুকু ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে বসে আছে তারি প্রতীক্ষায়।

নিমাই ছাড়া আর কিছু জানে না সে। দ্বিতীয় আর কাউকে ভাবেনি জীবনে। এখন সে যদি নিঠুর হয়, যদি সে প্রত্যাখ্যান করে, করুক। আমাকে ব্যথা দিয়ে সে যদি আনন্দ পায়, পাক। আমি তার আনন্দের সরোবরে ফুটে উঠব ব্যথার কুসুম হয়ে। তাকে বলব, আমি ত সব সমর্পণ করে তাকিয়ে আছি তোমার মুখের পানে। এখন—

'তুমি যদি মোরে প্রভু নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥'—দ্বিজ চণ্ডীদাস।

বিষ্ণুপ্রিয়া একাকী বসে বসে এমনি ভাবছিল কত কি। কোনদিকে কোন কিছু খেয়াল ছিল না তার। সে যেন নিজের মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। ছিল না সজীব সত্তা।

এতক্ষণ কেউ তাকে খুঁজেনি। দুঃখে নিমজ্জিত। কাঞ্চনাও কি জানি কেন চলছে যেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে এড়িয়ে। সে বোধ করি এ দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা পায়নি খুঁজে। কিংবা হয়ত সেও কোন নির্জনে সখির দুঃখে একাকিনী অভাগিনী মরছে ঝুরে।

শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছে বিধুমুখী হেথায় হোথায়। এ ঘর সে ঘর। অবশেষে দেখল কোণের ঘরের দরজাটা খোলা। ধীরে ধীরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে—এ ঘরেইত রয়েছে প্রিয়া।

নিস্তি করে পিছন থেকে গিয়ে ডাকলে—'মা, বিষ্ণুপ্রিয়া!'

নিথর। নির্বিকার। মুখে নেই কোন প্রত্যুত্তর।

বিধুমুখী বিস্মিত হয়ে এগিয়ে গেলেন আরো কাছে। কোমল করে বললেন--

'মাগো, কি হয়েছে তোমার? অমন করে বসে আছ কেন?'

'কই, কিছু হয়নি ত। তুমি আমায় ডাকছ?' মাথা নেড়ে বললে প্রিয়া।

'তবে অমন চুপটি করে বসে আছ কেন? কেউ কিছু বলেছে?'

'না তো।'

সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনে কেমন যেন সন্দেহ হল বিধুমুখীর। তিনি দ্রুত চলে

এলেন মহামায়ার কাছে। মনটা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে তার। প্রিয়াকে যে বিধুমুখী তার ছেলে মাধবের চেয়েও স্নেহ করেন। সদাহাস্যময়ী আনন্দ চাঞ্চল্য যে প্রিয়া, সে আজ এমন নীরব কেন। কেন নেই তার মুখে হাসি? একটু অভিমান ভরেই তিনি নিয়ে মহামায়াকে বললেন—"দিদি, তুমি নিশ্চয়ই প্রিয়াকে কিছু বলেছ?'

মহামায়া যেন একটু মিথ্যে করেই বললেন—'হ্যাঁ, সকালে একটু বলেছিলাম। বড্ড অভিমানী মেয়ে। যা, ওকে ডেকে নিয়ে আয়।'

—'তাই বলো। আমি ভেবে সারা হচ্ছি। খুঁজছি চতুর্দিকে। আমিও তাই বলে দিদি, আজকাল তোমার মাথার ঠিক থাকে সব সময়। অত বড় মেয়ে তাকে কি অমন করে বকতে হয়।'

বিধুমুখী মহামায়ার কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে ডাকতে চলে গেলেন প্রিয়াকে। গিয়ে দেখলেন, দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে, একি, এতো রাগ নয়, অভিমানও নয়। এযে অনুরাগ। প্রিয়ার মুখমণ্ডল রঞ্জিত হয়ে উঠেছে অনুরাগে। কি যেন শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। কখনো হাসছে নিস্তব্ধে। . আবার কখনো বা কাদছে। কখনো বা হয়ে পড়ছে আনন্দে আত্মহারা।

একটু আগেই ত তিনি দেখে গিয়েছিলেন, মুখখানা তার বেদনায় যেন বিবর্ণ হয়ে আছে। যেন বসে আছে একান্ত অভিমানে। এখন এসে এ আবার কি দেখছেন। যেন শরতের মেঘমুক্ত আকাশ। কোথাও মালিন্যের বিন্দুমাত্র নেই ছোঁয়া। প্রিয়ার মনে যেন নেই অভিমানের লেশমাত্র অবশেষ। যেন পরম পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠেছে তার অন্তর।

এ অবস্থায় দেখে বড় ভাল লাগল বিধুমুখীর। তিনি এগিয়ে গেলেন প্রিয়ার কাছে। হাতখানা আদর করে ধরে ডাকলেন—'চল, দিদি ডাকছেন।'

যেন দুশ্চর সুকঠিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে প্রিয়া। প্রিয়া, পার্বতীর মত তপসিদ্ধা সে। এতদিনের সাধনা যেন সার্থক হয়েছে তার। দুঃখের তিমির রাত্রি বিদীর্ণ করে চলেছে সে আলোর উৎসে। একটা সুখের সান্ত্বনা ফুটে উঠেছে তার মুখমণ্ডলে।

শীতস্নাত প্রস্ফুটিত পদ্মের মত মুখ তুলে তাকালো সে বিধুমুখীর পানে। মুখে মাথা তার লাবণ্যের ললিত মাধুরিমা। অধরে স্মিত হাসির রেখা।

বিধুমুখী আর পারলেন না নিজেকে ধরে রাখতে। উদ্বেল হয়ে উঠল তাঁর মাতৃস্নেহ। তিনি যেন বুঝতে পারলেন প্রিয়াকে। বুঝতে পারলেন

কেন প্রিয়ার এই ভাবান্তর। তাই মাতৃহৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ থেকে উৎসারিত হলো কন্যা স্নেহের আকুতি।

আকুল হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে টেনে নিলেন বুকে। বিষ্ণুপ্রিয়া মুখ লুকালো বিধুমুখীর স্নেহমাখা বক্ষে। পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠল প্রিয়ার অন্তর। বিধুমুখী পরম স্নেহে হাত বুলোতে লাগলেন প্রিয়ার মাথায়। থেকে থেকে প্রিয়া ক্ষণে ক্ষণে উঠতে লাগল শিউরে শিউরে। আলিঙ্গনে গাঢ় করে প্রিয়াকে ধরে রাখলেন বিধুমুখী।

॥ চৌদ্দ ॥

নিমাই চলছিল হাসতে হাসতে। সহসা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। গণকের কথাটাকে নিছক ব্যঙ্গ মনে করে হেসে উঠেছিল সে। হয়ত কৌতুক করেই বলেছে। অমন ত আজকাল কতলোকেই করে। লক্ষ্মী মারা যাওয়ার পর অনেকেই তাকে বিয়ের কথা বলে—মন বুঝতে চায়। জানতে চায়, আবার বিয়েতে আমার মত আছে কিনা।

নিমাই কিন্তু কারো কথায় আমল দেয় না। তার যেন সংসারের প্রতি আর কোন আসক্তিই নেই। মনে হয়, এসব মরীচিকার মায়া। তাই মিথ্যে মায়ায় আর মিছেমিছি জড়াতে চায় না।

লক্ষ্মীপ্রিয়াকে সে ত প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছিল। তার ভালবাসায় কোন ফাঁকি ত ছিল না। লক্ষ্মী তাকে ভালবাসত হৃদয় দিয়ে। কই সে ভালবাসা রইল কোথায়। লক্ষ্মী ত ভালবাসার সব বাঁধন ছিঁড়ে চলে গেল।

ভাবতে ভাবতে নিমাইয়ের হৃদয়টা কেমন যেন হু হু করে উঠল। যত চেষ্টা করে, ওর কথা আর ভাববে না। ভাবলে ত শুধু দুঃখে ভারাক্রান্ত হবে হৃদয়। কিন্তু ভুলতে চাইলে যে ভোলা যায় না। বার বার স্মৃতিপথে ভেসে ওঠে লক্ষ্মীর মুখ। যেন মনে হয় সে আছে। গৃহে গেলেই ঘোমটার ভিতর থেকে মৃদু হেসে ধরে নেবে ওর পুঁথির দপ্তর। উত্তরীয় খুলে বাতাস করবে পাখা দিয়ে। হেসে মিষ্টি করে বলবে—

'যাও, এবার ঘাম জুড়িয়ে গেছে। চটপট্ নেয়ে এসো গঙ্গায়। আমি তোমার স্নানে যাওয়ার জন্য গামছা আর ঘটি আনছি।'

লক্ষ্মীর কথাগুলো আজো যেন বাজছে ওর কানের কাছে। যখনি মনে হয়, নিমাই যেন ভেঙ্গে পড়ে কান্নায়। তখনি ও হাসি দিয়ে ঢেকে রাখতে চায় মনের গোপন ব্যথাকে। অনেক সময় ও নিজেকে নিজে লুকোতে চেষ্টা করে।

যখন তাও পারে না, চলে আসে গঙ্গার ঘাটে। বটের স্নিগ্ধ ছায়ায় বটের ঝুরিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। জুড়োতে চায় ছায়ায় নিজের হৃদয়কে। ভুলে যেতে চায় লক্ষ্মীর স্মৃতি। কিন্তু নির্জনে লক্ষ্মী যেন ওর মনের কাছটিতে এসে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। ওর চোখের সামনে যেন ঘোরাফেরা করে। তখন আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে লক্ষ্মীর স্মৃতি।

এমনি ভাবতে ভাবতে ও কখন পৌঁছে গেছে গঙ্গার ঘাটে বুঝতে পারে না নিজেই। পুঁথির দপ্তরটা ঘাটে রেখে তাড়াতাড়ি স্নান করে উঠে পড়ে। বেলা অনেক হয়েছে। যতক্ষণ নিমাই না খাচ্ছে কিছুতেই খাবেন না তিনি।

মায়ের কথা ভেবেই নিমাই হেঁটে চলেছে দ্রুত। গৃহে এসে সদর থেকেই হাঁক দিলে—'মা, কইগো। আমি চান সেরেই এসেছি। তুমি ভাত বেড়ে ফেলো। ছেলের ডাক শুনেই বেরিয়ে এলেন শচীমাতা। নিমাইয়ের হাত থেকে পুঁথির দপ্তরটা নিতে বললেন—'তা এত দেরী করে এলি কেন? এমন করলে শরীর সইবে?

'ও তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। আমার কথা বলছ, তোমার নিজের শরীরটা কি হচ্ছে তা কি দেখেছ?'

শচীদেবী কোন জবাব দিলেন না। চলে গেলেন ঘরের ভিতরে।

খেতে বসেছে নিমাই। শচীদেবী সামনেই বসে রয়েছেন। কি যেন বলতে চান তিনি। কয়েকদিন ধরে নিজের সঙ্গে নিজেই প্রবল সংগ্রাম করছেন যেন। বলি বলি করে কিছুতেই পারছেন না বলতে। যখনি মুখের দিকে তাকান, কেমন যেন ভয় ভয় করে। বলতে পারেন না কিছুতেই।

অথচ এবার ত না বললে নয়। সব কথাই যে পাকাপাকি হয়ে গেছে। কিন্তু শচীমাতা বলতে পারছেন না কিছুতেই। ভীষণ ভয় করছে তাঁর। এক বার ভেবেছিলেন মালিনী সইকে ডেকে তাকে দিয়েই বলবেন। কিন্তু তাতেও ভরসা পাচ্ছেন না। যদি হিতে বিপরীত হয়।

মনে মনে নিজেকে শক্ত করে রেখেছেন। আজকে যেমন করে হোক তিনি বলবেন নিমাইকে। কিন্তু নিমাই যেভাবে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে, একবরাও ও মুখ তুলছে না। কি জানি মনের অবস্থা কেমন আছে। কিছু বললে যদি আবার খাওয়া ছেড়ে উঠে যায়।

সত্যি সত্যি উঠে পড়ল নিমাই। পাতে প্রায় সবই পড়ে রয়েছে। অনুরোধ করে বললেন—'কিরে, খেলি কই। সব যে পড়ে রইল?'

'আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন যাও, তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাওগে। বেলা একেবারে পড়ে গেল।' জলের ঘটিটা নিয়ে মুখ ধুতে নিমাই বেরিয়ে গেল।

শচীদেবী আর একটি কথাও বলতে পারলেন না। নির্বাক হয়ে ঠায় রইলেন বসে। নিমাই মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করতে গেল ঘরে।

যাই হোক দু'এক গ্রাস মুখে তুলে শচীদেবী উঠে পড়লেন।

একটু পরেই ঘটক কাশীনাথ এসে হাজির। দুপুরে বিশ্রাম করেন নি

শচীদেবী। বসেছিলেন বাইরের উঠনে। তাই কাশীনাথকে দেখে এলেন এগিয়ে।

কাশীনাথের মুখ গম্ভীর ও বিষাদাচ্ছন্ন। দেখেই মুখ শুকিয়ে গেল শচীদেবীর।

কাশীনাথ বললে—'আপনি কি মা, বিশ্বম্ভরকে বিয়ের কথা কিছু বলেন নি ?'

—'না বাবা। বলি বলি করেও বলতে পারছি না।' অপরাধীর মত বললেন শচীদেবী।

—'এদিকে কি সর্বনাশ হয়েছে জানেন। সনাতনের বাড়ীতে পড়ে গেছে কান্নার রোল। সারা বাড়ী নিজ্জিত হয়েছে শোক সাগরে।'

শংকিত হয়ে শচীদেবী বললেন—'কেন, কি হয়েছে ওদের ?'

'কি আর হতে বাকি আছে। নিমাই বলেছে, বিয়ে সে করবে না।'

'নিমাই বলেছে, কার কাছে ?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন শচীদেবী।

'গণক ঠাকুর যাচ্ছিলেন, বিয়ের লগ্ন ঠিক করতে সনাতন মিশ্রের বাড়ী। নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল পথে। জিগগেস করতে তাকেই বলেছে নিমাই।'

কোন উত্তর দিতে পারলেন না শচীদেবী। যেন মুহূর্তে পাষাণ হয়ে গেলেন তিনি। তখন কাশীনাথকে কি উত্তর দেবেন। যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল শচীদেবীর মাথায়। লজ্জায় আর অপমানে দগ্ধ হতে লাগলেন মনে মনে।

নিমাই যদি গণক ঠাকুরকে সত্যি একথা বলে থাকে, তাহলে ত নিমাইয়ের মত নেই। তখন তিনিই বা কেমন করে বলবেন নিমাইকে।

শচীমাতার অবস্থা দেখে কাশীনাথ বললেন—'নিমাই যে একেবারে বিয়ে করবে না, এমন কথা ঠিক বলেনি। বলেছে, তার বিয়ে, কই এ কথা ত সে জানে না।'

শচীদেবী এবারে যেন অকূলে কুল পেলেন। বললেন—'তাই বলো। সত্যিই ত, বিয়ের কথা সে জানেই না। তাকে ত বলা হয়নি। তা বাবা, তুমি ও জন্য কিছু চিন্তা করো না। আমি তাকে আজই বলব। আমার বিশ্বাস, তার মায়ের কথা সে ঠেলতে পারবে না। তুমি ওঁদের গিয়ে শান্ত কর। আমি তোমার কাছে কালকেই খবর পাঠাচ্ছি।'

কাশীনাথ বললেন—"দেখো মা, এ বিয়ে না হলে সনাতনের ভীষণ ক্ষতি হবে। সব কিছু প্রস্তুত তার। তাছাড়া আয়োজনটা বড় কথা নয়। রাজ-

পণ্ডিত সে। সারা নদীয়াতে তাঁর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। নদীয়ার সমাজে মুখ দেখতে পারবে না সে। আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব—সকলেই জেনে গেছে ব্যাপারটা। এখন নিমাই বিয়ে না করলে অপমানের আত্মগ্লানিতে প্রাণ ত্যাগ করবে সনাতন। অন্ততঃ একথাটা চিন্তা করে দেখবেন আপনি। আমি এখন আসছি।'

শচীমাতাকে প্রণাম করলো। তারপর কাশীনাথ যেন মুহ্যমান অবস্থায় আনত মস্তকে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

কাশীনাথকে আশ্বাস দিলেন বটে শচীরানী, কিন্তু এখন তিনি কি করবেন। যদি নিমাই তার মুখের উপরেই 'না' বলে দেয়। তাহলে কোথায় যাবেন তিনি। এত চেষ্টা, এতো আয়োজন, সবই যে ব্যর্থ হবে। কলংক রটাবে সনাতনের। হয়ত বিষ্ণুপ্রিয়াকে আর কেউ বিয়েই করতে চাইবে না। মান-মর্যদা বলে কিছু থাকবে না সনাতনের।

এমনি ভাবতে ভাবতে শচীদেবী যেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

নিমাই ঘরে বিশ্রাম করলেও ঘুম তার আসেনি। শুয়ে শুয়ে শুনেছে সে কাশীনাথের কথা। গণক ঠাকুর তাহলে মিছে কৌতুক করেনি তার সঙ্গে। মায়ের চেষ্টাতেই হয়েছে এ সম্বন্ধ। কিন্তু এখন কি করবে সে। একদিকে মা, আর একদিকে সনাতন। এদিকে লক্ষ্মীর স্মৃতি নিমাই যে ভুলতে পারছে না কিছুতেই।

সহসা সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল নিমাই। টোলে যাওয়ার সময় হয়েছে তার। পুঁথির দপ্তর নিয়ে বেরিয়ে পড়ল টোলে। কাঁধে ফেলিয়ে দিল উড়ানিটা।

বাইরে বেরিয়ে এসে প্রণাম করল মাকে। বললে—'মা, আমি চললাম টোলে। তুমি পারলে রান্নাবান্না করে রেখো।'

হনহন করে দ্রুত পদে চলে গেল নিমাই। শচীদেবী তাকিয়ে রইলেন পুত্রের গমন পথের দিকে। তাঁর আর বলা হলো না। বলতে অবসর দিল না নিমাই।

বাক্য হারা। বুদ্ধি হারা। শচীদেবী নির্বাক, নিঃস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন ঠায়।

সন্ধ্যে হয় হয়। নিমাই পণ্ডিত ফিরছে টোল থেকে। পথে পেয়ে গেলো এক অন্তরঙ্গ বয়স্যকে। সঙ্গে করে চললো গঙ্গার তীরে। খুঁজে নিল একটা নির্জন স্থান। বসল পাশাপাশি দুজনে।

প্রিয় বয়স্যের সঙ্গে চললো অন্তরঙ্গ কথা। হাস্য কৌতুক নয়। অতীতের স্মৃতিমন্থন। নিমাই যেন আজ অন্তরের সকল অর্গল উন্মুক্ত করে দিল বয়স্যের কাছে। গোপন রাখল না কোন কিছু।

দাদার সন্ন্যাস গ্রহণ। সেই দুঃখে পিতার অন্তর্ধান। বড় বেজে ছিল কিশোর নিমাইয়ের বুকে। পিতাকে বালো হারানোর ব্যথা সে ভুলতে পারেনি কিছুতেই। মাকে শুধু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বাইরে হাসিখুশিতে মেতে আছে সে। কিন্তু অন্তর খাঁ-খা করছে। এসব ভুলে থাকতে চাইছিল সে। তাইত ঘরে এনেছিল লক্ষ্মীপ্রিয়াকে। ভালবেসেই এনেছিল তাকে। বসিয়ে ছিল হৃদয়ের সর্বোচ্চ সিংহাসনে। কিন্তু সে সিংহাসন শূন্য করে, তাকে সর্বরিক্ত করে চলে গেল অকালে।

এই ত সংসারের পরিণতি। এই ত ভালবাসার প্রতিদান। ঘর আর ভাল লাগে না নিমাইয়ের। সে চায় না আর ঘর বাঁধতে। কিন্তু মা, তার কথা ভুলতে পারে না নিমাই। বড় দুঃখ হয় মায়ের জন্য তার। অভাগী জীবনে কি পেলো। কি পেয়েছে শচীদেবী। দুঃখের সায়রে কান্না দিয়েই যেন জীবন তার। কান্না ছাড়া কিইবা আছে তার সম্বল।

'তাহলে ভাই মাকে আর কাঁদাস নে। পূর্ণ কর তাঁর ইচ্ছে।' বয়স্য যেন কতকটা মিনতি করেই বললে নিমাইকে।

'আমি ত সেই কথাই ভাবছি ভাই। মা যখন চাইছেন, কথা যখন তাঁদের দিয়েছেন, এ বিয়ে আমি করব। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাদ সাধব না। শুধু তোকে যেতে হবে সনাতন মিশ্রের বাড়ী। আমিই পাঠিয়েছি তোকে। একথা বলিস ওঁদের। তাই—

'কোন কথাচ্ছলে যাহ পণ্ডিতের ঘর।
আমি নাহি জানি-হেন কহিও উত্তর॥'—চৈ. ম. লোচন।

॥ পনের ॥

পরদিন বয়সা হাজির হলো সনাতনের বাড়ীতে।

সারাটা বাড়ীতে বিরাজ করছে একটা জমাট নিস্তব্ধতা। সবাই আছে। তবু যেন একটা নিরানন্দ, একটা বিষাদমগ্নতা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে সারাটা বাড়ী।

বয়সা বসে পড়লে দাওয়ার জলচৌকিটাতেই। কে একজন ওপাশে যেন বসেছিল চুপচাপ। হাতের ইশারায় ডাকলে তাকে বয়সা।

কাছে আসতেই বললে—'ভিতরে সংবাদ দাও বলো, আমি আসছি নিমাই পণ্ডিতের কাছ থেকে'

একবার ভাল করে ওর মুখটা দেখে লোকটা চলে গেল অন্দর মহলে।

কয়েক মুহূর্ত পরে সনাতন নিজেই বেরিয়ে এলেন। বয়সা সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে সনাতনকে বললে—'আমাকে পাঠিয়েছে নিমাই পণ্ডিত।'

'কেন, কি খবর ?' জিগ্গেস করলেন সনাতন।

'বলে পাঠিয়েছে বিয়ের আয়োজন করতে।'

'সত্যি ?' সবিস্ময়ে জিগ্গেস করলেন সনাতন। 'তবে যে কালকে···'

'কালকে যা শুনেছিলেন তা ঠিক নয়। কৌতুক করেই বলেছিল নিমাই। তখনো সব জানতো না নিমাই। তার মাতাই ত ঠিক করছে সম্বন্ধ—তিনি তখনো জানাননি নিমাইকে।'

'তা এখন বুঝি জানিয়েছেন ?' আগ্রহভরে প্রশ্ন করেন সনাতন।

'হ্যাঁ, কাল বিকেলেই শুনেছে নিমাই।'

'কিন্তু তার নিজেরও ত একটা মত আছে ?' একটা ঢোক গিলে বললেন সনাতন।

'নানা, তার নিজের আবার কি মত থাকবে। মায়ের মতেই তার মত। তাছাড়া—

"মায়ে যে বলিল তাহে কি আছয়ে কথা।
তাহার উপরে আর কে করে অন্যথা॥'

নিমাই বড় মাতৃভক্ত। মা যা স্থির করেছেন, নিমাই তাকেই মেনে নেবে নত মস্তকে! সানন্দেই মাতৃ আজ্ঞা পালন করবে সে।

তাছাড়া কালকে গণক ঠাকুরের কথায় আপনারা দুঃখ পেয়েছেন শুনে, নিমাই বড় ব্যথিত হয়েছে। সে ত এতসব জানত না আগে, তাই মনে করেছিল, গণক ঠাকুর বুঝি কৌতুক করছেন তার সঙ্গে। এজন্য নিমাই মনে মনে বড় অনুতপ্ত। আমি ত তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার কাছেই এসব খুলে বলেছে। তারপর আপনার কাছে আমাকে সে পাঠিয়েছে নিজে। অতএব আপনি—

'মিছা কার্যক্ষতি—মিছা দুঃখ ভাব চিতে।
করহ বিভার কার্য—যে হয় উচিতে॥' —চৈ. ম. লোচন।

অন্তরাল থেকে সবই শুনছিলেন মহামায়া। শুনে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল তাঁর অন্তর। তিনি শুনছেন, নিমাইয়ের বন্ধু বলছে—

'কোন দুঃখ করবেন না। যা হয়েছে ভুল বোঝাবুঝির ফলেই হয়েছে। এখন আবার আপনি গণক ডাকুন। স্থির করুন বিয়ের দিন ক্ষণ।'

ভিতর থেকে উলু ধ্বনি দিয়ে উঠল মেয়েরা।

আনন্দ কোলাহলে আবার পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মিশ্র ভবন। সনাতন সব দুঃখ, সব গ্লানি, সব বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলে নবোদ্যমে লেগে গেলেন আয়োজনে।

গণক ঠাকুর এলেন। স্থির হলো বিয়ের দিনক্ষণ আর লগ্ন।

'চার্চিয়া করিল দিন সময় বিচিত্র।
শুভকাল শুভলগ্ন তিথি সুনক্ষত্র॥'

দিকে দিকে যেন বান ডাকল আনন্দের। খুশিতে ঝলমল করে উঠল সনাতনের সংসার। চারিদিকে পড়ে গেল কর্মব্যস্ততার কোলাহল। শুভ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

নিমাই নিজেই তার বন্ধুকে পাঠিয়ে সম্মতি জানিয়েছে এক রকম সে নিজেই স্থির করে দিয়েছে বিয়ের দিন। অতএব বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ আর কোথায়। যেন মুখর হয়ে উঠল নদীয়া নগর।

সকলেই বলাবলি করতে আরম্ভ করল, এ কি যে সে বিয়ে, নিমাই পণ্ডিতের বিয়ে। রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে। নিমাই ত এখন নদীয়ার রাজা। সে হারিয়েছে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে। নাম রেখেছে নবদ্বীপের। আজ তার গর্বে গর্বিত সারাটা নদীয়া।

ধনী ব্রাহ্মণ মুকুন্দ সঞ্জয়। বন্ধু নিমাইয়ের। ওদের চণ্ডীমণ্ডপেই ত টোল খুলেছে নিমাই। বিয়ের কথা শুনে ওরা নেচে উঠলো আনন্দে। নিজেরাই এগিয়ে এসে বললে—'নিমাই-এর বিয়ের ভার আমরাই বহন করব।

এ সামান্য অধিকারটুকু বন্ধু তুমি আমাকে কি দেবে না ? আমি আমার মনের মত করে দেব তোমার বিয়ে।'

বুদ্ধিমন্ত খান। তিনি ত নদীয়ার এক অংশের রাজা সাগ্রহে এগিয়ে এলেন শচীমাতার কাছে। বললেন—'এ বিয়েতে যত ব্যয় হবে, সব ভার আমার। এটুকু অনুমতি আপনাকে দিতেই হবে।'

মুকুন্দ সঞ্জয় মাথা নেড়ে বললেন—'তাহলে আমাদের কি কিছু অধিকার নেই ?'

ততক্ষণ নিমাইয়ের ছাত্ররা বসে বসে দেখছিল রঙ্গটা। তারা বললে—'আপনারা যদি এই কথা বলেন, তাহলে আমাদের অধিকার ত সর্বাগ্রে। বিয়ে আমাদের গুরুদেবের। শিষ্য আমরা। অতএব এ বিয়েতে যাই খরচ পড়ুক না কেন, সব দেব আমরা সকলে মিলে'

বুদ্ধিমন্ত খান দেখলেন, বিষয়টা ক্রমে বড় ঘোরাল হয়ে উঠছে। এ যে দেখছি সবাই দিতে চায়। তাই তিনি আস্ফালন করে সকলে শুনিয়ে রাজোচিত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—

'বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্বভাই।
বামনিয়া মত কিছু এ বিবাহে নাহিঞ॥
এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন॥' —চৈ. ভা

'তোমরা কি মনে করেছ এটা সাধারণ বামুনের বিয়ে অল্পেতেই সেরেসুরে দেবে। তা হচ্ছে না, হতে পারে না। এ বিয়ে হবে রাজপুত্রের বিয়ের মতই। নিমাই সাধারণ টুলো পণ্ডিত নয়। ও যে নদীয়ার রাজার রাজা। সকল ধনীর সেরা ধনী। ও যে ধনের ধনী, সে ধন নদীয়ার কারো ঘরে নেই।'

অতএব বিয়েটাও হবে ঠিক তেমনি। রাজপুত্রের বিয়ের চেয়েও আরো বড় করে। লোকে দেখে যেন মনে করে হাঁ, নবদ্বীপে এমন বিয়ে আর কখনো হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না।'

'তা বেশ তো, তাই হোক। এতে আর আমাদের আপত্তি কোথায় ! আমরাও যোগ দেব আপনার সঙ্গে যেমন পারি তাই দেবো সকলে মিলে খরচ করব আমরা এ বিয়েতে।'

বুদ্ধিমন্ত খান রাজী হলেন সানন্দে বললেন—"তা বেশ, বেশ। ভাল কথা। আপনারা সকলেই আসুন এই আনন্দ যজ্ঞে। ও, বড় ছোট, দীন-দরিদ্র —নেই কোন ভেদাভেদ। এই আনন্দের তীর্থক্ষেত্রে আমরা সকলেই আনন্দের অভিযাত্রী।'

সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। লেগে গেল সকলেই মহাসমারোহে উদ্যোগ আয়োজনে। দেখুক নদীয়াবাসী, জানুক বিয়ের জৌলুস আর উৎসব কাকে বলে।

এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া। তার কর্ণকুহরে এসব যেন কিছুই প্রবেশ করছে না। সে যে শুনছে প্রণব ধ্বনি। সে শুনেছে শ্যামসুন্দরের বাঁশী। তার কানের মধ্যে কই আর কিছু ত প্রবেশ করছে না যে শুনেছে একবার এই বাঁশীর শব্দ। তার কানে অন্য শব্দ আর খুঁজে পায় না প্রবেশের পথ। অবিচ্ছিন্ন এই অনাহত নাদ ধ্বনি হৃদয় মনকে ভরপুর করে রাখে। সর্বক্ষণ কানে ভরে থাকে বাঁশীর শব্দ।

তাই বিষ্ণুপ্রিয়া সকল কোলাহলের মধ্যে শুনছে সেই এক ধ্বনি। সেই এক নাম—শ্রীগৌরাঙ্গ।

তার ত কোন দিকে হুঁস নেই আজ যে সে বেহুঁস। তাইত শুনছেও শ্রীগৌরাঙ্গ, বলছেও শ্রীগৌরাঙ্গ। গৌর ছাড়া কথা নাই তার মুখে। মনেও নেই কোন ভাবনা চোখে নেই কোন স্বপ্ন। বুকের স্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে তার।

'গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন
এভব সংসারে এমন দয়াল
নাহি দেখি একজন॥'

শুভ দিনে শুভ ক্ষণে এলো অধিবাসের লগ্ন

হয়ে উঠলে সকলে আনন্দে উন্মত্ত শচীদেবীর গৃহের আঙিনায় বড় বড় সুচিত্রিত চাঁদোয়া হলো টাঙান। খুঁটির গোড়ায় গোড়ায় রোপিত হল কদলী বৃক্ষ। নিম্নে স্থাপিত হলো মঙ্গল ঘট আম্রসার আর কচি ডাবে সুসজ্জিত করে। আর—

'পূর্ণ ঘট দীপ ধান্য দধি আম্রসার।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য আছয়ে প্রচার॥'

এনে একত্রিত করা হলো সব। যথাযথ স্থানে স্থাপন করা হল বিধিসম্মত ভাবে। পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হলো মঙ্গল তোরণ। প্রজ্জ্বলিত হল সুগন্ধী তৈলে শত শত দীপ। ভূমিতল সমতল করে মার্জিত হল গোময় আর পেলব মৃত্তিকায়। তার উপরে প্রজাপতির বিধান অনুসারে অঙ্কিত হল সুদৃশ্য আলপনা। যেখানে যেমনটি প্রয়োজন। শিল্পকলার সে এক অপূর্ব নিদর্শন আঙিনার মধ্যস্থলে কারুকার্যময় শতরঞ্জে হলো সুশোভিত।

নিমন্ত্রিত হয়েছেন নবদ্বীপের তাবং ব্রাহ্মণ সমাজ। অধ্যাপক, ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, নৈয়ায়িক—বাদ পড়েননি কেউই। বিকেলে আসবেন তাঁরা। গ্রহণ করবেন অধিবাসের 'গুয়াপান।' তাই এত আয়োজন, এত সাজসজ্জা

উৎসব মুখরিত হয়ে উঠেছে শচীমাতার গৃহ। পরিপূর্ণ লোকজনে মেয়েরা প্রহরে প্রহরে শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত করে তুলছে আকাশ-বাতাস। প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে উলুধ্বনিতে গগন মণ্ডল

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ মণ্ডপ রচনা করে যথাযোগ্য উচ্চকণ্ঠে করছেন বেদমন্ত্র উচ্চারণ। ঘৃত প্রদীপের সুগন্ধে আমোদিত সভাস্থল।

এসে গেছে বাজানিয়ারা। অর্থাৎ বাজনদার। তারা বাজাতে লাগল নানা-বিধ বাদ্যযন্ত্র। কত বিচিত্র তাদের গঠন, নামের মধ্যেও ফুটে উঠেছে কতনা বৈশিষ্ট্য,

'শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল
দণ্ডিম মুহরি বাজে ডিণ্ডিম রসাল॥
বীণা বেণু কবিনাস ররাব উপাঙ্গ।
মিলিয়া বাজয় পাখোয়জ এক রঙ্গ॥

পড়াহ মৃদঙ্গ বাজে কাঁসা করতাল
শিঙ্গা বরগো বাজে সাহনী-মিশাল ॥'

আরো কত নানা বাদ্য যন্ত্র। বৃন্দাবন দাস আর লোচন দাস তাদের নামই জানেন না। বলেছেন—'নানাবিধ বাদ্য বাজে—নাম নাহি জানি।'

তবে হ্যাঁ, বুদ্ধিমন্ত খান তাক লাগিয়েছেন রাজপুত্রের বিয়েকেও। তুলনা হয় না এর।

দেখতে দেখতে অপরাহ্ণ হলো সমাগত। একে একে উপস্থিত হলেন ভাট গণ। গাইতে আরম্ভ করল 'গায়েনেতে আর ভাটে রায়বার।' বিপ্রগণ আরো উচ্চস্বরে করে উঠল বেদধ্বনি। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সজ্জনবৃন্দ মণ্ডলাকারে যথাযোগ্য স্থানে এসে উপবেশন করলেন। তারপর—

'তবে গন্ধ চন্দন তাম্বুল দিব্য মালা।
ব্রাহ্মণগণেরে সবে দিবারে লাগিলা ॥
শিরে মালা সর্ব অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে।
এক বাটা তাম্বুল সে দেন একজনে ॥'—চৈ ভা

নবদ্বীপে ত ব্রাহ্মণের শেষ নেই। ভরে উঠেছে অধিবাসের সভা। এক একজন ব্রাহ্মণ এক এক বাটা ভর্তি পান নিচ্ছে সম্মান স্বরূপ। রাখছেন না কেউ কারো জন্য। আবার আসছে বাটা বাটা পান সকলে ত আর সমান নয়। লোভী ব্রাহ্মণও এসেছে অনেকে। তারা একবার এক বাটা পান নিয়ে উঠে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। পায় না বলে গ্রহণ করছে আবার একটা পান।

নিমাই এসব কাণ্ড কারখানা দেখে হেসে আদেশ করলে—

'সবারে তাম্বুল মালা দেহ তিন বার।
চিন্তা নাই ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার ॥'

সে এক মহা মহোৎসব। মালা আর তাম্বুলে স্তপীকৃত হলো সারা সভা। 'তিন বার পাইয়া সবার হর্ষ মন। সাধ্য করি আর নাহি লয় অন্য জন ॥' এই ভাবে চললো বেশ কিছু ক্ষণ।

তারপর নিমাই এলো সভার মধ্যস্থলে। উপস্থিত অধিবাসের শুভলগ্ন। সভাস্থ ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে প্রণাম করে করলো আসন গ্রহণ।

শচীদেবী অধিবাসের মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি নিয়ে উপস্থিত হলেন সভাস্থলে। সঙ্গে এলো সারিবদ্ধভাবে এয়োস্ত্রীগণ। সকলের হাতে রেকাবে ভর্তি নানা মাঙ্গলিক দ্রব্য। বেজে উঠল নানাবিধ বাদ্য। মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল গগণমণ্ডল। তখন শচীদেবী এয়োস্ত্রীগণ সহ—

'তৈল হরিদ্রা আর সলাটে সিন্দুর।
খদি কদলক আর সন্দেশ তাম্বুল ॥
আনন্দে মঙ্গল গায় যত আইহগণ।
প্রভু অধিবাস করে যতেক ব্রাহ্মণ ॥' চৈ. ম. লোচন।

চারিদিকে ধূপ দীপ পতাকাতে হয়েছে শোভিত। স্বস্তিকবাচক মন্ত্র উচ্চারণ করে আরম্ভ করলেন ব্রাহ্মণগণ দেবপূজা। কুলবধূগণ দিল জয়ধ্বনি।

এমন সময় উপস্থিত হলো পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের প্রেরিত অধিবাস সামগ্রী। অতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পাঠিয়েছেন তিনি ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে। সঙ্গে এসেছে তাদের সাধবী ব্রাহ্মণীগণ। নিমাইয়ের শ্রীঅঙ্গ মার্জনের জন্য সনাতন পাঠিয়েছেন বিভিন্ন সামগ্রী।

যথাবিধি তারা নিমাইকে করাবে অধিবাস। প্রস্তুত হতে লাগল তার জন্য। এমন সময় নিজেই রাজপণ্ডিত সনাতন –

'......... আনন্দচিত্ত হৈয়া।
আইলেন অধিবাস সামগ্রী লইয়া ॥
বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি নিজ সঙ্গে।
বেদবিধি পূর্বক পরম হর্ষ মনে।
ঈশ্বরের গন্ধস্পর্শ কৈলা শুভক্ষণে ॥'—চৈ. ভা.

তখন চারিদিক থেকে জয় জয় শব্দে উঠল হরিধ্বনি। উচ্চারিত হলো স্তূতিবাণী। পতিব্রতাগণ ধন্য মনে করলেন নিজেদের। বাদ্যকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠল দিঙ্মণ্ডল।

সনাতন জামাই-এর অধিবাস সম্পূর্ণ করে ফিরে চললেন গৃহে। আজ তার মন ভরে উঠেছে এক অপূর্ব প্রশান্তিতে তিনি মনে করছেন আজ নিজেকে মহা সৌভাগ্যবান।

এদিকে নিমাইয়ের আত্মীয়বর্গ ও উপস্থিত হলেন সনাতনের বাড়ীতে। তাঁরা নিয়ে গিয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার অধিবাস সামগ্রী। শুভক্ষণে প্রিয়ারও হলো শুভ অধিবাস। বেদ-বিধিমত প্রতিটি অনুষ্ঠান হয়ে চললো নির্ভুল ভাবে অনুষ্ঠিত। বাদ পড়ল না কোন লোকচারও।

হয়ে উঠল সকলের মন উল্লসিত। বলাবলি করতে লাগল সকলে—'এমন অধিবাস 'নাহি করে কারো বাপে ॥' অধিবাস শেষে পান সুপারী যা ছড়াছড়ি হয়ে পড়ে রইল, তাতেই আরো পাঁচটি বিয়ে সুসম্পন্ন হতে পারত অনায়াসে।

শেষ হলো অধিবাস পর্ব।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠে নিমাই করলো গঙ্গাস্নান। পূজো করলো শ্রীবিষ্ণুকে। তারপর আত্মীয় বন্ধুবর্গের অনুমতি নিয়ে বসল নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করতে। অর্থাৎ স্বর্গীয় পিতৃপুরুষদের কাছে অনুমতি নিতে।

এদিকে বাদ্য নৃত্য গীত আর আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে চতুর্দিক। উচ্চারিত হচ্ছে মঙ্গলগীত। উড়ছে চারিদিকে নানাবর্ণের পতাকা। গৃহদ্বারে বিরাজ করছে মঙ্গলঘট।

ওদিকে শচীদেবী পতিব্রতাগণকে নিয়ে শেষ করলেন গঙ্গাপূজা। উপস্থিত হলেন বাদ্যভাণ্ড সহযোগে ষষ্ঠীতলায়। পরম ভক্তিভরে পূজো দিলেন ষষ্ঠী দেবীকে। তারপর দুয়ারে দুয়ারে জানিয়ে এলেন আমন্ত্রণ।

সকল এয়োস্ত্রীগণ সেজেগুজে উপস্থিত হলেন শচীদেবীর বাড়ীতে।

'ভরে খই কলা তৈল তাম্বুল সিন্দুরে।
দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে॥' চৈ. ভা.

কারো অসম্মান করতে চান না শচীদেবী। দেশাচার, লোকাচার, একে একে সবই চলেছেন পালন করে। কেউ না এলে ডেকে আনছেন তাঁদের। যার যা প্রাপ্য, বঞ্চিত করতে চান না কাউকে।

আজকে যে তার নিমাইয়ের বিয়ে। গরিব দুখি, কাউকে তিনি বিমুখ করবেন না। নিমাইয়ের মঙ্গলের জন্য সব কিছু করতে তিনি রাজী। তাই আনন্দ তাঁর আর আর ধরে না।

শেষ হলো নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ।

ব্রাহ্মণগণ বিশ্রাম করছেন। এমন সময় নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য আর নব বস্ত্র প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দান করল নিমাই। মহাপ্রীত হয়ে নিমাইকে আশীর্বাদ করে ফিরে গেল যে যার গৃহে।

বিয়ে গোধূলি লগ্নে।

সাজাতে বসল বয়স্যারা নিমাইকে।

তার আগেই এয়োরা স্নান করিয়ে দিয়েছে। হলুদ আর আমলকী দিয়ে মার্জনা করেছে সর্ব অঙ্গ। কিন্তু গৌরাঙ্গ দেহের কি আর মার্জনা করবে তারা। বরং নিজেরাই হয়েছে মার্জিত। নিরমল গোরা তনুর স্পর্শে নিজেরাই হয়েছে নির্মলীকৃত।

সুগন্ধী চন্দন মাখিয়ে দিল শ্রীঅঙ্গে। ললাটে অঙ্কিত করলো অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ফোটা চন্দন দিয়ে, মধ্যস্থলে মৃগমদ সৌরভের তিলক। নয়নে অঞ্জন,

শিরোপরি দেওয়া হলো সুন্দর মুকুট। বাহুতে রত্নবাজ, শ্রুতিমূলে সোনার কুন্ডল। গলায় সুগন্ধি মল্লিকার মালার সঙ্গে মতির মালা। সূক্ষ্ম পীতবস্ত্র পরিয়ে দেওয়া হলো ত্রিকচ্ছ করে। হাতে বেঁধে দেওয়া হলো ধান দূর্বা। আর 'ধরিতে দিলেন স্বর্ণ মার্জনী দর্পণ॥" শ্রীঅঙ্গে দেওয়া হলো পট্ট উড়ানী।

ব্রাহ্মণগণ করতে লাগল বেদ ধ্বনি। রায়বার পড়তে লাগল ভাটের দল।

প্রহর খানেক বেলা আছে, এমন সময় নির্ধারিত হলো শুভ যাত্রার ক্ষণ।

বুদ্ধিমন্ত খান দোলা সাজিয়ে উপস্থিত হলেন। সত্যি রাজকুমারের বিয়ের মতই আড়ম্বর করেছেন তিনি। জোগাড় করে এনেছেন নানাবিধ বাদ্যভান্ড। শঙ্খ, বংশী, করতাল, মৃদঙ্গ, মাদল—এসব ত এনেছেনই, সেই সঙ্গে আরো এনেছেন—পটহ, দগড়, শিঙ্গা, দুন্দুভি, ভেউর, কাহাল, দণ্ডিম। জয়ঢাক আর বীরঢাক বয়ে আনছে এক একটা চার, ছ'জন মিলে। এনেছেন নাচ-কাচের দল। নর্তক আর বিদূষক জমেছে অনেকেই। রঙ-বেরঙের দীপ জ্বলছে হাজার হাজার। নানা বর্ণের পতাকা নিয়েছে শিশুর দল প্রত্যেকে হাতে হাতে। আবার শত শত শিশু বাদ্য কোলাহলে ঢুকে পড়েছে ওদের দলে।

মাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে দোলায় উঠে বসল গৌরহরি। অমনি বেজে উঠল নানা বাদ্যযন্ত্র। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শোনা যেতে লাগল মেয়েদের উলুধ্বনি। স্থির হলো গঙ্গাতীরেই যাওয়া হবে প্রথমে। গঙ্গা পুজো করবে নিমাই। বুদ্ধিমন্ত তার পদাতিক সেনাদলকে পথের দু'পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন সারিবদ্ধ ভাবে। বিয়ের শোভাযাত্রা চললো তার মধ্যস্থল দিয়েই।

নিমাইয়ের দোলা হাজির হলো গঙ্গাতীরে। নিমাই দোলা থেকে নেমে পুজো করলো সুরধনীকে। প্রণাম করল ভক্তিভরে। গঙ্গার পূত সলিলে করা হল পুষ্প বৃষ্টি।

ভাটেরা গাইতে আরম্ভ করল গঙ্গামঙ্গল, গায়নেরা গাইল ত্রিভুবন তারিণী গঙ্গার মাহাত্মগীতি। ব্রাহ্মণেরা উচ্চস্বরে রত হল গঙ্গার স্তব বন্দনায়। ভাসিয়ে দেওয়া হলো আরতি করে গঙ্গায় শত শত ঘৃত প্রজ্জ্বালিত প্রদীপ। যেন গঙ্গার বুকে ভেসে উঠলো শত শত মাণিক। জলের ঢেউ লেগে প্রদীপের আলো যেন চলছে নেচে নেচে। গঙ্গার সে এক অপূর্ব শোভা। প্রবহমান গঙ্গার স্রোতধারা আলোর মালায় সর্সজ্জিত হয়ে যেন হেসে উঠছে খল খল, কল কল ধ্বনিতে।

নৃত্য-গীত আর বাদ্য ধ্বনিতে মুখর গঙ্গার তীর।

নবদ্বীপ উজাড় করে যেন ছুটে এসেছে সকলে। দেখছে, উপভোগ

করছে এই আনন্দোৎসব। এমনি ভাবে চললো বেশ কিছুক্ষণ গঙ্গাতীরে গঙ্গাবন্দনা।

'অনেক রাজা রাজড়ার বিয়ে দেখেছি, এমনটি হয় না।' নবদ্বীপের অধিবাসীরা জনে জনে বললে। কেউ কেউ আবার ব্যাখ্যা করতে লাগল। নিমাইকে দেখিয়ে—

'দোলায় যাকে দেখছ, ও কি সাধারণ মানুষের মূর্তি'। দেখছ না কি সুন্দর কুরঙ্গনয়ন জিনি নয়ন যুগল

'বক্ষস্থল পরিসর সুমেরু জিনিঞা।
কেশরী জিনিঞা মাঝা অতি সে খীনিঞা॥
কামদেব রথচক্র জিনিঞা নিতম্ব।
উরুযুগ জিনি রামকদলক স্তম্ভ॥' চৈ ম.

এমন যার দেহের গড়ন, সে সাধারণ মানুষ হবে কেমন করে। তাই—

'ঈশ্বরের মূর্তি দেখি যত নরনারী।
মুগ্ধ হইলেও সবে আপনা পাসরি॥'

এ মূর্তি বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন। দেখে দেখে স্বাদ ফুরোয় না কোনদিন। 'এ মাধুর্যামৃত পান সদা যেই করে। তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে চিরন্তরে॥'

শোভা যাত্রার দল গঙ্গার তীর ছেড়ে চললো এগিয়ে নবদ্বীপ পরিক্রমায়। যতই এগিয়ে চলে শোভাযাত্রা। লোকের ভিড় ও চলে ততই বেড়ে। নবদ্বীপের পথে পথে মুখরিত হয়ে উঠে শোভাযাত্রার কোলাহল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সনাতনের বাড়ীর কাছাকাছি উপস্থিত হলো নিমাইয়ের দোলা। একটু পরিসর স্থান দেখে ওরা নামলো বাঁধ থেকে। আরো উচ্চ নাদে বেজে উঠল মৃদঙ্গ, মাদল, জয় ঢাক আর বীরঢাক।

সহসা দূর থেকে শোনা গেল কোলাহল। মসালের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠছে গোধূলির রক্ত রাঙা সন্ধ্যা। বাজছে নানা বিধ বাদ্যযন্ত্র।

নিমাইয়ের বয়স্যরা বলে উঠ—'ওই, ওই ত আসছে, কন্যা পক্ষীয়রা বরকে অভ্যর্থনা জানাতে।'

॥ সতের ॥

'বর এসেছে রে, বর এসেছে।'

উচ্চ চীৎকারে গগণ বিদীর্ণ করে চারিদিক থেকে ছুটে এলো শত শত ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতী। মুহূর্তের মধ্যে জমায়েত হলো সনাতনের আঙিনায় হাজার হাজার মানুষ।

সনাতনও কম আয়োজন করেনি। তারও বেজে উঠেছে উচ্চনাদে নানান্‌ বাদ্যভাণ্ড। আনন্দের নানাবিধ আয়োজন সেও রেখেছে প্রস্তুত করে।

অভ্যর্থনা জানালো সমাগত বরযাত্রীদের। বৈদিক ব্রাহ্মণরা করল বেদমন্ত্র উচ্চারণ। বেজে উঠল শত শঙ্খ এক সঙ্গে, একই স্বরে। উলুধ্বনির মধ্যেও ছন্দায়িত হিল্লোলযেন নেচে নেচে ভেসে আসতে লাগল বাতাসে।

যেন দেব মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে সনাতনের বাড়ীটি। সে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হবেন স্বয়ং দেবতা। বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়নাথ।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন সনাতন। আরতি করে দোলা থেকে নামানো হলো নিমাইকে। হতে লাগল পুষ্পবৃষ্টি, লাজ বৃষ্টি। শঙ্খের ধ্বনিতে মুখরিত হলো চারিদিক।

বিস্মিত সনাতন। অভিভূত ও বিহ্বল হয়ে পড়েছেন নিমাইয়ের রূপ দর্শন করে। আত্মীয় পরিজন সকলেই মুগ্ধ। এমন নয়ন লোভন রূপ কেউ কখনো দেখেনি জীবনে। কি সুন্দর প্রশান্ত অমিয় মাখা মুখশ্রী। দেখে যেন পলক পড়ে না। অন্তর মথিত করে সনাতনের মনে জেগে উঠে প্রশ্ন—'কে, কে তুমি এসে দাঁড়ালে আমার সম্মুখে। নয়ন লোভন মূর্তি ধরে। এ কে, কে তুমি ?'

ভক্তি আর ভালবাসায় যেন নত হয়ে পড়ছে সনাতনের মস্তক। প্রেমাশ্রুতে আপ্লুত আজ তার দু'নয়ন। কোন মতে বাধ মানছে না চোখের জল। কেমন করে হৃদয়ের আবেগকে রোধ করবেন তিনি। এ যে তার চিরআকাঙ্খিত, আবাল্যের আরাধিত দেবতার রূপ ধরে এসে দাঁড়িয়েছে নয়ন সমুখে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছেন না।

এযে সেই সৌম্য শান্ত সুন্দর মুরতি, ধরা দিয়েছেন এসে স্ব-বেশে। স্ব-রূপে।

সনাতন যেন ডুবে যাচ্ছেন-ভাব রাজ্যে। মন্থর তাঁর গতি বুঝি গৌর-সুন্দরের পদরজ গ্রহণ করতে মস্তক তার অবনত হয়ে আসছে।

নিমাই বুঝতে পারলো সব। তাই জাগিয়ে দিলে সনাতনের মনে লৌকিক ভাব। সরিয়ে নিয়ে এলেন মনকে জাগতিক জগতে। সম্বিৎ ফিরে পেলেন সনাতন।

জামাতাকে কোলে করে নামালেন দোলা থেকে। নিমাইয়ের অঙ্গ-পরশে অথির হয়ে উঠল সনাতন। সে স্পর্শ কি মধুর। যেন ছাড়তে ইচ্ছে করে না। বসে রইলেন স্পর্শ করে নিমাইকে। ডেকে ডেকে বললেন সবাইকে—" কই গো, তোমরা এস। বরণ কর। এই যে আমি বরকে নিয়ে বসে আছি।'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন মহামায়া। সঙ্গে এয়োতিরা নিয়ে এলো বরণ ডালা। ধূপ দীপে আরতি করলো নিমাইকে।

মাথায় ধান দূর্বা দিতে গিয়ে কেঁপে উঠল মহামায়ার হাত। নিমাইয়ের চোখে চোখ পড়তে কেমন যেন হয়ে গেলেন মহামায়া। এলোমেলো হয়ে গেল সব। তাঁর মন বলে উঠল—'এযে দেখছি নর বেশে নারায়ণ আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর গৃহ মন্দিরে।'

অন্তরের আকুতি দিয়ে আশীর্বাদ করলেন মহামায়া। জ্বলে উঠল শত শত মঙ্গল প্রদীপ। শঙ্খ ধ্বনিতে আহ্বান জানালেন নরবেশী নারায়ণকে। বেজে উঠল আরাত্রিকের বাজনা। যেন মুখর হয়ে উঠল দেব মন্দির। ভক্ত-হৃদয় আজ আনন্দে উদ্বেল। তারা খই কড়ি বৃষ্টি করতে করতে দিল জয়ধ্বনি।

এল শুভ লগ্ন।

বিষ্ণুপ্রিয়া বিচিত্র সাজে সজ্জিত। কোন অলংকারের অভাব রাখেন নি সনাতন। যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে তিনি সাজিয়েছেন, বিষ্ণুপ্রিয়াকে মনের মত করে।

সূক্ষ্ম বস্ত্রে ঢেকে, সুচিত্রিত পিঁড়িতে বসিয়ে আপ্তবর্গ ধীরে ধীরে বিবাহ সভায় নিয়ে এল বিষ্ণুপ্রিয়াকে। পরিজন বর্গ আগে আগে লাজ বৃষ্টি করতে করতে এগিয়ে এল সভামণ্ডপের দিকে।

আপ্তবর্গ ধরে দাঁড় করাল নিমাইকে।

অন্তঃপট ধরে ঘিরে রাখল বিষ্ণুপ্রিয়াকে আত্মীয় বর্গ। এবার সপ্তপদী। সাতবার প্রদক্ষিণ করবে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে। বরণ করবে অন্তর দেবতাকে অন্তর মন্দিরে। স্বামী স্ত্রীকে বুঝিয়ে দেবে দম্পতির কর্তব্য ও আকাংখার কথা। এর ঋষি হলো প্রজাপতি, বিষ্ণু দেবতা। ছন্দ একপাদ।

প্রদক্ষিণ করতে করতে উচ্চারিত হলো শপথ বাক্য—

'এক পদ অতিক্রম—জন্মলাভ তরে
দ্বিপদে রাখিও—শক্তি কামনা অন্তরে
তৃতীয় চরণ—নিত্য ব্রতের কারণ
চতুর্থ চরণে—সৌম্যপ্রার্থী অনুক্ষণ
পঞ্চমেতে—গৃহপশু রক্ষার কামনা
ষষ্ঠপদে—চিত্তরক্ষা চিত্তের বাসনা
ঋত্বিক লাভের আশা সপ্তম চরণে
সপ্তপদী দম্পতিরে বাঁধিল বন্ধনে।'

চারিদিক থেকে চলছে পুষ্প বর্ষণ। বেজে উঠছে উভয় পক্ষের শঙ্খ। উচ্চ নিণাদে দু'পক্ষের বাদ্যভাণ্ড বেজে উঠছে তুমুল শব্দে। চারিদিকে স্ত্রী-পুরুষেরা দিচ্ছে ঘন ঘন জয়ধ্বনি।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রদক্ষিণ শেষে মস্তক অবনত করে স্বামীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলো নমস্কারের ভঙ্গীতে।

'তবে প্রিয়া জগমাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্মসমর্পণে॥' চৈ. ভা.

ঈষৎ হাসি ফুটে উঠল গোরাঙ্গ সুন্দরের মুখমণ্ডলে। বিষ্ণুপ্রিয়ার গলায় পরিয়ে দিল মালা নিমাই।

আনন্দের বিদ্যুৎ শিহরণ প্রবাহিত তার সর্বঅঙ্গে। লজ্জায় তাকাতে পারছে না প্রিয়া নিমাইয়ের মুখের দিকে। দু'চোখ বুজে এল বিষ্ণুপ্রিয়ার।

সখিরা ধমক দিয়ে উঠল।

'ওকি হচ্ছে। চোখ মেলে চা। শুভদৃষ্টির সময় বরের মুখ না দেখলে দোষ হয়। এত কিসের লজ্জা রে তোর। বরকে দেখার জন্য দিন ত ছুটতিস গঙ্গায়। তবে আজ কিসের এত লজ্জা।'

'ছিঃ ছিঃ, কি বেহায়ারে তোরা?' জিব কাটে বিষ্ণুপ্রিয়া। যেন লজ্জায় আরো আরক্ত হয়ে যায় বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু ওরা ত না দেখলে ছাড়বে না।

বিষ্ণুপ্রিয়া তাকাল। মুহূর্ত বরের চোখে চোখ রাখল।

মিলন হল চার চোখের। একটি মাত্র মুহূর্ত। এ যেন অনন্তকালের দর্শনে পরিপূর্ণ।

নিমাইয়ের বাঁয়ে এসে দাঁড়াল বিষ্ণুপ্রিয়া। যেন একটু সাহস হয়েছে তার। ঘোমটার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে আড়চোখে চুপি চুপি দেখছে সে নিমাইকে।

পদকর্তা বলরাম দাসের দৃষ্টি কিন্তু এড়ায়নি। ফাঁকি দিতে পারেনি

বিষ্ণুপ্রিয়া বলরামের চোখকে। বলরাম তাড়াতাড়ি ভাষার তুলি দিয়ে আঁকছেন সে মুহূর্তের ছবি—

'ঘোমটা আড়ালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
আড়চোখে হেরে পতি মুখ ছবি ॥
ভাবিছেন মনে কি সুন্দর মুখ।
কি তপেতে বিধি দিল এত সুখ ॥
এই যে লোভের সামগ্রী দক্ষিণে।
কারু অধিকার নাহি এই ধনে ॥
দক্ষিণে দাঁড়ায়ে এটি মোর বর।
এ ধন আমার কেবল আমার ॥
মুখ হেট করি হেরিছে চরণ।
আপনারে চির করিছে অর্পণ ॥
বিধি সাক্ষী করি কহিছেন মনে।
আমি ত বালিকা কহিতে জানিনে ॥
মোর যত সুখ ধব তুমি কবে।
তোমার যে দুঃখ দাও মোর শিরে ॥
দুঃখে কিবা সুখে যেন রাখ মোরে।
ওই চন্দ্রমুখ যেন মোরে স্ফুরে ॥
শত অপরাধ করিব চরণে।
ক্ষমিবা সকল তুমি নিজগুণে ॥'

আনন্দে শিউরে শিউরে উঠছে বিষ্ণুপ্রিয়া। পায়ের দিকে তাকিয়ে পলক যেন আর পড়ছে না। কি সুন্দর অপূর্ব পদযুগল। অঙ্গুলি, নখচন্দ্রমা, গোড়ালি—অপূর্ব শিল্প-সুষমায় সমুজ্জ্বল। ঐ চরণ যুগলে আমি তোমার চিরদাসী হয়ে রব। ও ত আমারই চির আরাধ্য। জন্ম-জন্মান্তর ঐ চরণযুগলই ত কামনা করেছি মনে মনে। প্রভু, ও চরণ ছাড়া করো না আমাকে।

কি অপূর্ব দুটি করপল্লব। এখন ত আমি তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আমার সমস্ত সুখ ঐ হাতের মুঠোয়। কিন্তু এত সুখ কি আমার কপালে সইবে? আমি কি ধরে রাখতে পারব চিরস্থায়ী করে?

মুহূর্তে প্রিয়ার ঘটে ভাব বিবর্তন। যেন নিজেকে নিজের অবিশ্বাস হয়। এ সব কি সত্যি, না স্বপ্ন। এ বিয়ে কার সঙ্গে কার? এ আমি কি দেখছি, কোথায় রয়েছি দাঁড়িয়ে?

"তবে রাজপণ্ডিত পরম হর্ষ মনে।
বসিলেন কবিবারে কন্যা সম্প্রদানে॥"

বিধি সম্মতভাবে সনাতন কন্যা সম্প্রদানের জন্য সংকল্প করলেন। তারপর বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাইয়ের হাতে সনাতন করলেন সমর্পণ।

দান সামগ্রী যা দিলেন তার তুলনা হয় না। একমাত্র কন্যা তার। তাই তিনি দিতে কিছু কার্পণ্য করেন নি। ভূমি দান, ধেনু দান, শয্যা বাসনাদি—এ সব ত দিলেনই। অধিকন্তু দাস-দাসীও দিলেন। যৌতুকের ত কোন লেখাজোখা নাই। যৌতুকে দান সামগ্রীর মণ্ডপ হল স্তূপীকৃত। সনাতন যত দেন, তবু যেন তাঁর আশা মেটে না। দিয়ে দিয়ে তিনি যেন শেষ করতে পরছেন না কিছুতেই।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে বসান হল নিমাইয়ের ডান দিক থেকে উঠিয়ে বাম পাশে। শেষ হল হোমকার্য। বেদাচার আর লোকাচার, বাদ পড়ল না কোন কিছুই।

বিয়ের পর বর-কন্যা দু'জনে চললো বাসর ঘরে।

আনন্দে প্রায় অবশ হয়ে পড়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া। যেন চলতে পারছে না পায়ে ভর দিয়ে। দু'জনের আঁচলে গিঁট। নিমাই যেন টেনে নিয়ে চলছে প্রিয়াকে।

বাসরে ঢোকার মুখেই 'খটাস' করে শব্দ হল একটা। 'উঃ হুঁঃ।' একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়া। সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়ল স্বামীর গায়ে।

'কি হল? কি হল?' উৎকণ্ঠিত, উৎসুক প্রশ্ন। এ ওর মুখের দিকে তাকাল শংকিত দৃষ্টিতে।

বুঝতে পেরেছে নিমাই। উছট লেগেছে বিষ্ণুপ্রিয়ার দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে। ছড়ে গেছে একেবারে। রক্ত পড়ছে আঙুল থেকে।

অসহ্য যন্ত্রনায় বিষ্ণুপ্রিয়া শুধু কি অধীর! যেন সে মর্মে মরে যাচ্ছে। বাসরে যাওয়ার পথে একি অমঙ্গল। কেন এত বাধা! বড্ড ভয় করে বিষ্ণুপ্রিয়ার।

রক্ত পড়ছে। থামবে কেমন করে?

নিমাই নিজের পদাঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরল বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্ষত পায়ের অঙ্গুলি। বন্ধ হল ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়া। ব্যথা বেদনা যেন কিছু রইল না আর।

সর্ব ব্যথাহারী বনমালী ব্যথা নিলেন হরণ করে।

আঙুলে আঙুলেই প্রথম প্রেমালাপ। প্রথম মিলন।

কিন্তু ভয় যে যায় না বিষ্ণুপ্রিয়ার কিছুতেই। এ যে ভীষণ অমঙ্গল। বাসরে আসার পথে কেন এই বাধা!

বাসর শয্যায় কেমন যেন মনমরা হয়ে বসে আছে প্রিয়া। নিজেকে সোজা করে রাখতে পারছে না সে। ঢলে পড়েছে নিমাইয়ের গায়ে। অঙ্গের স্পর্শে যেন নির্ভরতা পেতে চাইছে প্রিয়া। শংকহারী মধুসূদন, তুমি আমার দূর কর সর্ব সংশয়।

'তোমার ভয় কি, এই ত আমি পাশেই রয়েছি।' নিমাই সাহস দিয়ে বললে প্রিয়াকে।

ধীরে ধীরে বিষ্ণুপ্রিয়ার মন থেকে দূর হল দুশ্চিন্তা। যেন অনেকটা নির্ভয় হলো সে। সত্যি ত, তার এত ভয়েরই বা কি আছে। সে ত রয়েছে তার পতির কাছে, তার প্রাণবল্লভের কাছে। যত কিছু বিপদ তিনিই ত নেবেন হরণ করে। তাইত তাঁর আর এক নাম বিপদহারী।

মেঘমুক্ত আকাশের মত বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়াকাশ হয়ে উঠল নির্মল। আনন্দের পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠল মন।

গৌরাঙ্গের পাশেই রয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া। সখীরা চারিদিকে ঘিরে বসেছে। এমন যুগল মূর্তি দেখে আনন্দে আত্মহারা। রসালাপ করতে চায় বরের সঙ্গে সকলেই। চপলতা প্রকাশ করে জিগ্গেস করল সখীরা—'বলি, হ্যাঁ গো মশাই, আমাদের সখীকে আপনার পছন্দ হয়েছে ত?

অন্যান্য সকলে হেসে উঠল 'হো-হো' করে।

নিমাই নীরব। ঈষৎ হাসির রেখা ওষ্ঠপ্রান্তে যেন ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল।

'হাসি ফুটেছে রে। আমার সখীর প্রাণপতি হেসেছেন।'

হেসে উঠলো 'হাঃ-হা' করে সকলে। ব্যঙ্গের ব্যঞ্জনা উপভোগ করতে লাগল তাকিয়ে তাকিয়ে।

'বলি নীরব কেন বর মশাই?' একজন সখী ঠেলা দিয়ে প্রশ্ন করল নিমাইকে।

তবু নিরুত্তর নিমাই। আজকের এই আনন্দের রাত্রিতে কেমন যেন চিন্তিত।

কি যেন ভাবছে সে। মন তার কার স্মৃতিতে ভরপুর। এই আনন্দ-বাসরে দেহ তার হয়ে আছে আনন্দময়। কিন্তু দেহী, কোথায় কোন লোকে বিচরণ করছে।

'ওরে, তোরা ওদের ছেড়ে দে। আমি ওদের নিয়ে যেতে এসেছি। ওরা দুটি খেয়ে আসুক। সারাদিন যে অভুক্ত ওরা।'

বুঝি এ কণ্ঠ কাঞ্চনার। সে নিয়ে যেতে এসেছে তার সখা আর সখীকে।

ভোজনে বসল পাশাপাশি দু'জনে গিয়ে। মহামায়া অন্তরালে থেকে নির্দেশ দিলেন কাঞ্চনাকে। স্বর্ণথাল পরিপূর্ণ করে কাঞ্চনা বাড়িয়ে দিল খাদ্য সামগ্রী।

অন্যান্য সখী সহ কাঞ্চনা বসে বসে খাওয়ালো ওদের দু'জনকে।

এদিকে বাসরে অন্য সখীরা প্রস্তুত। সারাটা রাত্রি বাসর জাগবে তারা। আর পরিহাসে বাসরকে করে রাখবে উৎসব মুখর। জড়তা আর অলসতা আজ তাদের পারবে না কাবু করতে

তাই সখীরা চটুল চপলতায় উঠল মুখর হয়ে। যেন খুশির সায়রে উঠল তুফান। মেতে উঠল সকলে কৌতুকে।

বাসরের অন্তরাল থেকে অন্যান্য নারীরা ওদের দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল—

'এই লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণু বিশ্বম্ভর হঞা,
পৃথিবীতে কৈল অবধানে॥'

নিমাই নীরব কথা বলছে না একটিও। শুধু তাকিয়ে আছে। আয়ত দু'টি কমল লোচন মেলে। সে দৃষ্টি থেকে যেন সুধা ঝরছে। যেন উছলে উঠছে খুশির প্রস্রবণ। তাকিয়ে আছে সৌম্য প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে।

সখীরা তাতেই হয়ে উঠছে মাতোয়ারা। যেন গোরা অঙ্গের স্পর্শ সুখ অনুভব করার জন্য হয়ে উঠছে উন্মাদ। তাই—

'কেহো গন্ধ-চন্দন, অঙ্গে করে লেপন
পরশিতে বাড়ে উনমাদ।
করি আন পর সঙ্গে লোলি পড়য়ে অঙ্গে,
পুরাইল জনমের সাদ॥' চৈ· ম· লোচন

আবার কোন সখী করতে চায় নিজ আত্মসমর্পণ। জন্ম জন্মান্তর চায় প্রভুর সেবা করতে। তাই—

'বাটা ভরি তাম্বুলে, দেই প্রভু পদমূলে
করে দেই কুসুম-অঞ্জলি
তার মনঃকথা এই, জন্ম জন্ম প্রভু তুঁঞি,
আত্ম সমর্পয়ে ইহা বলি॥' —চৈ. ম. লোচন

উৎসব মুখর বাসর রাত্রি, হয়ে এলো অবসান। আকাশে হয়ে এলো পূর্ব দিগন্ত। বাসর জাগা প্রদীপের আলো সেও হয়ে এলো ম্লান। সখীদের মনও

যেন হয়ে আসছে বিষাদাচ্ছন্ন। এ উৎসব রাতি যদি চলত অনন্ত কাল ধরে। তাহলে ত বঞ্চিত হতে হতো না সখার সান্নিধ্য।

বিষাদমগ্ন হৃদয়, যেন বিলাপ করে উঠল সখীদের—'ও রজনী, তুমি যেও না চলে। আমাদের থাকতে দাও অনন্তকাল এই যুগল তনুকে ঘিরে।'

পূর্ব উদয়াচল বালার্ক সিন্দুর বিন্দুর মত হয়ে উঠে রঞ্জিত। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে ওদের চোখের কোণে ফুটে ওঠে কালিমা। কিন্তু সে অঞ্জন রেখা বড় মধুর, বড় সুন্দর। যদি এমন বিনিদ্র রজনী চলত জন্ম জন্মান্তর ধরে। তাহলে সইতে হতো না পরমপুরুষের স্পর্শ থেকে বিচ্যুতির বেদনা।

বাসরে—'এইমনে রজনী, গোঙাইলা গুণমণি,'

প্রভাতে বাসর থেকে বেরিয়ে এলো নিমাই। আজকে বিবাহের দ্বিতীয় দিন। হবে কুশণ্ডিকা বিবাহ।

আর্যদের প্রতি কার্যের প্রধান দেবতা হলেন অগ্নি। প্রধান সাক্ষীও হলেন তিনি।

যজ্ঞে তাই প্রতি কার্যে দিতে হয় অগ্নিতে আহুতি। যজ্ঞ কুণ্ডে আগুন জ্বালিয়ে দেবতাদের সাক্ষী রেখে গ্রহণ করতে হবে স্ত্রীকে। কুশণ্ডিকার এই আগুনটির নাম 'যোজক'। তিনি ত যোজনাব কার্যেই হবেন জাগ্রত।

সেই জন্যই—

'প্রভাতে উঠিয়া বিধি, কৈল প্রভু গুণনিধি,
কুশণ্ডিকা কর্ম যে দিবসে॥
তারপর পহুঁ, বসিলাত বামে বহু...
ঘরেরে চলিব—বৈল বাণী' চৈ· ম· লোচন

কুশণ্ডিকা বিয়ের অনুষ্ঠানেই নিমাই পরিয়ে দিল বিষ্ণুপ্রিয়ার সীমন্তে সিন্দুরের ফোটা। সজ্জিত হলো এয়োতির সাজে প্রিয়া। প্রথম লজ্জা হলো মন্দীভূত। এই প্রথম আলাপ হলো দু'জনেব। তাই উচ্চারিত হলো শ্রেষ্ঠ কামনা।

"শতঞ্চ জীব শরদঃ সুচর্চা বসুনিচার্যে বিভূজাসি জীবন্।"

নিমাই স্থির। জেগে উঠেছে তার অতীত স্মৃতি।

স্বয়ম্বর সভা। কন্যাকে নিয়ে পতি চলে যেতো শকটারোহন নিজের গৃহে। পথে তিন দিন অতিবাহিত করত একত্রে দু'জনে। একত্র ভূমিতলে রচিত হতো শয্যা। লবণ-ক্ষার-বর্জিত অন্নই ছিল একমাত্র আহার্য। সুখ-শয্যার কল্পনাও থাকত না মনে।

তিন দিন পরে কন্যা পতিগৃহে এলে, কন্যা সম্প্রদাতা পিতা আসতেন

জামতার বাড়ী। অর্ঘ্যাদির দ্বারা পূজো করতেন জামাইকে। তারপরই হতো বিবাহ।

সে নিয়ম আজকে আর সমাজে নাই। পরিবর্তে প্রচলিত হয়েছে 'কটযাত্রা'। কন্যা যাচ্ছে পিতৃলোক থেকে লোকান্তর অর্থাৎ গমন করছে পতিলোকে। সে পথ যেমন বিপদ সংকুল, তেমনি বন্ধুর। প্রস্তরাবর্তের মত কঠিন। তাইত এই কটযাত্রার প্রবর্তন।

নিমাই আর বিষ্ণুপ্রিয়া 'আরোঢ় স্নান' করলো শিলের উপর দিয়ে হেঁটে। মন্ত্র উচ্চারিত হলো—"…ও প্রাস্যাঃ পতিযানঃ পন্থাঃ কলাতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোক গম্যাঃ।'

মহাব্যাহৃতি হোম করল নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে, জানালো দেবতার কাছে প্রার্থনা। সে প্রার্থনা আর কিছুই নয়—পিতৃলোক-বিয়োগ-বিধুরা রোরুদ্যমানা কন্যার মানসিক শান্তি কামনা।

দূরে গেছে লজ্জা। দুজন দুজনকে পেয়েছে আরো নিকটে, নিকটতর করে। তাই একেবারে যুক্ত হয়ে, একে অপরের বক্ষলগ্ন হয়ে অঞ্জলি বদ্ধ করে কবল 'লাজহোম' দান। বড় মায়া হয় ফুল পোড়াতে। বিশেষ এই মিলন পর্বে। ফুলের মালার বন্ধনেই তো হয়েছে বন্ধনের সূত্রপাত। তাই, ফুলের মতই ত খই, তাই দিয়ে হলো লাজহোম। খৈ-রই ত অপর নাম লাজ। ঘুচল প্রিয়ার লজ্জাও।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ছোট ভাই যাদব। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অংশ গ্রহণ করল, সেই। এরপর আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণের সঙ্গে প্রকৃত ভোজনে বসল নিমাই।

আটেরো

সহসা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল সব আনন্দ কোলাহল। কথা নাই কারো মুখে। একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে সারা বাড়ীটায়। এখনো আত্মীয় স্বজন, সকলেই আছে। অথচ সহসা এমন নিভে গেল কেন উৎসবের বাতি।

আর কেউ ত কালকের মত তেমন আনন্দে মাতামাতি করছে না। কারো মুখে নেই হাসির রেখা। অথচ ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে সকলেই।

ওধারে কাঁঠাল গাছটার তলায়, যাদব আর মাধব, তাদের খেলা ঘরে মিলেছে দু'জন। ওরা ছোট হলেও কেমন যেন কি বুঝতে পেরেছে। যাদব বড আর মাধব ছোট।

মাধবই বললে—'দাদারে, চল। আমরা মায়ের কাছে যাই। আজ খেলতে ভাল লাগছে না।

কোন কথা না বলে যাদব, মাধবের হাত ধরে চললো খেলাঘর ছেড়ে।

অতিথি অভ্যাগতদের খাওয়া-দাওয়া প্রায় শেষ হয়ে আসছে। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। খাঁ খাঁ করছে বোশেখের দুপুর।

'দুষ্টু, তোরা কোথায় ছিলিরে মাণিক। সকলে খোঁজাখুঁজি করছি। নাইবি না খাবি না আজ?' ওদের দেখে যেন হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলো কাঞ্চন আর অমিতা।

'কই, কোথায় খুঁজছিলে? আমরা ত কাঁঠাল তলায় ছিলাম তোমরা সকলে ছুটাছুটি করছ, আমাদের কেউ ডাকছ না।' কান্না ভেজা কণ্ঠে ওরা জড়িয়ে ধরলে দু'জনকে দু'জনে।

'দিদি আজ বাড়ী যাবে না, তাই ত আমরা ব্যস্ত। তোরা কি বুঝিস্ না।'

ওদের কোলে তুলে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল কাঞ্চনা আর অমিতা।

সময়টা যেন বড় দ্রুত চলে যাচ্ছে। গোছগাছ হচ্ছে জিনিসপত্র। নীরবে ত্রস্তে-ব্যস্তে কাজ করছে সকলে।

যেন কোথা দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে কেটে যাচ্ছে সময়টা। আরম্ভ হয়ে গেছে নৃত্যগীত। ওদিকে বুদ্ধিমন্ত খানের দোলা প্রস্তুত। পুষ্পপত্রে সুন্দর

সুসজ্জিত দোলা। যেন একটা নয়নাভিরাম পুষ্প-মন্দির টাটকা তাজা ফুলের গন্ধ বোশেখের গুমোট উত্তাপকে করে তুলছে মধুময়। দক্ষিণের মৃদুমন্দ শীতল বাতাস বয়ে আসছে সুরধনী থেকে।

প্রিয়া যাবে পতিগৃহে। ব্রাহ্মণগণ পাঠ করছেন পুণ্য শ্লোক। বেণু, বীণাতে বাজছে করুণ রাগিনী। বিদায় বিধুর মুহূর্ত। ব্যথিত সকলের অন্তর।

কুলবধূরা দ্রুত সাজাচ্ছে প্রিয়াকে। চন্দন আর কুমকুমের ফোঁটা দিয়ে কপালে। গণ্ডদেশে সুন্দর করে আঁকছে আলিপন। মাথার খোঁপায় পরিয়ে দিচ্ছে ফুলের মালা। ফুলের গহনায় বিভূষণ করছে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ। সখীরা পদযুগল রঞ্জিত করছে অলক্ত কা রাগে। আলিপন আঁকছে করযুগে।

মহামায়া বারে বারে তাকাচ্ছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে। থেকে থেকে চোখ মুছছেন। দাঁড়াতে পারছেন না স্থির হয়ে। সরে যাচ্ছেন দূরে। আবার আসছেন। আবার তাকাচ্ছেন। আবার কাঁদছেন।

বিমোথিত হয়ে উঠছে হৃদয়টা। বড় আদর যত্নে লালন-পালন করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। বড় আদরের মেয়ে তার। বড় অভিমানিনী। সুখের শয্যায় সোহাগের উপাধানে রেখেছিলেন শুইয়ে। কত কথা, কত স্মৃতি, বার বার জেগে উঠছে তার মনে। কত বকেছেন, কত বলেছেন, বার বার জেগে উঠছে সে সব স্মৃতি মহামায়ার হৃদয়ে। আজ ঘর শূন্য করে চলে যাবে প্রিয়া। কি করে সইবে মহামায়া। কি রে ধরে রাখবে সে নিজেকে। এ বেদন-দহন সহ্য করবেন কেমন করে!

বিধুমুখী এক পাশটিতে দাঁড়িয়ে আছে অশ্রুসিক্ত নয়নে। বাল-বিধবা বিধুমুখী। বিষ্ণুপ্রিয়া ছিল তার বড় স্নেহের, বড় আদরের। আজ থেকে সে হয়ে যাবে সর্বরিক্ত। হয়ে যাবে বড় একাকী। বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে উঠল কাকীমার দিকে তাকিয়ে। অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছে তার নয়নের জল। বিধুমুখী কেঁদে মোছাতে চাইছে প্রিয়ার কান্না নিজের সিক্ত অঞ্চল দিয়ে বুকে জড়িয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে প্রিয়ার দুটি চোখ। বার বার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে প্রিয়া। এ এক করুণ মর্মন্তুদ হৃদয়বিদারক দৃশ্য।

যাদব এক পাশে দাঁড়িয়ে। সকলের কান্না দেখে তার চোখ হয়ে উঠেছে অশ্রু সজল। ভেঙ্গে পড়ছে কান্নায়। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে মাধবও। শৈশবে হারিয়েছে সে বাবাকে। পিতৃ-স্নেহ কি তা সে জানে না। দিদির কাছেই যা ছিল আবদার তার। বড় দুঃখী সে। দিদির আঁচল ধরেই থাকত দিন রাত। গঙ্গার স্নানে দিদি তাকে নিয়ে যেত হাতটি ধরে। দিদিকে না দেখলে আকুল

হয়ে উঠত কেঁদে। সেই দিদি তার পর হয়ে যাবে, তাকে ছেড়ে চলে যাবে, এ যেন সে ভাবতেই পারছে না। দিদিকে ছেড়ে সে যে থাকতে পারবে না কিছুতেই। কি নিয়ে সে থাকবে ঘরে। টপ টপ করে তার দুটি চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। ঘন ঘন মুছছে ছোট দুটি হাত দিয়ে।

বিষ্ণুপ্রিয়া আর পারল না নিজেকে ধরে রাখতে। ছুটে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল যাদবকে। থরথর করে কাঁপতে লাগল তার সর্ব শরীর। সজোরে জাপটে ধরে গালে গাল রেখে কেঁদে উঠল হু-হু করে। মাধবকে টেনে নিল কাছে। দু'চোখ রাঙা হয়ে উঠেছে তার। আঙ্গুল দিয়ে বার বার মুছে দিল চোখের জল। যাদব আর মাধব দু'জনকে এক সঙ্গে বুকে জাপটিয়ে ধরে কেঁদে উঠল এক সঙ্গে তিন জনে।

এ দৃশ্য দেখে কেউ আর পারল না নিজেদের ধরে রাখতে। দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী কেঁদে উঠল উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে। হয়ে উঠল সকলের নয়ন অশ্রুসিক্ত। কেউ কোন কথা বলছে না। গম্ভীর সবাই বেদনাহত। স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছে সকলে। বাংলার কন্যা-বিদায়ের এ বেদনা অবর্ণনীয়। তুলি দিয়ে এ চিত্র অঙ্কন করা যায় না। বুঝি সাধ্যাতীত এ প্রচেষ্টা। উপলব্ধি করতে হয় মরমী হৃদয় দিয়ে।

কান্নার সমুদ্রে যেন জেগেছে তুফান। উত্তাল হয়ে উঠেছে দুঃখের কালিন্দী। যেন ভেসে আসছে কালিন্দী থেকে বেদনার করুণ আর্তি। বিদায় ক্ষণের এ মুহূর্তে প্রকৃতি ত যেন বিষাদমগ্ন। সহসা পত্র-পল্লবের মর্মর হয়ে গেছে স্তব্ধ। নব কিশলয়, নব জাতকের মত কাঁদতে কাঁদতে যেন থেমে গেছে।

ধান আর দূর্বা নিয়ে এগিয়ে এলেন সনাতন মিশ্র। পিছনে পিছনে ধীর পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছেন মহামায়া। সঙ্গে সঙ্গে পুরমহিলারাও। জনক-জননী আশীর্বাদ করলেন তাঁদের আদরের বিষ্ণুপ্রিয়াকে। টেনে নিলেন বুকের কাছে। আশিস চুম্বনে উজাড় করে দিলেন হৃদয়ের স্নেহ-সুধা। অশ্রুজলে করলেন অভিস্নাত।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ছোট্ট হৃদয় আর পারছে না সামলিয়ে রাখতে। প্রিয়া কেঁদে উঠল ডাক ছেড়ে। সনাতনের পিতৃ হৃদয় এতক্ষণ কাঁদছিল গুমরে গুমরে। আর পারলেন না তিনি নিজেকে ধরে রাখতে। শিশুর মত কেঁদে উঠলেন ডুকরে। ধরা গলায় সান্ত্বনা দেবেন কি তিনি নিজেই কেঁদে আকুল। কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'না, না, অমন করে কাঁদিসনে মা। এ সময় কাঁদিতে নেই! অমন করে ফেলিসনে মা, শুভযাত্রার সময় চোখের জল।'

বলতে বলতে কেঁদে উঠলেন ডুকরে ডুকরে, মহামায়া নির্বাক। যেন পাথর হয়ে গেছেন তিনি। একটি কথাও বলতে পারছেন না। হয়ে গিয়েছেন বোবা। কণ্ঠ রুদ্ধ যেন তাঁর। নীরবে আশীর্বাদ করলেন যুগল মূর্তিকে। ওরা প্রণাম করল উভয়ে জনক-জননীকে।

সনাতন অনেক কষ্টে, এতক্ষণে সম্বরণ করে ফেলেছেন শোকাবেগ। কান্না ভেজা কণ্ঠে বললেন—'আমার কন্যা তোমার দাসী হওয়ার যোগ্য নয়। তুমি নিজগুণে একে কৃপা করো।' তারপর বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত তুলে দিলেন নিমাইয়ের হাতে। ছলছল করে উঠল তাঁর চোখ দুটি। দুগণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুধারা।

মহামায়া দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছেই। এতক্ষণ তার চোখের অশ্রু যেন রুদ্ধ হয়ে ছিল। সনাতনের কান্না দেখে তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। অধীর হয়ে পড়লেন শোকে। কেঁদে উঠলেন নীরবে। দু'চোখ বেয়ে নামল তাঁর শ্রাবণের ধারা।

মাহামায়ার চোখে জল দেখে সনাতন যেন অনেকটা বুকে বল পেলেন। যতটা শোকে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন, এখন সে ভাব অনেকটা কেটে গেল তাঁর। তাঁর একমাত্র পুত্র যাদবের হাতটা নিমাইয়ের হাতে দিয়ে বললেন—'আমার এই অযোগ্য পুত্রটিকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। এর সমস্ত ভার তোমাকে নিতে হবে।'

নিমাই সাদরে যাদবকে গ্রহণ করে বললে—'আচ্ছা তাই হবে। যাদবের সব ভার আজ থেকে আমি নিলাম।'

আবার মহামায়া প্রিয়ার হস্ত চুম্বন করে বললেন—'বাছা, তুমি ভুবন-দুর্লভ পতি পেয়েছ। এখন থেকে শচীমাই তোমার মা হবেন শুনেছি তাঁর মত মা জগতে অনেক ভাগ্যের ফলেই মেলে। আজ থেকে তুমিই হলে সেই মহা-ভাগ্যের অধিকারীণী। তার প্রতি কোন অযত্ন করো না। তাঁর কাছেই রেখো তোমার সকল আবদার। সুখী হও তোমরা দু'জনে।'

সূর্য একেবারে ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। আর ত দেরী করা চলে না। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধরে নিয়ে চলেছে দোলার দিকে। ধীর পদবিক্ষেপে চলছে প্রিয়া। আর ফিরে ফিরে দেখছে সকলকে। টপ টপ করে পড়ছে তার চোখের জল। বাল্য কৈশোরের সব স্মৃতি যেন এক সঙ্গে ভিড় করে আসছে তার স্মৃতিপটে।

অশত্থ তলায় ওই-ত তার সেই খেলাঘর: গোড়া দানায় মঙ্গলীর মা কই জাবর কাটছে না ত। আজ বুঝি ওকে কেউ এখনো খেতে দেয়নি। বটের

শাখায় শঙ্খচিলটার বাসায় দুটো ছানা হয়েছিল ওদের। এই সময়ই ত মা চিলটা ফিরত ঠোঁটে করে তার ছানার খাওয়ার নিয়ে। সে কি এখনো ফেরেনি ?

আহা, না যদি ফেরে। ভাবী কষ্ট হবে ওদের।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, আর স্মৃতি রোমন্থন করছে। কোথায় যে পা পড়ছে প্রিয়ার সে নিজেই কিছু বুঝতে পারছো না। সকলে ধরাধরি করে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তুলে দিল দোলায়। নিমাই উঠে পড়েছে আগেই।

উঠল হুলুধ্বনি। কান্না বাদ্য কোলাহল সব যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। মনুষ্য যান চললো ধীরে ধীরে।

সকলে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। অশ্রু সজল নয়নে দোলা থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া বারে বারে তাকাতে লাগল তার ফেলে যাওয়া পিতৃগৃহের দিকে। বিষ্ণুগৃহের চুড়োকে উদ্দেশ্য করে জানালো প্রণাম।

ধীরে ধীরে আঁকাবাঁকা পথে হেলেদুলে চলছে দোলা। সকলে তাকিয়ে আছে সেই দিকে। এক সময় সবুজ বনান্তরালে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল নিমাই আর বিষ্ণুপ্রিয়ার দোলা।

ধীরে ধীরে বাদ্য ভাণ্ডের ধ্বনিও গেল মিলিয়ে।

॥ উনিশ ॥

সুদীর্ঘ দুঃখের দহন-দীর্ণ দিনগুলির কথা, শচীদেবী ভুলে যান মুহূর্তে। প্রসন্ন প্রভাতের প্রস্ফুট পুষ্পের মত ফুটে উঠে মুখে মধুর হাসি। লক্ষ্মীকে হারানোর পর হাসতে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। হাসতে পারেন নি। হাসি তার হৃদয় থেকে উৎসারিত হতো না। একটা শূন্যতা, একটা হাহাকারে সদা সর্বদা হৃদয়টা কেমন যেন হু-হু করে উঠত।

কিন্তু আজকে শচীর ঘরে, যেন খুশির বান ডেকেছে। শচীদেবীর ঘরে ভেঙ্গে পড়েছে মায়াপুরের গোটা বৈদিক পাড়াটা। কিশোরী, যুবতী, বৃদ্ধা— দলে দলে আসছে বাড়ীতে। যেন অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারা আসছে ত আসছেই।

শচীদেবী যেন দেহে পেয়েছেন শত যুবতীর শক্তি। অনবরত ছুটাছুটি করছেন। আনন্দে অধীর হয়ে কারো গলা জড়িয়ে বলছেন, 'তুমি এসেছ। এত দেরী করলে কেন? যাও মালিনী সই-এর কাছে গিয়ে কিছু খেয়ে লেগে পড় কাজে।'

'থাক থাক, পাগল, এখন কি প্রণাম করতে আছে।' একটু চুমু খেয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে। 'ও বৌমা, এস এস। খোকাকেও এনেছ দেখছি। বাঃ, বেশ সুন্দর হয়েছে তোমার ছেলে।' দুটো গাল টিপে দিয়ে একটা চুমু খান খোকার।

হয়ত কোন পাড়ার বয়স্ক বৃদ্ধা আসছেন লাঠি ঠুকে ঠুকে। নিমাই তাকে পাড়া সম্পর্কে 'ঠাকমা' বলেই ডাকে। গিয়ে তাকে প্রণাম করলেন শচীদেবী।

'আসুন, আসুন। আপনার নাত বৌ ত গেছে। চলুন, আপনাকে দিয়ে আসছি ওর কাছে।' জড়িয়ে ধরলেন শচীদেবী ঠাকমাকে।

যেন বিরাম বিশ্রাম নেই শচীদেবীর। আর যেন পারছেন না। এসেছেন সীতাদেবী। অদ্বৈতাচার্যের গৃহিনী। তিনি সামলাচ্ছেন ওদিকটা। মালিনী দেবী পুরললনাদের আদর অভ্যর্থনায় ব্যস্ত।

বাইরে মুকুন্দ সঞ্জয় ত আছেই। এ উৎসবে বুদ্ধিমন্ত খান নিজেই রেখেছেন অর্থ দপ্তরের ভার। তাঁর নায়েব, গোমস্তা, সৈন্য সামন্ত অর্থাৎ প্রশাসনিক দপ্তর প্রায় অর্ধেকটাই চলে এসেছে নিমাইয়ের বৌভাতে। নিমাইয়ের শতাধিক ছাত্র

যে যার সাধ্য ও যোগ্যতা মত বেছে নিয়েছে কাজের ভার। কোথাও কোন বিশৃংখলা নাই। সবই চলছে যন্ত্রের মত, সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে। দিয়তাং ভুজ্যতাং, লেগেই আছে।

শচীদেবীর বিনয় মধুর বাক্যে আপ্যায়িত হয়ে উঠছেন সকলেই। কি সুন্দর মধুর সম্ভাষণ তাঁর। একদল পুরমহিলা নববধূ সন্দর্শন করে, বৌভাত সেরে ব্যস্ত শচীদেবীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেই মধুর স্বরে তাঁদের উদ্দেশ্য করে বললেন—'এ ত তোমাদের বাড়ি-ঘর, তোমাদের নিমাই। নিমাই কি আমার একার। তোমরা আসবে। বৌমাকে সাজাবে। গল্প করবে। নিমাই ত ঐ থাকে টোল নিয়ে। তোমরা না এলে ওর যে ভারি একা একা লাগবে। তোমরা এসো, কেমন।'

'হ্যাঁ আই মা, আমরা আসব। বৌমাকে দেখে আমাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

এবার গর্বে ফুলে উঠে শচীদেবীর বুক। বলেন—'তাইতো বলছি, মাঝে মাঝে এস তোমরা। আজ ত বৌমার সঙ্গে কথা বলতে পেলে না। আলাপ হলো না। কথা বললে বুঝবে, কত সুন্দর বোমা আমার দেখবে তোমাদের মনের মতই বৌমা এনেছি।'

'দেখতেও খু-উ-ব সুন্দরী।' পুরললনাদের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠল ভাবের ঘোরে। আবার কে একজন বুঝি সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনা করে সুর দিয়ে গেয়ে শোনাল—

"বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখ বাণা শোনা।
ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা॥"—চৈ. ম. লোচন

বাঃ ভারী সুন্দর বলেছ। খুব যুতসই হয়েছে উপমাটি।' খুশি হয়ে উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠেন শচীদেবী।

নদীয়ার গরিব দুঃখী শত শত এসেছে। তারা দেখতে চায় শচীদেবীর তড়িৎ প্রতিমার মত এই বৌমাকে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন শচীদেবী। বৌমাকে কোলে করে তুলে নিয়ে যেন নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলেন সদরে।

নিমাই আর বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল মূর্তি দেখে তাদের হৃদয়ে জেগে উঠল সেব্য-সেবক ভাব দ্যুতি। গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করে ব্যথিত মদন গেল পালিয়ে দূরে। নদীয়া নাগরীগণের হৃদয়ে জেগে উঠল বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল প্রীতি ও পরম আনন্দ। এ আনন্দ, অবিমিশ্র আনন্দ। ভক্ত হৃদয় নিমজ্জিত হলো ব্রহ্মানন্দে।

শচীদেবী হয়ে গেলেন আত্মহারা। তিনি প্রচুর দান সামগ্রী তুলে দিলেন

বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতে। গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলে দান করে চললেন গরিব-দুখিদের। সানন্দে অকাতরে প্রচুর ধনরত্ন বিতরণ করলেন গৌর-প্রিয়ার মঙ্গল কামনায়। যত দান করেন যেন ফুরায় না কিছুতেই। অক্ষয় ধনভাণ্ডার। কোষাধ্যক্ষ জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান। অতএব তা শেষ হবে কেমন করে।

আজ ফুলশয্যা নিমাইয়ের।

আজ রাতে গৌরাঙ্গের সঙ্গে গৌরাঙ্গীর হবে পরম মিলন। নদীয়াবিনোদ রসাস্বাদন করবেন বিনোদিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার তুষ্টি সাধন করে। একই অঙ্গে দুই রূপ। দুয়ে মিলে এক। রাধাভাব দ্যুতিসুবলিত তনু। রসবল্লভা বললেন— 'তোমার গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে।' তোমার তুষ্টি বিধানই ত আমার পরম ব্রত।

আনন্দে আত্মহারা আজ কাঞ্চনা আর অমিতপ্রভা। দুসখী বিষ্ণুপ্রিয়ার। তারা এসেছে প্রিয়ার সাথেই। সাজাতে বসল প্রিয়াকে তারা। সুকোমল চিরুণী দিয়ে উভয়ের চিকণ কুন্তল দিল বেঁধে। রঙ্গণ, মালতী যূথী, পারুল, বকুল প্রভৃতি বিবিধ ফুলের মালা দিয়ে সজ্জিত করে তুলল উভয়ের বরতনু। কেউ মণিমুক্তার হার গেঁথে লম্বিত করল বক্ষদেশে। কুঙ্কুমে চন্দন মিশিয়ে শ্রীঅঙ্গে দিল লেপন করে। যে যার রুচিমত সেবা আরম্ভ করল গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়াকে। কোন সখীরা গৌরাঙ্গের রূপ দেখে আনান্দে আত্মহারা হয়ে গেয়ে উঠল গান, অন্য সখীরাও তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাল।

"সখি হে, ওই দেখ গোরা কলেবর।
কত চন্দ্র জিনি মুখ সুন্দর অধর॥
করিকর কর জিনি বাহু স্ববলনি।
খঞ্জন জিনিয়া গোরা নয়ন নাচনি॥
চন্দন তিলক শোভে সুচারু কপালে।
আজানুলম্বিত বাহু বনমালা গলে॥
কম্বু কণ্ঠ পীন পরিসর হিয়া মাঝে।
চন্দনে শোভিত কত রত্নহার সাজে॥
রামরম্ভা জিনি উরু অরুণ বসন।
নখমণি জিনি পূর্ণ ইন্দু দরশন॥
বাসু ঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল॥"

হাস্য, গীত আর নৃত্যে সখীরা যুগল তনু এমনি করে সাজাল ফুল শয্যার সাজে। এবার তারা পাঠাবে প্রিয়াকে পুষ্প বাসরে। পাঠাবে রসময়কে রসসিক্ত করতে। আহ্লাদিনী যাবে পরমপুরুষকে আহ্লাদিত করতে।

পুলকচঞ্চলা সুরধুনী। বইছে মৃদুমন্দ সমীরণ। আমোদিত বনস্থলী। চন্দনগন্ধা রজনী। মাঝে মাঝে কোকিলের কুহু রব।

পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হলো পুষ্পবাসরে। বইল ফুলের উচ্ছ্বাস। ঘর বার ভরে উঠল স্নিগ্ধ গন্ধে। গুরুজনরা এসে আশীর্বাদ করলেন যুগলতনু গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়াকে। তারা শুভ কামনা জানালেন, সার্থক হোক এ মিলনোৎসব।

সখীরা পৌঁছে দিল উভয়কে পুষ্প-বাসরের দ্বারপ্রান্তে।
বিষ্ণুপ্রিয়া ভিতর থেকে করল ধীরে ধীরে অর্গল বন্ধ।
'জয় গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া।' জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল সখীবৃন্দ।

কয়েকটা দিন বেশ আনন্দেই কাটল।

শচীদেবীর মনে কোন দুঃখই নাই। বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে বেশ সুখেই আছেন। আত্মীয় পরিজনে ঘর ভরে আছে তার। আর কোন কিছু করতে ইচ্ছে হয় না। প্রিয়াকে কাছ ছাড়া করতে চান না মোটেই। একটিও কন্যা নাই তার। পর পর আটটি কন্যা এসেছিল তার কোলে। এমন হতভাগ্য তিনি তার একটিও রইল না। তাই কন্যা স্নেহ যেন উথলে উঠছে তার। কিছুতেই কাছ ছাড়া করছেন না প্রিয়াকে।

মাকে ছেড়ে আসার দুঃখ বিষ্ণুপ্রিয়া মনেই করছে না। স্নান, খাওয়া-দাওয়া, সব তিনি নিজেই করাচ্ছেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও ছোট্ট মেয়েটির মত ঘুরছে সদা সর্বদা পিছনে পিছনে। শচীদেবীর পাতে না হলে খায় না কিছুতেই। শচীদেবী কোলে করে খাইয়ে দেন প্রিয়াকে। আদর করে প্রিয়াও খাইয়ে দেয় মাকে। ভারী খুশি হয়ে উঠেন শচীদেবী।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই সনাতন নিজে এসে হাজির। মেয়ে জামাইকে জোড়ে নিয়ে যাবেন তিনি। পুনর্যাত্রা, ফেরৎ জামাই করতে হয় না। সনাতন সে জন্যই ত এসেছেন। সঙ্গে এনেছেন তিন চারটে ভার। কত খাদ্য দ্রব্য! মিঠাই মণ্ডা, শিখরিনী, দধি, দুগ্ধ, মাঠা, পায়স, মাখনি, সব, খণ্ডসার। আর—

'ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাহা ধরি॥' —চৈ. চ.

ফলমূল এনেছেন বিবিধ প্রকার। কোনকিছু বাদ রাখেন নি সনাতন। নতুন ধুতি চাদর, মেয়ের জন্য শাড়ী আর শচীদেবীর জন্য এনেছেন শান্তিপুরের পাড়হীন বিধবার সূক্ষ্ম বস্ত্র।

শচীদেবী বৈবাহিক মহাশয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন—'হিন্দুদের চিরাচরিত প্রথা, সে ত মানতে হবেই। মেয়ে জামাইকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবেন। তাতে আর আমি আপত্তি করব কেন। বিশ্রাম, খাওয়া-দাওয়া করুন। তারপর ওসব কথা হবে।'

সনাতন শচীদেবীর কথা শুনে ভারী খুশি হলেন। বললেন—'আমার গৌরহরি কোথায় ?'

—'সে ত সেই সকালেই বেরিয়ে গেছে টোলে। এই ত ফেরার সময় হয়ে এলো। বুঝলেন, বিদ্যে পাগল ছেলে। একদিনও টোল কামাই করতে চায় না।'

'সে ত খুব ভাল কথাই। অত বড় পণ্ডিত। সারা দেশে নিমাইয়ের নামে জয় জয় ধ্বনি উঠছে, সে কি অমনি।' জামাই-গর্বে সনাতন গর্বিত হয়ে উঠেন।

বিদায়ের মুহূর্তে শচীদেবী নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। বললেন—'আজকে ঘর আমার শূন্য হয়ে গেল। আমি একা থাকব কেমন করে এ অন্ধকার ঘরে। আমি শিগ্‌গির কিন্তু ফিরিয়ে আনব।' চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল শচী মায়ের।

কোমলপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া মাকে প্রণাম করতে গিয়ে কেঁদে ফেললো। বুকে জড়িয়ে ধরলেন প্রিয়াকে। একদিনেই শচীমাকে বড় আপন করে নিয়েছে প্রিয়া। দ্রবীভূত হয়ে উঠল তার অন্তর।

মেয়ে জামাইকে নিয়ে সনাতন বেরিয়ে পড়লেন। দোলা তাঁর প্রস্তুত ছিল। মালিনী সই, সীতাদেবী আর শচীমাতা তাকিয়ে রইলেন পথের দিকে। অপলক দৃষ্টিতে।

একে একে সবাই চলে গেছে। কতদিন আর থাকবে ওরা। সকলের ঘর-সংসার ত আছে। সীতাদেবী নৌকো করেই চলে গেছেন শান্তিপুরে। অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্ব যারা এসেছিলেন, তাঁরাও ফিরে গেছেন যে বার ঘরে। মালিনী সইকেই এতদিন আটকিয়ে রেখেছিলেন শচীমাতা। তিনিও চলে গেলেন আজ অপরাহ্ণে।

এখন একদম ফাঁকা চতুর্দিক। সব যেন কেমন নীরব নিরানন্দময়। একটা দারুণ অবসাদ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে শচীমায়ের সারা অন্তরকে। ঘরে নিমাই নেই। বিষ্ণুপ্রিয়াও নেই। নেই অতিথি অভ্যাগত কেউই। একা একা দিন যেন আর কাটতে চায় না।

খুঁটি পোতা হয়েছিল চন্দ্রাতপ টাঙানোর জন্য। তার গর্তগুলো এখনো ভরে যায়নি। সেগুলো কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন শচীমাতা।

এমন সময় নিমাই ফিরে এলো টোল থেকে। ও শ্বশুর বাড়ীতে থাকেনি বেশীদিন। দু'দিন থেকেই চলে এসেছে। টোল কামাই করলে চলবে কেন।

মাকে দেখে বাড়িয়ে দিলে পুঁথির দপ্তরটা।

'এই চলো, খেতে দেবে যে।' মাকে ডাক দিয়েই ঘরে ঢুকে গেল নিমাই।

বেশ কয়েকদিন পরে।

খেতে বসেছে নিমাই। শচী মা বসে আছেন সামনেই। জিগ্গেস করলে মাকে।

'আচ্ছা মা, গঙ্গা স্নান থেকে ফিরতে আজকাল কেমন যেন তোমার দেরী হয়। ব্যাপারটা কি বলো ত?'

কোন জবাব দেন না শচী মা। উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বলেন—'আর একটু মানচাকীর ঝোল দিই। শুকনো ভাত কেমন করে খাবি?'

'দেখ মা, তুমি বড্ড লুকোচ্ছ কিন্তু। এমন করলে ভাল হবে না বলছি।'

'কি ভাল হবে না রে, কি বলছিস্ তুই?'

'ঐ যে দিন দিন আত্মীয় বাড়ী যাও। তুমিই বলো না, যাওয়া কি ভাল?' নিমাইয়ের ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন শচীমাতা। অনেকটা অভিমান ভরে বললেন—"কি করি বল বাবা। ওকে না দেখলে যে থাকতে পারি না কিছুতেই। তাই ত স্নানের পথে একবার দেখে আসি বৌমাকে।'

'তা, এত যদি তোমার মন খারাপ করে, তাহলে নিয়ে এলেই পার।' খেতে খেতে জবাব দিলে নিমাই।

এ কথাটা এতদিন তিনি বলতে পারছিলেন না নিমাইকে। কি জানি ছেলে যদি কিছু ভাবে। কিংবা বৌমার বাবা যদি না পাঠান। হাজার হোক অত বড়লোকের মেয়ে, বললে কি আর দেবেন পাঠিয়ে। এমনি কত কথাই

না ভেবেছেন। এখন নিমাই যখন বলছে, ভারি খুশি হয়ে উঠলেন শচীমাতা। বললেন—

—'তাহলে নিমু কালকেই যা। গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আয় বৌমাকে।' হাসতে হাসতে নিমাই বললে—'তুমি যখন বলছ, তাই কালকেই না হয় আনব।'

॥ কুড়ি ॥

শচীমা এখন ভারী খুশি। বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরের দিনই নিমাই এনেছে সঙ্গে করে। সঙ্গে এসেছে কাঞ্চনা, অমিতা—দু'জনেই। শচীর বাড়ী আবার ভরে উঠেছে আনন্দে। শচীর সংসার আর কোথায়, সে ত গৌর-প্রিয়ার সংসার। এ ত সংসার নয়, দেবতার মন্দির।

প্রিয়াকে প্রায় কিছু কাজ করতে দেন না শচীমাতা। তবে দু'একটা ব্যঞ্জন শখ করে রাঁধেন প্রিয়া। তাতেই কত ভয় ওঁর। পাছে যদি বৌমা হাতটাত পুড়ে ফেলে। তখন কি সর্ব্বনাশটাই না হবে। অমন কচি বৌমা আমার, যন্ত্রনা কি সহ্য করতে পারবে। তখন সামলাবেন কেমন করে বৌমাকে শচীমাতা।

'তুমি মিথ্যে ভাবছ মা। আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়া সব কিছুই রান্নাবান্না জানে। কাঞ্চনা আশ্বাস দিয়ে বললো শচীমাতাকে।

—'আহা, জানে না, তাই কি বলছি। যদি হাতটাত পুড়ে ফেলে। নিমাই এলে জবাব দেব কি ?'

'আপনার অত ভয় করতে হবে না। রান্না জানলে, হাত পুড়বে কেমন করে। তা ছাড়া মেয়েদের রান্নাবান্না না করলে চলবে কেন।'

'আমি কি রান্না করতে নিষেধ করছি। আমি ত রয়েছি। যতদিন পারি, আমি রাঁধি। যখন না পারব, তখন তোমরাই ত রাঁধবে।'

'আসল কথাটাই বলো মা। তুমি কারো হাতে হেঁশেল ছাড়বে না এইটই হলো তোমার মনের কথা।' হাসতে হাসতে বলে উঠলো কাঞ্চনা। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াও উঠল হেসে।

'বুঝেছি, তোমাদের ভারী শখ হয়েছে রান্নার। শুনবে না ত রাঁধ তোমরা।' কৃত্রিম অভিমান ভরে রান্নাঘর ছেড়ে উঠে যান শচীমাতা।

'কাঞ্চনা, তুই ভারী দুষ্টু। দেখলি ত মা রাগ করে উঠে গেলেন। এখন কি করি বলত। আমার ভীষণ মন খারাপ করছে।'

'হ্যাঁ, মা রাগ করেছেন, না ছাই। দেখ না, এলেন বলে। আমাদের ছেড়ে উনি কি থাকতে পারবেন।' কাঞ্চনা সান্ত্বনা দেয় বিষ্ণুপ্রিয়াকে।

সত্যি সত্যি ক্ষণ পরেই ফিরে এলেন শচীমাতা। বললেন—'তোরা এখনো

রয়েছিস্ হে'সেলে। আগুনের তাপে অমন সোনার অঙ্গ একেবারে কালি করে ফেলেছিস্। কাঞ্চনা তোরা যা। জিরিয়ে নে বাইরে গিয়ে।'

'এই ত মা মোচার ব্যঞ্জনটা নামিয়ে নিই। তুমি বোস আমার কাছটিতে। দেখিয়ে দাও কতখানি লবন দেব।' বিষ্ণুপ্রিয়া আদর করে ডাকলে মাকে।

এবার ভারী খুশি হলেন শচীদেবী। বললেন—'তোদের জ্বালায় আর পারি না বাপু। দেখিস, মোচার ঘণ্ট ভাল করে রাঁধিস। আমার নিমাই ওটি খেতে বড্ড ভালবাসে।'

খেতে বসেছে নিমাই। কাছে বসে শচীদেবী। বিষ্ণুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে আছে দরজার আড়ালে। দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রভুর ভোজন। সতৃষ্ণ নয়নে। কি জানি কোনটা কেমন ভাবে খান। ভালমন্দ যদি কিছু মুখ ফুটে না বলেন। তাই বিষ্ণুপ্রিয়ার নজর নিমাইয়ের মুখভঙ্গির দিকে।

সহসা খেতে খেতে বলে উঠল নিমাই—'এ ব্যঞ্জনটা নিশ্চয়ই তুমি রান্না করেছ মা ?'

—'না না বউমা আজ সব নিজেই রান্না করেছে। দুসখিতে মিলে।'

—তবে বল, তুমি দেখিয়ে দিয়েছ ?

শচীদেবী একটু হেসে বললেন—'নারে, ওদের জ্বালায় আমি টিকতেই পারলাম না হে'সেলে। তবে ওরা ত নতুন, একটু দেখিয়ে না দিলে চলবে কেন।'

বিষ্ণুপ্রিয়া আর কাঞ্চনা মায়ের কথা শুনে মুখ টিপে হাসলে দুজনে। পরম পরিতৃপ্তিতে ভোজন করল নিমাই। মোচার ঘণ্ট দুবার চেয়ে নিলে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় ভরে উঠল তৃপ্তিতে। এমনি করে নিজে রান্না করে খাওয়াতে না পারলে স্ত্রীর আনন্দ কোথায়। তোমার তৃপ্তিতেই আমার তৃপ্তি, তোমার সুখেই ত আমার সুখ। 'তোমার গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে।'

প্রিয়ার নিজের বলে ত কিছু নেই। সব কিছুই সমর্পণ করে দিয়েছে সে নিমাইকে। নিমাই ছাড়া সে আর কিছু জানে না। নিমাই তার ইহকাল পরকাল।

কাঁঠাল গাছের শাখা থেকে ডেকে উঠে পাখী।
ভোরের পাখির কলকাকলি।

ঘুম ভেঙ্গে যায় বিষ্ণুপ্রিয়ার। ধড়ফড় করে উঠে পড়ে সে। পাশে তাকিয়ে দেখে প্রভু পাশ ফেরে এখনো ঘুমচ্ছেন। পাছে ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাই সহসা সতর্ক হয়ে উঠে প্রিয়া। গাত্রবাস ঠিক করে ঢেকে দেয় গায়ে। তারপর মাথায় ঘোমটা দিয়ে পরম ভক্তিভরে প্রণাম জানায় নিমাইয়ের চরণ যুগলে।

ধীরে ধীরে উঠে সন্তর্পণে অর্গল উন্মুক্ত করে বেরিয়ে আসে বাইরে। তখনো কেউ ওঠেনি। কাঞ্চনা, অমিতা—তারাও ঘুমুচ্ছে ওঘরে। ধীরে ধীরে শচীদেবীর গৃহের দরজায় দাঁড়াল বিষ্ণুপ্রিয়া। অর্গল বন্ধ কপাট। কান পেতে কি যেন শুনল প্রিয়া। এখনো তিনিও জাগেন নি। শুয়ে শুয়ে বিষ্ণুনাম করেন। কই সে শব্দ ত শোনা যাচ্ছে না।

সদর খুলে বাইরে বেরিয়ে এল বিষ্ণুপ্রিয়া। পূর্ব দিগন্ত হয়ে আসছে ফ্যাকাসে। ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই। বাইরের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলে—ঈশান উঠে পড়েছে, এবার সে জাব দেবে গরুকে।

দর ঘর উঠোন ঝাঁট দিতে আরম্ভ করল ঝাড়ু দিয়ে। বিষ্ণুমন্দির মার্জনা করল নিজ হাতে। তারপর তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসে বসলে বিষ্ণুমন্দিরে আল্পনা দিতে। বিষ্ণুচক্রে বিষ্ণুপদচিহ্ন অংকিত করল অভ্যস্ত নিপুণ হাতে।

এবার পুষ্প চয়ন।

সাঁজি হাতে নিয়ে বিষ্ণুমন্দিরের পিছনের বাগিচায় প্রবেশ করল ধীরে ধীরে। সদাস্নাতা প্রিয়া। আলুলায়িত-কুন্তলা। যেন প্রাতঃকালে সদ্য প্রস্ফুটিত তাজা একটি গোলাপ। ফুল বাগিচায় ফুলেব রাণী যেন।

চাঁপা কলির মত আঙুল দিয়ে এক একটি পুষ্প চয়ন করে সাঁজিতে রাখছে প্রিয়া। ধীরে ধীরে সাঁজি ভরে উঠল চয়নিত পুষ্পে। শেষে শিশির-ভেজা দূর্বা আর তুলসী তাও আহরণ করল।

ফিরে এসে দেখল প্রিয়া, উঠে পড়েছে সকলে। নিমাইয়ের প্রাতঃকৃত্যের জন্য গাত্রমার্জনী আর জলের গাড়ু ভরে রাখলো জল দিয়ে। দন্তধাবনের জন্য অষ্ট অঙ্গুলি পরিমিত নিম্ব শাখা, তাও সংগ্রহ করে ধরিয়ে দিল নিমাইয়ের হাতে। বললো—'তুমি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এসো। আমি যাচ্ছি মায়ের কাছে।'

নিমাই শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। ঠোঁটে খেলে গেল মৃদু হাসির রেখা।

পাড়ার লোকের মুখে মুখে শুধু বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম। এমন বউ আর হয় না। এমন বউ মেলা সত্যি ভাগ্যের কথা। যেমন রূপ, তেমন গুণ। অতবড় লোকের মেয়ে, কাজকর্ম জানে না, কে বলবে। অথচ বাপের বাড়ীতে কত

আদরেই না ছিল। সত্যি শচীমাতার ভাগ্য ভাল, তা না হলে এমন বৌমা কি সহজে মেলে।

পাড়ার কিশোরী মেয়েরা। যারা বিষ্ণুপ্রিয়ার সমবয়সী, তাদের মুখেও ধরে না প্রিয়ার সুখ্যাতি। কি সুন্দর মিষ্টি ব্যবহার বিষ্ণুপ্রিয়ার। সবাইয়ের গলা জড়িয়ে হেসে কথা বলে। কি মিষ্টি কণ্ঠস্বর। কথা বললে যেন সুধা ক্ষরে। শুনে শুনে আশ মেটে না কিছুতেই। ছোট ছোট কথা বলে। অনুচ্চ কণ্ঠে, ধীরে ধীরে। সকলেই যেন তার আপন বোন। পর বলে মনেই করে না কাউকে।

শচীদেবীর কানে এসব কথা আসে। গঙ্গায় নেয়ে ফেরার পথে পাড়ার মেয়েরা ওঁকে বলে সব। শুনে গর্বে ফুলে উঠে শচীদেবীর বুক। ভারী ভাল লাগে তার বৌমার প্রশংসা শুনতে। নিজেও তিনি গল্প করেন। বলেন—'আমার নিমাই আর বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখলে, মনে পড়ে নারায়ণ আর নারায়ণীর কথা। যেন দুজনেই রয়েছেন আমার গৃহ-মন্দিরে। আলোয় ভরে গাছে গৃহাঙ্গন।'

'সত্যি, আপনি ঠিকই বলেছেন আইমা। আমাদেরও তাই মনে হয়।'

এসব কথা পেটে রাখতে পারেন না শচীদেবী। এসে গল্প করেন নিমাইয়ের সঙ্গে। নীরবে সব শুনে নিমাই। স্মিত হেসে বলে—'আমি ত তোমার কোন সেবা যত্ন করতে পারিনি। কোন দিন যে পারব, সে ভরসাও নাই। কিন্তু যে আমার বাসনা পূর্ণ করবে, আমি তার কাছে চির ঋণী থাকব। তার কাছে চিরটা জীবন দেব বিকিয়ে। বুঝলে মা, তোমাকে যে সেবা করবে, তার ঋণ শোধ করতে পারব না কোন দিনই।'

আনন্দে ভরে ওঠে শচীদেবীর হৃদয়। এই ত নিমাই তার বৌমার প্রশংসা করছে। মনে মনে কতই না ভেবেছেন তিনি। কি জানি, নিমাইয়ের বৌমা পছন্দ হয়েছে কিনা। বৌমার কথা বললে কেমন যেন চুপ করে থাকত ও। এই ত আজ কেমন সুন্দর সুখ্যাতি করলে বৌমার। হ্যাঁ, করতেই হবে। তার মন যে বলেছে, বিষ্ণুপ্রিয়াই পারবে লক্ষ্মীপ্রিয়ার অভাব মেটাতে।

খুশি হয়ে বললেন—'দ্যাখ, লোকে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করে আনন্দ পায়। আমি আমার বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়াকে পেয়ে লাভ করেছি কোটিগুণ আনন্দ।'

অধ্যাপনা নিয়েই ব্যস্ত নিমাই।

সকালে স্নান আহ্নিক সেরে দুটি কিছু মুখে দিয়ে যায় মুকুন্দ সঞ্জয়ের টোলে। বেলা দ্বিপ্রহরে ফেরে গঙ্গায় স্নান করে। তারপর আহার করে একটু

বিশ্রাম। আবার অধ্যাপনা। ফেরে সেই ভর সন্ধ্যায় গঙ্গায় স্নান সেরে। একটু জলযোগ করে আবার ধরে টোলের পথ। ফিরতে হয়ে যায় অর্ধরাত্র।

যেন সব সময় ডুবে আছে অধ্যাপনা নিয়ে।

শচীদেবী ডুবে থাকেন কাজের মধ্যে। এই কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে ছন্দপতন হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে করেন। যেন তার কিছুই ভাল লাগে না। নিমাইকে বড় কাছে পেতে ইচ্ছে করে। নিমাইয়ের বিচ্ছেদ সে পারে না সহ্য করতে। কতটুকু সময় বা কাছে পায় সে।

বিরলে দু'টো যে কথা বলবে, সে অবসর কোথায়। রাতে ফিরেও কোন কথা হয় না। সারাদিনের ক্লান্তিতে নিমাই শুয়ে পড়লেই ঘুমিয়ে যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া পদসেবা করে। কখনো কখনো নিমাই অবশ্য সোহাগ ভরে টেনে নেয় বুকে। আলিঙ্গন করে বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে প্রিয়া। কোন কথা আর বলতে পারে না। মনের কথা মনেই থাকে রুদ্ধ হয়ে।

সেদিন সহসা ঘটল অঘটন।

বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে ফেললো হারিয়ে। পলক তার আর পড়ে না। ভাবতে ভাবতে নিমাইময় হয়ে গেল সে। এক রকম বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হল প্রিয়ার। এ যেন সেই শ্রীরাধিকার ভাব।

'জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো।
কেমনে পাইব সই তারে।'

নাম আর নাম। মধুমাখা অমিয় নিমাই নাম। নিমাই ছাড়া সে যে আর কিছুই জানে না। নাম করতে করতেই নামী আসে নেমে। নামের কাছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও হার স্বীকার করেছেন। বিকিয়ে দিয়েছেন নিজেকে। তাইত বৈষ্ণব পদকর্তা বলেছেন—

'শত ভার সুবর্ণ গো কোটি কন্যা দান।
তথাপি না হন কৃষ্ণ নামের সমান ॥'

এমনি নামের প্রতাপ। নাম স্মরণে ভক্তের কাছে নামীকে আসতেই হয়। তায় নিমাই থাকবে কেমন করে। গৌরাঙ্গীর টানে গৌরাঙ্গ উঠলেন কেঁপে। পড়াতে পড়াতে নিমাই কেমন যেন অনামনস্ক হয়ে গেল। কর্তব্যের কাঠিন্য থেকে নেমে এল প্রেমের পারাবারে। প্রিয়ার ডাকে হৃদয় তার হয়ে উঠল উদ্বেল।

টোল থেকে ছুটতে ছুটতে বাড়ী চলে এল নিমাই। এসে দাঁড়ালো বিষ্ণুপ্রিয়ার সামনে।

'ওগো, তোমার ডাকে আমি যে পাগল হয়ে ছুটে এসেছি। কই, কি বলবে বলো!'

প্রেমপূরিত দু'টি স্নিগ্ধ আঁখি তুলে নীড়ের শাবকটির মত তাকাল বিষ্ণুপ্রিয়া।

'তোমাকে না দেখে, আমি যে আর থাকতে পারছি না গো। তুমি আমায় কেমন করে ভুলে থাক? মিনতি করছি, আমাকে কষ্ট দিও না।'

প্রিয়ার দু'খানা হাত ধরে তুললে নিমাই। অনুরাগ ভরে বললে—'দেখো প্রিয়া, তুমি ত আমার দেহ, মন, প্রাণ। আমার আত্মা, আনন্দ, তৃপ্তি। আমি কি কখনো তোমাকে ভুলতে পারি। তুমি এত অবুঝ হয়েছ কেন?'

দেহের পরশে তৃপ্তির সুধা-ধারায় প্রিয়া হলো অভিসিঞ্চিত। যেন অনেকটা বাহ্য জগতে ফিরে এল সে। বড্ড লজ্জা হল তার। সুন্দর মুখখানা হয়ে উঠল আরক্তিম। দু'টি চোখ নেমে এল পদযুগলে।

নিমাই স্নেহভরে বললে—শত শত ছাত্রকে পড়াতে হয়। তারা চেয়ে থাকে আমার পানে। তাই আমি ত থাকতে পারি না তোমার কাছে। তুমি-ই বলো, কর্তব্য কর্মে কি অবহেলা করতে আছে?'

প্রিয়ার মুখ দিয়ে একটিও কথা ফুটল না। তেমনি তাকিয়ে রইলে নিমাইয়ের পদযুগলের দিকে।

'কই গো, অনুমতি দাও। আমি এখন আসি।'

অনুমতি প্রার্থনা করে নিমাই দাঁড়িয়ে রইল বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মুখে। যেন একটু অভিমান হল প্রিয়ার। নিমাইয়ের দু'চরণ জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে।

'ছিঃ, অমন করে কাঁদে না। আমি ত সন্ধ্যাতেই ফিরে আসব। ওরা যে আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে।'

কিছুতেই ছেড়ে দিতে মন চায় না প্রিয়ার। কিন্তু তবুও ছেড়ে দিতে হয়। বাঁধা যায় না মায়ার বাঁধনে। ধরে রাখতে চাইলেই কি আর সব কিছু ধরে রাখা যায়। তাহলে কি বিষ্ণুপ্রিয়া অধরাকে ধরতে চাইছে মায়িক বন্ধনে।

একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বিষ্ণুপ্রিয়ার। সে দিল নীরব সম্মতি।

নিমাই তার করুণামাখা দু'টি দৃষ্টি মেলে তাকাল প্রিয়ার দিকে। ওষ্ঠাধরে দেখা দিল মৃদু হাস্য-রেখা। তারপর চললে টোলের পথে

বিষ্ণুপ্রিয়া তাকিয়ে রইল পলকহীন দু'টি চক্ষু মেলে। নিমাই একবারও ফিরে তাকাল না প্রিয়ার পানে।

॥ একুশ ॥

ঈশ্বরপুরী নিমাইকে দেখে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন স্থির দৃষ্টিতে। বেশ ক্ষণিকক্ষণ। যেন অদ্ভুত কিছু একটা দেখেছেন। অদৃশ্য কোন একটা বস্তু যেন স্পর্শ করে দেখার চেষ্টা করছেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বাক্যস্ফূর্তি হল তাঁর। যেন আকুলি-বিকুলি করে বলে উঠলেন—'এ-এ কে? কি আশ্চর্য, এ কাকে আমি দেখছি। সত্য পরিচয় দাও—তুমি কে? তোমাকে দেখামাত্র আমার দেহে এমন পুলক শিহরণ জাগল কেন, কেন এমন হর্ষরোমাঞ্চে ভরে উঠছে সারা দেহ। যেন মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। তুমি আমার চিরকালের। মনে হচ্ছে তুমিই আমার ইষ্ট।'

আবেগ ভরে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলে উঠলেন ঈশ্বর পুরী।

নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্যের বাড়ীতে এসেছেন পুরীজী। রোজ সকালে গদাধরকে কৃষ্ণলীলার পুঁথি পাঠ করে শোনান। তাই শুনে নিমাই এসেছে আচার্যের বাড়ীতে।

'তুমি শুনবে আমার পুঁথি?'

'সে জন্যই ত এসেছি। শুনব না কেন।'

'তা হলে শোন। পাঠ করছি। কিন্তু একটা কথা—'

'কি কথা?'

'তুমি ত বিরাট পণ্ডিত। আমার লেখায় ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি কোথাও থাকে তা হলে কিন্তু বলে দিতে হবে।' ঈশ্বর পুরী যেন অনুনয় করে বললেন।

'এ কেমন কথা বলছেন আপনি? ঈশ্বর-কথায় আবার দোষ। কৃষ্ণকথার দোষ ধরে এমন সাধ্য আছে কারো। আবার ভক্ত কণ্ঠে কৃষ্ণ নাম। তা সে যেমনই হোক। সে ত অমৃত সমান।' শান্ত নম্র কণ্ঠে নিমাই বললে।

'না, দেখো, আমি ঠিক তা বলছি না। অনেক দিন ধরে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিয়ে একখানা পুঁথি লিখেছি। কিন্তু সেই বিরাট পুরুষ, সাক্ষাৎ-ব্রহ্ম-বৃত্তান্তের যেন কূল খুঁজে পাচ্ছি না। ভয় হয়, তাঁর লীলা-কীর্তন করতে গিয়ে পাছে তাঁকে ছোট করে ফেলি। বলতে গেলে আমি অনেকটা দৈব নির্দেশেই এখানে এসেছি।

কেন জানি না, তোমাকে দেখামাত্র এক বিপুল উদ্দীপনা অনুভব করছি। হৃদয়ে অসম্ভব প্রেরণা পাচ্ছি। আমার মন বলছে তুমিই এর উত্তম শ্রোতা। শ্রেষ্ঠ পাঠক। তোমার দেহই এই অমৃততত্ত্বের উত্তম আধার।'

মূর্খ বলে 'বিষ্ণায়', কিন্তু পণ্ডিতে বলে 'বিষ্ণবে'।

হেসে বললে নিমাই—'কিন্তু তা নিয়ে বিষ্ণু কিন্তু কোন তারতম্য বিচার করেন না। শুদ্ধ-অশুদ্ধ, সব ভাবই তিনি গ্রহণ করেন। তাই ত তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দন।

'মূর্খে বোলে বিষ্ণায় বিষ্ণবে বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥' চৈ. ভা.

নিমাইয়ের কথা শুনে ভারী খুশি হলেন ঈশ্বর পুরী। তিনি পাঠ করতে আরম্ভ করলেন তাঁর কৃষ্ণলীলার পুঁথি। নিমাই শুনছে মনোযোগ দিয়ে। কি সুন্দর আবেগময় ভাষায় লিখেছেন পুরীজী। শুনতে হৃদয় দ্রবীভূত হয়। হৃদয়ে জেগে ওঠে ভক্তিভাব। ভক্ত না হলে ভগবানের কথা এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় কেউ লিখতে পারে, না লেখা সম্ভব।

কিন্তু দোষ-ত্রুটির কথা আবার তুললেন ঈশ্বর পুরী। বললেন—'কই নিমাই, তুমি কিছু বলছ না কেন?'

'ঐ ত বললাম, কৃষ্ণের কথায় আবার দোষ কোথায়? তায় আপনার মত ভক্তের লেখা।' ভাবে গদগদ হয়ে নিমাই বললে।

'তবু কিছু বলো। না বললে যে শান্তি পাচ্ছি না। অন্ততঃ ব্যাকরণের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা।'

এবার নিমাই পুরীজীর দিকে মুখ তুলে তাকালো। শান্ত মৃদু নম্র কণ্ঠে বললে—'আপনি যে ধাতুর কথা বলছেন, এটি আত্মনেপদী হবে কি, পরস্মৈপদী বলে ত মনে হচ্ছে।'

ঈশ্বর পুরী কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। তক্ষুনি কোন জবাব দিলেন না। ভাবতে লাগলেন সারাদিন, সারা রাত। শেষে স্থির করলেন, না, তিনি ত ভুল করেন নি। ও ধাতু আত্মনেপদীই হবে। কোন মতেই পরস্মৈপদী হতে পারে না।

ছুটলেন নিমাইয়ের কাছে। দেখিয়ে দিলেন নিমাইকে। ধাতু পরস্মৈপদী নয়, আত্মনেপদী।

এই প্রথম বুঝি হার স্বীকার করল নিমাই। বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই তার।

কোন কুণ্ঠা থাকার কথাও নয়। ভক্তের কাছে ভগবানের হার স্বীকার করতে কুণ্ঠা ত থাকার কথা নয়। ভগবানই ত হন ভক্তের দ্বারস্থ।

নিমাই কিন্তু মনে মনে ভাবতে লাগল, আত্মপদ ত অহংকারের পদ নয়—পরপদ। আর পর পদই পরমপদ। এই পরমপদই ত জীবের একমাত্র আশ্রয়।

কে এই ঈশ্বর পুরী?

সংসার আশ্রমে বাড়ী ছিল, হালিশহরের কাছে কামারহাটি গ্রামে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। এইটুকুই যথেষ্ট। সন্ন্যাসীর আবার পরিচয় কি? পরিচয় দিতে ও মানা। তবে তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য।

সেই মাধবেন্দ্র। যাঁকে স্বয়ং ব্রজের গোপাল দুধ খাইয়েছিলেন ভাঁড়ে করে। যার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছিলেন। মাধবেন্দ্রই ত লৌকিক লীলায় নিমাইয়ের পরমগুরু। মহাপ্রেমিক মাধবেন্দ্র পুরী।

'মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অকথ্য কথন।
মেঘ দেখিলেই তিনি হন অচেতন॥'

হেঁটে বেড়াতেন ঘুরে ঘুরে সারা ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে। সেবার এসেছেন ব্রজভূমে। ঘুরতে ঘুরতে নেমে এল সন্ধ্যা। তখন তিনি গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করে হাজির হয়েছেন গোবিন্দ কুণ্ডের ধারে। সারা দিনটা কোথাও কিছু জোটে নি। রয়েছেন অনাহারে। সে জন্য তাঁর কোন কষ্টই হয়নি। বসে পড়লেন গোবিন্দ কুণ্ডের পাশেই। আরম্ভ করলেন ভগবানের নামগান। ওতেই মিটবে ক্ষুধাতৃষ্ণা।

এমন সময় কোথা থেকে এক গোপাল বালক এসে হাজির। বললে—'তা গোসাই, খুব ত নাম গান হচ্ছে। খালি নামগানে কি পেট ভরবে। এই নাও, তোমার জন্য এনেছি এক ভাড় দুধ। খেয়ে ফেল। আমার বাড়ী এই পাশের গ্রামে। যাচ্ছি গাভী দোহন করতে। খানিক পরে এসে নিয়ে যাব ভাড়।'

মাধবেন্দ্র নাম গানেই বিভোর। কোন জবাব দেবারই অবসর পেলেন না। গোপ বালক চলে গেল তার নিজের পথেই।

মাধবেন্দ্র দুধ পেয়েই এক চুমুকেই পান করলেন। কি মিষ্ট দুধ। যেন ক্ষুধা, তৃষ্ণা এক মুহূর্তেই মিটে গেল তাঁর। ভাঁড়টি কাছে রেখে বসে রইলেন তিনি। অপেক্ষা করতে রইলেন, গোপ-বালকের জন্য। শুধু শুধু বসে থাকব কেন, ততক্ষণ তাঁর নাম কীর্তন করি।

কিন্তু কই, বালক ত এখনো এলো না?

কীর্তন করতে করতে সেই গোবর্দ্ধন কুণ্ডের পাশেই ঘুমিয়ে পড়লেন

মাধবেন্দ্র পুরী। স্বপ্ন দেখলেন শেষ রাতে। এসেছে সেই বালক। হাত ধরে নিয়ে এল এক কুঞ্জে। বললে—'আমি কে জান?'

তা কেমন করে জানব বলো?

ভারী মিষ্টি হাসি হেসে বললে বালক—'আমিই ত এই গোবর্দ্ধনের অধিপতি। আমার নাম—গোপাল।

'ত-ত, তুমি!' অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন মাধবেন্দ্র।

'জানো, আমার না ভারী কষ্ট হচ্ছে। আমার সেবক ম্লেচ্ছর ভয়ে লুকিয়ে রেখেছে এই কুঞ্জের মধ্যে। কিন্তু সে আর আসে নি।'

'কষ্ট, কিসের কষ্ট বাবা?'

'কেন, তুমি কি বুঝতে পারছ না। আমি ছেলে মানুষ। একা একা হেথায় থাকি কেমন করে বলত। তারপর কি ভীষণ রোদ, ঝড়, বৃষ্টি। জানো, আমার বড্ড ভয় করে।'

'তা, তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি বলো?'

'কেন, তুমিই ত সব পারো। আমি ত তোমার জন্যই বসে রয়েছি। তুমি এই কুঞ্জ থেকে নিয়ে চল আমাকে। সেবা-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করো। কেন, পারবে না?'

ঘুম ভেঙ্গে যায় মাধবেন্দ্রর। ধড়ফড় করে উঠে বসেন। দেখেন, ভোর হয়ে গেছে। উঠে পড়লেন জড়তা ঝেড়ে। ডাকলেন ব্রজবাসীদের। তাদের সঙ্গে নিয়ে পাতি পাতি করে খুঁজতে লাগলেন, চারিদিকের ঝোপঝাড়। শেষে খুঁজে পেলেন এক দুর্ভেদ্য জঙ্গলে বাল গোপালের শ্রীবিগ্রহ। মাধবেন্দ্র ভারী খুশি হয়ে উঠলেন। উদ্ধার করলেন ঝোপঝাড় কেটে। আর ব্রজের গোবর্দ্ধন পর্বতের উপরেই প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীগোপাল বিগ্রহকে। লাগিয়ে দিলেন সেবা-পুজো।

বেশ কিছুদিন পরে। আবার একদিন স্বপ্ন দেখলেন মাধবেন্দ্র। রাতে গোপাল বলছে—'দেখো মাধব, তুমি ত আমার জন্য অনেক করেছ। সেবা পুজোও প্রাণপণে করছ। তবু কি জান, আমার দেহটা কেমন যেন পুড়ে যাচ্ছে। কই এখনো ত শীতল হলো না।'

'তা কি করতে হবে, তাইত বলবে।'

'আমার কি মনে হয় জান মাধব, যদি মলয় চন্দন মাখাতে, তাহলে বুঝি দেহটা শীতল হতো। তুমি দাও না আমায় মলয় চন্দন!'

ভারী আব্দার ত তোমার। এত রাতে আমি মলয় চন্দন পাবো কোথায়?'

'কেন যাওনা নীলগিরিতে। সেখানে গেলেই পাবে।'

মাধব নিরুত্তর। কোন বাক্য সরে না তাঁর মুখে। ভাবতে পারে না কি উত্তর দেবে মাধব।

'কি গো, কথা বলছ না কেন। বলো, আমায় এনে দেবে ত?' আবদারে আর অভিমানে কেমন যেন ছলছল করে উঠল গোপালের দু'চোখ।

'যাও, এখন ঘুমিয়ে পড়ো। সকাল হোক, সে তখন কাল দেখা যাবে।'

'দেখা যাবে নয় মাধব, আমাকে কাল এনে দিতেই হবে।'

ঘুম ভেঙ্গে যায় মাধবেন্দ্রর। তক্ষুনি সে ধরল নীলগিরির পথ। কোথায় বৃন্দাবন আর কোথায় পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নীলগিরি পর্বত। মাধবেন্দ্র চললেন হেঁটে হেঁটে।

চলতে চলতে, কতদিন পরে শেষে এসে হাজির হলেন শান্তিপুরে। উঠলেন অদ্বৈতের বাড়ীতে। পুরী গোস্বামীর দেহে প্রেমাবেশ দেখে আচার্যদেবের আনন্দ আর ধরে না। বললেন—'পুরীজী, আমাকে তুমি দীক্ষা দিয়ে যাও।'

মাধবেন্দ্র দীক্ষা দিলেন অদ্বৈত প্রভুকে। তারপর তিনি আবার চলতে লাগলেন। সোজা দক্ষিণে। উৎকলের পথে। নীলগিরির উদ্দেশ্যে। চলতে চলতে এলেন রেমুনায়। বালেশ্বরের একটি গ্রামে।

রেমুনায় প্রতিষ্ঠিত আছেন গোপীনাথ। মাধবেন্দ্র দর্শন করলেন সেই গোপীনাথকে। জিগ্গেস করলেন সেবকদের, কি দিয়ে হয় গোপীনাথের ভোগ। তারা দিলে ভোগ রাগের বিরাট ফিরিস্তি। তবে সন্ধ্যায় যে ভোগ হয়, তাকে বলে অমৃতকেলি।

মাধবেন্দ্র জিগ্গেস করলেন, 'সে আবার কি জিনিস?'

সে এক অপূর্ব ক্ষীর। গোপীনাথের ক্ষীর নামে এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধ। দ্বাদশ পাত্রে প্রতি সন্ধ্যায় গোপীনাথকে নিবেদন করা হয় এই ক্ষীর। আহা, এমন একটু ক্ষীর যদি পেতাম। দেখতাম আস্বাদন করে। আমি তাহলে আমার গোপালকেও নিবেদন করতাম এমন অমৃতকেলি। কি জানি এর স্বাদ-গন্ধ কেমন। এরা ত বলছে অপূর্ব।

পরক্ষণে আত্মধিক্কারে ভরে উঠল মাধবেন্দ্রর মন। ছিঃ, ছিঃ, এ কি আমার লোভ। আমি কি শেষে অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করলাম। আমি না সন্ন্যাসী, আমার মধ্যেও জেগে উঠল লোভ। না, না, এস্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়!

মাধবেন্দ্র পুরী সত্যি সত্যি মন্দির ত্যাগ করে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে চলে গেলেন। কাউকে কিছু বললেন না। এসে বসলেন গ্রামের হাট-চালিতে। আজকে ত আর হাটবার নয়। হাট তাই জন-মানব-শূন্য। নির্জন হাটচালাতে বসে বসে গোপালের নাম কীর্তন করছেন।

এদিকে সন্ধ্যায় ভোগ দেখিয়ে গোপীনাথের পূজারী মন্দিরে গোপীনাথকে শুইয়ে চলে গেছে ঘরে। মন্দিরের দরজা বন্ধ করে চাবিতালা দিয়েছে লাগিয়ে। নিজের ঘরে পূজারী ঘুমাচ্ছে নির্বিঘ্নে।

এমন সময় স্বপ্ন দেখল পূজারী। 'এই ওঠ, আমার ঘরের দরজা খোল। আমার ভক্ত মাধবেন্দ্র, তার জন্যে আমি এক ভাঁড় ক্ষীর চুরি করে রেখেছি। যাও তাকে দিয়ে এস। সে শূন্য হাটে একা বসে আছে।'

পূজারী অবাক। একি স্বপ্ন, না সত্যি। জিগ্‌গেস করল—'কোথায় ক্ষীর, কি বলছ তুমি। আমি ত বার পাত্র অমৃতকেলি নিজেই সরিয়ে এনেছি।'

'না না, আমার মায়ায় তোমার চোখে পড়েনি সবগুলো। তুমি এস না, এই ত আমার ধড়ার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি একপাত্র অমৃতকেলি।'

আস্তেব্যস্তে উঠে পড়ল পূজারী। ছুটল মন্দিরের দিকে। দরজা খুলে প্রদীপের আলো নিয়ে এগিয়ে গেল গোপীনাথের ধড়ার দিকে। কি আশ্চর্য, সত্যি ত গোপীনাথের বস্ত্রাঞ্চলে লুকান রয়েছে পূর্ণ ক্ষীরের ভাণ্ড।

ক্ষীরের ভাণ্ড নিয়ে ছুটল পূজারী। রাতের অন্ধকারে এল শূন্য হাটে। চারিদিকে ছোট ছোট অসংখ্য হাটচালা। অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। কোথায় খুঁজবে পূজারী কিছু ঠিক করতে পারলে না। ডাক দিলে উচ্চ কণ্ঠে—'মাধবপুরী, কোন চালায় রয়েছ? শিগ্‌গির বেরিয়ে এস। তোমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করে এই আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এসো, নিয়ে যাও।'

কোন সাড়াশব্দ নাই। কে মাধবেন্দ্র পুরী? তাহলে একি শুধু স্বপ্নই। কিন্তু তাই বা কেমন করে হয়? এই ক্ষীরের ভাণ্ড। এ কেমন করে গেল গোপীনাথের ধড়ার ভিতরে।

সহসা চমকে উঠল পূজারী। সামনে অন্ধকারে কে এসে দাঁড়াল এই সৌম্যপ্রশান্ত মূর্তি? ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে বললে—'আমিই মাধব। কই, আমার গোপাল ভোগ কোথায়?'

রাতের অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পেল পূজারী প্রেমাশ্রুতে চকচক করে উঠছে মাধবেন্দ্রের দু'চোখ। ভক্তি আর শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ল পূজারীর মাথা। সে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করল মাধবেন্দ্রকে।

এমনি ভক্ত না হলে কি গোপীনাথ চুরি করেন। ভক্তের জন্যই কলঙ্কের ডালি তিনি মাথা পেতে নেন। তাইত 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' এ কলঙ্ক আজো তাঁর ঘুচল না।

ঈশ্বর পুরী হলেন এই মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। কৃপাধন্য তাঁর। সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। কোন বাহ্য-জ্ঞান থাকে না তার। তিনি কৃষ্ণময় দেখেন সর্বচরাচর।

এমন কৃষ্ণপ্রেমিক পেয়ে নিমাই ভারী আনন্দিত। নিত্য সঙ্গ করে তাঁর। শুনে কৃষ্ণকথা। আস্বাদন করে কৃষ্ণনাম। ভাবে, আমি চাই না ব্রহ্মে লীন হতে। আমি চাই ভালবাসার মাধুর্য উপভোগ করতে। আমি মক্ষিকার মত চাই আস্বাদন করতে। চাই না মধুপাত্রে নিঃশেষ হতে। নিজের ভাবে নিজেই কেমন যেন তন্ময় হয়ে যায় নিমাই।

॥ বাইশ ॥

১৪৩০ শকাব্দ।

দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে প্রায় দু'বছর হতে চললো। ১৪২৮ শকাব্দে বিয়ে হয়েছিল নিমাইয়ের। সেটা বৈশাখ মাস। বিষ্ণুপ্রিয়া এসেছে তার সংসারে। কিন্তু তবু নিমাই কেমন যেন উন্মনা। মনটা তার বিষাদে আচ্ছন্ন। সংসারটা কেমন যেন মনে হয় অনিত্য।

সেদিন টোল থেকে ফিরে এসে বললে মাকে।

'মা, এ সংসার ত অনিত্য। কখন কি হয় কে বলতে পারে বলো।'

'এসব কথা কেন বলছিস নিমাই।' অজানা আশংকায় শচীদেবীর হৃদয়টা কেমন যেন দুরু দুরু করে ওঠে।

'জানো মা, বাবা ত আমায় কত ভালবাসতেন। আমি তার জন্য কিছুই করতে পারিনি। মাঝে মাঝে মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা। কত না কষ্ট দিয়েছি তাকে। আমার দুরন্তপনায় পাড়ার লোকে ত অস্থির হয়ে উঠত। তারা এসে নালিশ জানাত বাবাকে। কত তিরস্কার করত বাবাকে শুনিয়ে। বড্ড রাগ হত তার। কিন্তু আমায় পেতেন না ঘরে খুঁজে। অভিমানে দুঃখে খুঁজতে বের হতেন। খুঁজে বেড়াতেন গাঁয়ের পথে পথে। গঙ্গার পারে ধারে।'

অশ্রু সজল হয়ে উঠে মায়ের দু'চোখ। বলেন—'আজকে আবার এসব কথা বলছিস কেন?'

নিমাইয়ের কণ্ঠও কেমন যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। ধরা গলায় বলে—'জানো মা, বড্ড কষ্ট হয়। যদি আজ তিনি বেঁচে থাকতেন। কত আনন্দ হ'ত তাঁর বলত। আমি তার চরণ সেবা করতাম। জানো মা, আমি ত বাবার আদর যত্ন কিছুই পাইনি।'

বলতে বলতে নিমাই কেঁদে ফেললো। পুত্রের চোখে জল দেখে শচী-দেবীও নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ব্যাকুল হয়ে আকুল কণ্ঠে বলতে লাগলেন—

'দ্যাখ, অমন করে দুঃখ করিসনে নিমাই। আমার হৃদয়টা শোকে দুঃখে

ভেঙ্গে পড়েছে। ওরে আমি পাগল হয়ে গেছি। বেঁচে আছি কেবল তোর মুখ চেয়ে। সব ভুলে আছি তোকে দেখে। নারে নিমাই, ওসব কথা আর মনে করিয়ে দিসনে। আমি ওসব ভুলে থাকতে চাইরে।'

নিমাই কেমন যেন চুপ করে থাকে। সহসা কিছু বলতে পারে না। কান্নার বেগটা একটু সামলে নিয়ে বললে—'জানো মা, আমি গয়া যাব ঠিক করেছি। শুনেছি গয়াতে গিয়ে বিষ্ণুর পাদপদ্মে পিণ্ড দিলে নাকি পিতৃপুরুষের আত্মার মুক্তি হয়। তুমি আমাকে গয়াধামে যেতে অনুমতি দাও মা।'

শচীদেবীর মনটা কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল। গঙ্গার কতকগুলো খ্যাপা ঢেউ যেন আছড়ে পড়ল প্রবল বেগে। একি বলছে নিমাই। একি প্রস্তাব দিচ্ছে তার কাছে। এযে বিচ্ছেদের বার্তা। কি বলবেন তিনি। এ যে এমন কথা বলছে কি করে নিষেধ করবেন শচীদেবী। পিতৃপিণ্ড দিতে যাবে গয়াতে। তাহলে নিমাইকে না দেখে তিনি থাকবেন কেমন করে? কি করে কাটবে তাঁর দিন। নিমাইহীন সংসার, এ যে ভাবতেই পারছেন না তিনি।

বেদনার আর্তিতে, অভিমানে, কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। দুঃখে উত্তাল হয়ে উঠল তাঁর হৃদয়। অভিমানে বিদগ্ধ শচীদেবী বড় করুণ কণ্ঠে বললেন—'তুই যখন গয়াধামে যাবি বলেই ঠিক করেছিস, তখন তোর এই জীবন্ত মার নামেও দুটো পিণ্ড দিয়ে আসিস্। তাহলে সব ল্যাঠাই যাবে চুকে।'

আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। আজ যে সে বড় অসহায়। মা যেখানে বাধা দিতে পারলেন না। সে কেমন করে আটকাবে তার প্রভুকে। কি বলবে সে। দু'চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে গড়িয়ে পড়ল তার চোখের জল।

রাত্রিতে পায়ে মাথা রেখে চোখের জলে ভাসিয়ে দিল নিমাইয়ের চরণ। আদর করে কোলে নিয়ে নিমাই বললে—'ছিঃ, এর জন্য কাঁদে না। ও দেখতে দেখতে কেটে যাবে কটা মাস। আমি বাবার পিণ্ড দিয়েই ফিরে আসব। মা ত রয়েছেন। কাঞ্চনা, অমিতা এরা ত সব আছেই।'

'তুমি বড় নির্মম গো। তুমি কি বুঝতে পার না আমার মনের কথা। আমি যে তোমাকে না দেখে থাকতে পারি না কিছুতেই। না, না, আমি তোমাকে যেতে দেব না।' নিমাইয়ের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়া।

সোহাগভরে আদর করে প্রিয়ার মাথায় হাত বুলোতে থাকে নিমাই। নিজের বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে মুছিয়ে দেয় প্রিয়ার দু'চোখ। আবেগে আশ্লেষে গাঢ় করে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বিষ্ণুপ্রিয়াকে। তবু শান্ত হয় না প্রিয়া। বলে—'ও

আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি আমাকে বালিকা পেয়ে ভুলাচ্ছো।' ডুকরে কেঁদে ওঠে প্রিয়া।

নিমাই সহসা কোন উত্তর দেয় না। এ অবস্থায় কোন কিছু বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুকে নিয়ে শয্যায় শুয়ে পড়ে নিমাই। ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে কেমন যেন প্রিয়ার বুকটা অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়। পরম সোহাগ ভরে নিমাইকে আলিঙ্গনে পিষ্ট করে নিজেকে যেন সে মিশিয়ে দিতে চায় নিমাইয়ের অঙ্গে।

ধীরে ধীরে অনুরাগ ভরে নিমাই বলে—'ছেলে হয়ে পিতৃকার্য না করলে পিতৃআত্মা যে শান্ত হয় না প্রিয়া। তুমি ত নিতান্ত ছেলে মানুষ নও। সব কিছু বোঝ। আমি ত শীতের মধ্যেই ফিরে আসব। তোমাদের ফেলে বেশী দিন থাকব কেমন করে। তা' ছাড়া ছাত্রদেরও ত পড়ার ক্ষতি হবে।'

কোন উত্তর দেয় না বিষ্ণুপ্রিয়া। বড় অভিমানিনী। সে ত বুঝতেই পেরেছে, একবার যখন সিদ্ধান্ত করেছে নিমাই। তাকে আর 'না' করা যাবে না। শুনবে না কারো মানা।

দিন ক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। আশ্বিনেই যাত্রা করবে নিমাই। মায়ের বড্ড ভয় করতে লাগল। দূর দেশ। দুর্গম পথ। তায় পথে কত বিপদ-আপদ, দস্যু তস্করের ভয়। যেতে হবে পাহাড় পর্বতের মধ্য দিয়ে। যদি পথে কোন কিছু ঘটে। মায়ের মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। তিনি অনেক ভেবেচিন্তে ডেকে পাঠালেন নিমাইয়ের মেশো আচার্য চন্দ্রশেখরকে। ডাক শুনেই তিনি এলেন। বললেন তাঁকে শচীদেবী—'তুমি দয়া করে ওর সঙ্গে যাও। একা একা পাঠাতে মন সরছে না। তুমি সঙ্গে গেলে বুকে সাহস পাই। খুব সাবধানে যাবে। কাজ শেষ হলেই শীঘ্র ফিরে আসবে।'

আচার্য চন্দ্রশেখর সহজেই রাজী হয়ে গেলেন। বললেন—'তোমার কোন চিন্তা নেই। যতদূর সম্ভব সোজা পথেই যাব। কাজ শেষ হলেই ফিরে আসব।'

তবু অনেকটা আশ্বস্ত হলেন শচীদেবী। একজন নিজের লোক অন্ততঃ সঙ্গে যাচ্ছে। তাছাড়া ছাত্র শিষ্যরাও অনেকে সঙ্গে যাবে। নবদ্বীপের আরো কেউ কেউ সাথী হবে। দল বেঁধেই ত ওরা যাবে। কথায় বলে তীর্থ যাত্রীর দল।

যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল নিমাই। মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করল। প্রণাম করল রঘুনাথকে মন্দিরে গিয়ে। তারপর ঘরে এল বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। নির্বাক প্রিয়া। গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে চোখের জল। নীরব ব্যথার অশ্রু।

নিমাই বুকে টেনে নিলেন প্রিয়াকে। বললো বেদনা কম্পিত কণ্ঠে—'তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি। বাবার পারলৌকিক কাজ। এখন না সেরে এলে সময় আর পাব না। তাই বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে। তুমি দুঃখ করো না। আমি শীতের মধ্যেই ফিরে আসব। তুমি সদাসর্বদা থাকবে মায়ের কাছে। তাঁর সেবা যত্ন করবে।'

বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদতে কাঁদতে গলায় আঁচল দিয়ে ঘোমটা টেনে প্রণাম করলে নিমাইয়ের পদযুগলে। বেরিয়ে পড়ল নিমাই। প্রিয়ার চোখের জল সম্বল করে।

শচীদেবী পেছন পেছনে চোখের জল মুছতে মুছতে এলেন গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত। প্রিয়া পারল না নিজেকে ধরে রাখতে। পারল না এ করুণ দৃশ্য দেখতে। কাঁদতে লাগল আবেগ ভরে শূন্য ঘর শূন্য মন্দির। আদিগন্ত যেন ভরে উঠল একটা বিরাট ঔদাসীন্যে। এ মরু-দহন কি কান্নার অশ্রুতে শীতল হবে না।

কে যেন ডাকল ওর নাম ধরে।

কান্না ভেজা জড়িত কণ্ঠে প্রিয়া বললে—কে।

পিছন ফিরে বললে—'কে কাঞ্চনা? আয় ঘরে আয়।'

চোখ ফেটে জল পড়ছে টপটপ করে। কাঞ্চনা এগিয়ে এল প্রিয়ার কাছে। হাতটা কোলের উপর টেনে নিলে। আচলে মুছিয়ে দিলে চোখের জল। সান্ত্বনা দিয়ে বললে—'দেখ সখী, অমন করে কাঁদিস নে। কাঁদতে নেই। সখা ত দু'মাসের মধ্যেই ফিরে আসবে। তিনি যে পিতৃভক্ত সন্তান। তায় ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত মানুষ। ধর্ম কাজ করতেই তীর্থে গেছেন। তুই তার সহধর্মিণী। ধর্ম কার্যে সহায়তা করা তোর যে একান্ত কর্তব্য। 'পতির পুণ্যেই সতীর পুণ্য।' 'চুপ কর, কাঁদিস নে। যাত্রার সময় কাঁদতে নেই কেঁদে তার যাত্রা পথকে পিচ্ছল করিস নে।'

'আমি যে সইতে পারছি না সখী ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না রে। ও যে আমার সব। হৃদয়, প্রাণ, মন। তুই বল, প্রাণ বেরিয়ে গেলে মানুষ কি আর বাঁচে।'

কাঁদতে কাঁদতে কাঞ্চনার কোলে লুটিয়ে পড়লে বিষ্ণুপ্রিয়া। মাথায় হাত বুলোতে লাগল কাঞ্চনা। খানিকক্ষণ চুপ করে রইল সে। আদর করে বললে—"প্রিয়া, ওঠ। চল আমরা উদ্যানে যাই। ফুল তুলে আনি। মালা গেঁথে রঘুনাথের গলায় দেব পরিয়ে। কামনা করব সখার যাত্রা পথ যেন শুভ হয়। যেন নির্বিঘ্নে তিনি ফিরে আসতে পারেন।'

এমন সময় শচীদেবী টলতে টলতে ফিরে এলেন ঘরে। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত তিনি। বিষ্ণুপ্রিয়া কেমন করে তাকাবে ও'র মুখের দিকে। মুহূর্তে নিজেকে সামলিয়ে নিলে প্রিয়া। চোখ মুছে এগুতে লাগল মায়ের দিকে।

শচীদেবী তাকালেন বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে। চোখের পাতা দুটো তার থরথর করে কাঁপছে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন।

প্রিয়া আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। মাকে গিয়ে ধরলে জড়িয়ে। শচীদেবী বৌমাকে বুকে চেপে নীরবে ফেলতে লাগলেন চোখের জল।

মেসো আচার্য চন্দ্রশেখর সঙ্গে আছেন। শিষ্য ছাত্রদেরও কেউ কেউ চলছে। বিরাট তীর্থযাত্রীর দল না হলেও পথে আরো কয়েকজন সঙ্গী জুটেছে।

কত দেশ, জনপদ। বিচিত্র গাছ-পালা, বিচিত্র প্রকৃতি। ভুলিয়ে দেয় পথের ক্লান্তি। কত রকমের জীব জন্তু, পাখিই বা কত রকমের। গাছের শাখায় শাখায় নেচে বেড়াচ্ছে। কত স্বাধীন ওরা। কোন বাধা-বন্ধন নাই। ভারী ভাল লাগে দেখতে।

বাংলায় সবুজ শ্যামল শস্য ক্ষেত্র। শরতের মেঘমুক্ত আকাশ। শিউলি ঝরা পথ। দূরে দূরে শ্রেণীবদ্ধ কাশ ফুলের সমারোহ। ভুলিয়ে দেয় ঘরের কথা, ভুলিয়ে দেয় প্রিয়ার স্মৃতি।

উদাসী বৈরাগী প্রকৃতি। সে মানুষকে গৃহছাড়া করে। হৃদয়কে করে মহান, উদার। ঘুচিয়ে দেয় কূপমণ্ডূকতা। বাড়িয়ে দেয় হৃদয়ের প্রসারতা। নৈসর্গিক প্রেমে উদ্বেল হয়ে ওঠে মানব। তাই ত যুগ যুগ ধরে মানুষ ছুটেছে এই দেশের পথে প্রান্তরে, পাহাড়ে পর্বতে, গহন অরণ্যে।

তাইত ভারতের তীর্থক্ষেত্র, হয়ে উঠেছে মহামানবের মিলন ক্ষেত্র। কত দেশ, কত জাতি, কত বিচিত্র পোষাক-পরিচ্ছদ, কত রকমের ভাষা—আচার ব্যবহারই বা কত রকমের।

এ সবের মধ্যেই ত আমার প্রেমময়, আমার ভয়ঙ্কর সুন্দর বিপুল রহস্যময় আমার শ্যামসুন্দর মদনমোহন বিরাজ করছেন। আমি ত দেখতে পাচ্ছি ওই-ওই, কৃষ্ণ আমায় ডাকছে। ওই ত বাজছে শ্যামের বাঁশী। ওই ত শোনা যাচ্ছে প্রণব ধ্বনি।

প্রকৃতির প্রেমে নিমাই যেন উম্মাদ। সে আর পারছে না নিজেকে ধরে রাখতে। মাঝে মাঝে উদার দৃষ্টি মেলে চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে। আয়ত বিস্তৃত দু'চোখের দৃষ্টি তার চলে যায় কোন সুদূরে। কোন পাহাড়ের নিভৃত কন্দরে।

চলতে চলতে এসে পেঁছিল। 'চির' নদীর তীরে। সেখানে স্নান আহ্নিক সেরে উপস্থিত হলো ভাগলপুর জেলার মন্দারে। এখানেই শ্রীমধুসূদনের মন্দির। ভাবে তন্ময় হয়ে নিমাই দর্শন করল শ্রীমধুসূদনকে।

মন্দারের পথে চলতে চলতেই জ্বর এল নিমাইয়ের। চলছে জ্বরে কাঁপতে কাঁপতেই। সঙ্গীরা বড় চিন্তায় পড়ল। তাই ত এখন কি করবে তারা। আচার্য চন্দ্রশেখর বড় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। উৎকণ্ঠার শেষ নাই শিষ্যদের। পথে ঘাটে কোথায় পাবে বদ্যি। অনেক কষ্টে শেষে হাজির হল চটিতে।

নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা, নিমাই নিজেই করলে। বললে—'এখানের কোন ব্রাহ্মণের পাদোদক নিয়ে এস।'

তাই করল শিষ্যরা। পরম আগ্রহভরে নিয়ে এল ব্রাহ্মণের পাদোদক। পান করল নিমাই ভক্তিভরে। মুহূর্তে সেরে গেল জ্বর। কোন অবসাদই রইল না নিমাইয়ের শরীরে।

নিমাই দেখাল ভক্তির মাহাত্ম্য। ওরা বড় ঘৃণা করেছিল এদেশের ব্রাহ্মণদের, এদের আচার-ব্যবহার, ভালো লাগেনি কারো। ব্রাহ্মণ হয়ে এত অনাচারী কেন। ব্রাহ্মণের আচার নিষ্ঠা, যথাযথ পালন করেনি কেউ। নিমাই দেখাল এদেশের ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য। তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করল যথার্থ ব্রাহ্মণত্বে।

কিন্তু নিমাই। সে যেন হয়ে গেল আর এক মানুষ। কে বলবে এই নিমাই সেই পূর্বের পাণ্ডিত্যাভিমানী নিমাই। বিদ্যার দম্ভে যে ছিল উচ্চণ্ড। কেউ দাঁড়াতে পারত না তার সামনে বিদ্যার দর্প নিয়ে। সেই অহংকার, সেই পাণ্ডিত্য কোথায় যেন লুকিয়ে ফেলল নিমাই।

ভাবগম্ভীর ধ্যানমগ্ন এ যেন আর এক নিমাই। পথে চলছে ভাবে বিভোর হয়ে। আত্মমগ্ন এ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ যেন।

দলবল সহ নিমাই এল পুনপুনে। স্নান-আহ্নিক করল। অর্চন করল পিতৃদেবকে। তারপর গৃধ্রকুটের পাশ দিয়ে প্রবেশ করল রাজগীরে। এই সেই রাজগৃহ। যেখানে ভীম যুদ্ধ করেছিলেন জরাসন্ধের সঙ্গে। দেখিয়ে দিয়েছিলেন ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের কৌশল। এই সেই বিম্বিসারের

রাজধানী-রাজগৃহ। ভগবান বুদ্ধকে তিনি প্রথম দান করেছিলেন বেণুবন বিহার। এখানেই এসেছিলেন ত্রাণকর্তা যিশু। ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন ঈশ্বরপুত্র। এখানেই সেই বিখ্যাত তাম্রপর্ণী গুহা। যেখানে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৌদ্ধমহাসঙ্গীতি। অশোকের বৌদ্ধ স্তূপ, ওই ত গৃধ্রকুটের শীর্ষদেশে। কি পরম রমণীয় স্থান। ভগবান বুদ্ধ ধ্যান করতেন, উপদেশ দিতেন শিষ্যদেব। গৃধ্রকুটের গা বেয়ে ওই ত উঠে গেছে স্তবকে স্তবকে সোপানশ্রেণী। ঘোষণা করছে মহারাজ বিম্বিসারের পূর্তনৈপুণ্য।

এই সেই জৈনদের পবিত্র তীর্থকেন্দ্র। ২৪জন তীর্থঙ্করের সকলেই তপস্যা করেছিলেন রাজগীরের বিভিন্ন পাহাড়ে। বিংশতম তীর্থঙ্কর মুনিসুব্রত জন্মগ্রহণ করেছিলেন এখানেই। মহাবীর তাঁর জীবনে ১৪টি বর্ষা-বাস অতিবাহিত করেছেন এই রাজগৃহেই।

সর্বধর্মের মিলনক্ষেত্র এ এক মহাপবিত্র স্থান। এখানের প্রতি ধূলিকণাতে মিশে আছে তাঁদের অঙ্গের পূতপবিত্র স্পর্শ। এই তীর্থক্ষেত্রে এসে নিমাই কেমন যেন হয়ে পড়লেন স্মৃতিভারে অবনত।

রাজগৃহের অবস্থানও ভারী সুন্দর। উদয়গিরি, রত্নগিরি, বিপুলগিরি, বৈভারগিরি ও সোনাগিরি—এই চারটি পর্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত রাজগৃহ। প্রাচীন নাম গিরিব্রজপুর।

নিমাই বৈভারগিরির সূর্যকুণ্ডে অর্থাৎ উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করল। ঢুকেছিল পূর্বদ্বার দিয়ে। বেরিয়ে এল দক্ষিণ দ্বার পথে। এসে ধরল গয়ার পথ। সে ত আর বেশী দূর নয়। প্রাণ যেন আকুল হয়ে উঠল। দ্রুত চলতে লাগল তীর্থযাত্রী দল। শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শনের জন্য নিমাই হয়ে উঠল ব্যাকুল।

গয়াতে ঢুকেই শ্রীবিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করে নমস্কার করল তীর্থরাজকে। ভক্তি, গাঢ়, গম্ভীর ও স্থিত শান্ত। পিতৃকার্য করে স্নান করল ব্রহ্মকুণ্ডে। এবার চলল এগিয়ে চক্রবেড়ে। ওখানেই ত সেই পাষাণ ফলকে অঙ্কিত আছে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ চিহ্ন।

জেগে উঠল দস্যু গয়াসুরের কাহিনী। গয়া অসুর বটে, কিন্তু পরম বিষ্ণুভক্ত সে। ছিল তার প্রবল প্রতাপ। শক্তিতে তিনি ছিলেন অজেয়। যুদ্ধ বাঁধল দেবতাদের সঙ্গে। পরাজিত হলেন দেবতারা। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করল দেবতাদের গয়াসুর।

রাজ্যহারা, গৃহহারা অমর নিকর।

কোথা যাবে, কোথা নিবে আশ্রয় তাঁরা। রাজ্যচ্যুত দেবতারা হাহাকার

করে উঠল। এ বিপদে কে তাঁদের রক্ষে করবে। কার কাছে গেলে পাবে আশ্রয়। অসহায় দেবতাবৃন্দ। শেষে হাজির হল বিষ্ণুর কাছে। চাইল এর প্রতিকার। নিবেদন করল, যেমন করে হোক রক্ষা করুন শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের।

দেবতাদের আবেদনে বিষ্ণু হলেন প্রসন্ন। তিনি অবতীর্ণ হলেন অবনীতে। যুদ্ধ করলেন ভক্ত গয়াসুরের সঙ্গে বিষ্ণু। শেষে গয়াসুরের কাছে পরাজিত হলেন তিনি। হেরে গেলেন ভক্তের কাছে ভগবান। বন্দী হলেন গয়াসুরের ভক্তিডোরে শ্রীবিষ্ণু। পরাভূত হয়ে ভিক্ষে চাইলেন ভক্তের কাছে।

গয়াসুর, বললেন—'কি ভিক্ষে চান আপনি?'

'শুধু একটু দাঁড়াবার স্থান।'

গয়াসুর সম্মত হলেন। তাই দেবেন তিনি।

স্মিত হেসে শ্রীবিষ্ণু অধিকার করলেন স্বর্গ, মর্ত্য। তারপর আর এক পদ রাখলেন গয়াসুরের মস্তকে।

এবার বুঝতে পারলেন শ্রীবিষ্ণুর চাতুরালি। গয়াসুর বললেন—'আপনার ভিক্ষে ত আমি দিয়েছি। এবার পূর্ণ করুন আমার প্রার্থনা।'

'কি প্রার্থনা তোমার?'

'আমার মস্তকে স্থাপিত এই যে আপনার পাদপদ্ম, যে এতে পিণ্ডদান করবে, সে যতবড়ই পাপী হোক না কেন, যেন মুক্ত হয়ে যায়।'

বললেন বিষ্ণু—'তথাস্তু'। তাই হবে গয়াসুর। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করলাম।'

ভক্ত গয়াসুরের দেহ পাষাণ হয়ে গেল। আর মস্তকে অঙ্কিত হয়ে রইল শ্রীবিষ্ণুর পাদচিহ্ন।

এই ত সেই প্রস্তরীভূত দেহ। এখানে এসে পিণ্ডদান করলেই ঘটবে পিতৃপুরুষের প্রেতযোনি থেকে মুক্তি। শান্তি লাভ করবে গয়াসুরের আত্মা। এই বিশ্বাস স্মরণাতীত কাল থেকে করে আসছে মানুষ। এই হলো যুগ-যুগান্তর ধরে হিন্দুদের সংস্কার। মন্দিরটি নাকি নির্মাণ করেছিলেন গয়াসুর নিজেই। তাই তাঁরি নাম অনুসারে এই পুণ্যক্ষেত্রের নাম—গয়াধাম।

পিণ্ডদান করল নিমাই। মুক্ত হল পিতৃদায় থেকে। অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল বিষ্ণুর পদচিহ্নের দিকে। ব্রাহ্মণগণ বলতে আরম্ভ করল পদচিহ্নের মাহাত্ম্য।

'দেখ ভাগ্যবান, এই শ্রীবিষ্ণুর পদচিহ্ন। যে চরণ কাশীনাথ ধরেছেন হৃদয়ে, যে চরণ লক্ষ্মীর জীবন, বলির মাথায় আবির্ভাব হয়েছিল যে চরণের—

দেখ ভাগ্যবান ভক্ত, অবলোকন কর নয়ন ভরে। যে চরণ তিলার্দ্ধেক ধ্যান করলে যম তার অধিকার হারায়, যোগেশ্বর ধ্যান করেও যে চরণ পায় না, যে চরণে ভাগীরথীর প্রকাশ, যে চরণ নিরবধি ভক্ত রাখে বুকে, তুমি নিতান্ত ভাগ্যবান, তাই দেখছ এই দেবদুর্লভ শ্রীপাদপদ্ম।'

স্তম্ভিত স্পন্দনহীন নিমাই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পাদপানে। পদ-মাহাত্ম্য শুনতে শুনতে দুটি বিম্বাধর কেঁপে উঠল থরথর করে। দু নয়ন ভরে নেমে আসছে অশ্রুর বন্যা, কিছুতেই পারল না নিমাই রোধ করতে। জলে ডুবে গেল নয়নতারা। গণ্ড বেয়ে নেমে এল অবিরল ধারা। প্লাবিত করল বক্ষদেশ। বক্ষদেশেও স্থান হল না। ঝর ঝর করে ঝরে পড়তে লাগল ভূমিতে। নয়ন জলের বেগ তবু হল না প্রশমিত। নয়নের আদি, মধ্য, অন্ত থেকে নেমে এল ত্রিধারা। ঝরণার মত বেগে। মিলিত হল ত্রিধারা। প্লাবিত হল ত্রিধারা। প্লাবিত করল উপবীত। শেষে ভিজতে আরম্ভ করল উত্তরীয়।

স্পন্দনহীন দেহ। নিমাই কাঁপছে থরথর করে। বদনচন্দ্রমা থেকে বিচ্ছুরিত অপূর্ব জ্যোতি। কোন বাক্য নাই মুখে। ব্রাহ্মণ আর দর্শকবৃন্দ নিমেষহারা। তারা দেখছে নিমাইকে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে। পুলক-স্পন্দিত দেহ। যেন পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। এ কে, এমন স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে সারা দেহ। এ কি নর, না নারায়ণ।

মন্দিরের গর্ভগৃহে দাঁড়িয়ে দেখছেন ঈশ্বর পুরীও। সেই ঈশ্বর পুরী। নবদ্বীপে যিনি দেখেছিলেন নিমাইকে। দেখে তিনি হয়ে গিয়েছিলেন স্তম্ভিত। চিনতে ক্ষণমাত্রও দেরী হল না তাঁর। তিনি দিব্য দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারলেন, এ যে মনুষ্য দেহে ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ। নিমাইয়ের দেহে দেখা দিয়েছে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।

তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন নিমাইয়ের কাছে। কি অপূর্ব রূপ-মাধুরী। ভাবের কি বিস্ময়কর প্রকাশ। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য তিনি। বুঝতে তাঁর কষ্ট হলো না। কিন্তু মনুষ্য শরীরে এত গাঢ় ভাবের উদয় হতে পারে, এ যে বিশ্বাস হয় না। ঈশ্বর পুরীর মনে পড়ল গুরুর কথা। মেঘ দেখলেই কৃষ্ণ মনে করে তাঁর হৃদয়ে জেগে উঠত কৃষ্ণস্ফূর্তি। মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তেন তিনি।

বুঝতে পারলেন কালমাত্র বিলম্ব করলে নিমাই পড়ে যাবে মূর্চ্ছিত হয়ে। তাই তিনি আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন নিমাইকে। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল নিমাইয়ের। তাকে ধরে আছেন ঈশ্বরপুরী। প্রণাম করতে গেল নিমাই। ধরে ফেললেন পুরীজী। আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন নিমাইকে। দুজনের

চোখ দিয়ে অবিরল ধারে পড়ল প্রেমাশ্রু। দু'জনেই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ। নিমাইয়ের অঙ্গস্পর্শে পুলকিত, রোমাঞ্চিত ঈশ্বর পুরী।

চেতনা পেয়ে নিমাই বললে—'সফল হয়েছে আমার গয়া যাত্রা। আমি দেখা পেয়েছি আপনার। চরণ দর্শন করে ধন্য হলাম। আপনি আমাকে কৃপা করুন। ভব সাগরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি আমি। আমার এ দেহ মন আপনাকে সমর্পণ করলাম। আপনি শুভ দৃষ্টিপাত করুন, যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসুধা পানে জীবন ধন্য করতে পারি।'

নিমাইয়ের আবেগপূরিত কথা শুনে বললেন ঈশ্বর পুরী—'শান্ত হও পণ্ডিত। তোমাকে নবদ্বীপে দেখেই আমি অনুভব করেছি, তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছ। সেই থেকে নিরন্তর এক অপার্থিব সুখ অনুভব করছি। এখন আর আমি নিজের বশে নিজে নেই। আমি ত তোমারই অধীন। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। এখন ফিরে যাও বাসায়।'

বাসায় ফিরে এসে নিমাই রান্নার আয়োজন করলে। রান্না প্রায় শেষ হয়ে আসছে, এমন সময় ঈশ্বর পুরী হাজির। নিমাই পুরীজীকে দেখে ভারী খুশি হলেন। সাদর আহ্বান করে বসালেন। রহস্য করে বললেন নিমাইকে—'প্রায় ঠিক সময়ে পেঁছে গেছি। দেখছি তোমার রান্নাবান্না সব শেষ। আমি বেশ ক্ষুধার্ত। রাঁধতে সময় পাইনি। তা হলে তোমার কাছেই দেব সেবা লাগিয়ে।'

'সে ত পরম সৌভাগ্য আমার। যদি কৃপা করে সেবা করেন, কৃত কৃতার্থ হবো।' নিমাই বললে বিনীত কণ্ঠে।

'কিন্তু আমি খেলে তুমি খাবে কি? রান্না ত করেছ একজনের। যদি নিতান্তই খেতে হয়, এস আমরা দু'জনেই ভাগ করে খাই।

নিমাই বলল—'তা হয় না। দয়া করে আপনি সেবা করুন। ও কতক্ষণ যাবে। আমি আবার রান্না করব। আপনার সেবা করতে করতেই রান্না আমার হয়ে যাবে।'

পরম ভক্তিভরে ঈশ্বর পুরীকে খাওয়াল নিমাই। তারপর পুরী-অঙ্গে চন্দন লেপন করে গলায় পরিয়ে দিল ফুলের মালা।

এতক্ষণে ভাত ফুটে গেছে নিমাইয়ের। তারপর ভোজন করল পরম পরিতৃপ্তিভরে। অতিথি সেবা করে নিজেকে ধন্য মনে করল নিমাই।

কৃষ্ণ ভাবাবেশে যেন আচ্ছন্ন দেহ মন। কোন কিছু ভাল লাগছে না আর। ঈশ্বর পুরীকে বললে—'আপনি আমায় মন্ত্র দীক্ষা দিন। দয়া করে এ ভব বন্ধন থেকে উদ্ধারের পথ দিন দেখিয়ে।'

নিমাইয়ের আকুলতা দেখে ভারী খুশি হলেন পুরী। তিনি নবদ্বীপে দেখেই বুঝেছিলেন, এ নিমাই বস্তুটি সাধারণ মনুষ্য নয়। ইনিই পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন। আজ গয়াতে নিমাইকে দেখে সে বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হয়েছে। তিনি এক শুভদিন দেখে, শুভক্ষণে মন্ত্র দিলেন নিমাইয়ের কর্ণকুহরে। মন্ত্রটি দশাক্ষরী, 'গোপীজন বল্লভের।'

মন্ত্র দিয়ে ঈশ্বরপুরী আলিঙ্গন করলেন নিমাইকে। আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল দু'জনের হৃদয়। গড়িয়ে পড়ল দু'জনের নয়ন বেয়ে অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু। মাধবেন্দ্র যে কৃষ্ণপ্রেমের বীজ রোপণ করেছিলেন ঈশ্বরের দেহে, অঙ্কুরিত হয়ে সেই বীজ পরিণত হল গৌরাঙ্গ বৃক্ষ রূপে।

প্রণাম করতে গেলেন নিমাই ঈশ্বরপুরীকে। পুরীজী ধরে ফেললেন, প্রণাম নিলেন না। তিনি যাকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলে জেনেছেন, কেমন করে প্রণাম নেবেন তাঁর। তিনি বিদায় নিলেন নিমাইয়ের কাছ থেকে। তারপর কোথায় যে চলে গেলেন, কেউ জানে না সে খবর আর কোনদিন দেখাও হয়নি নিমাইয়ের সঙ্গে।

গয়াতেই, একদিন নিভৃতে বসে নিমাই জপ করছে গুরুপ্রদত্ত ইষ্টনাম। সহসা চীৎকার করে উঠল নিমাই—'ওরে আমার বাপ কৃষ্ণরে। কোথায় পালালি তুই।' পড়ল মূর্চ্ছিত হয়ে। ছুটে এল শিষ্যরা। মেশো আচার্য চন্দ্রশেখর হয়ে পড়লেন চিন্তিত। শিষ্যরা চোখেমুখে জলের ঝাট দিয়ে চেষ্টা করল মূর্চ্ছা ভাঙাতে। চেতনা ফিরে এল ক্ষণকাল পরে। আকুল হয়ে কেঁদে উঠল নিমাই।

'ওরে বাপ কৃষ্ণরে। আমার প্রাণধন। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। আমি পারছি না ধৈর্য ধরতে। ওগো দয়াময়, দেখা দাও। অমন করে লুকিয়ে থেকো না। দেখা দাও, প্রাণ বাঁচাও।'

ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করল। শিষ্যরা বাতাস দিচ্ছে গায়ে। চন্দ্রশেখর চেষ্টা করলেন সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু নিমাই কিছুতেই প্রবোধ মানলে না। কাঁদলে, শুধু অবিরল ভাবে কাঁদলে। মাটি ভিজে যাচ্ছে। সাথীরা সে অবস্থা দেখে নিজেরাই কেঁদে উঠল আকুল হয়ে। এখন কি করবে তারা। কেমন করে শান্ত করবে নিমাইকে '

নিমাই বললে—"বাড়ী ফিরে যাও তোমরা আমি আর ফিরে যাব না বাড়ী। আমি খুঁজে বেড়াব আমার কৃষ্ণকে। আমি যাব বৃন্দাবনে। তোমরা গিয়ে মাকে বলো, তার নিমাই কৃষ্ণকে খুঁজতে গেছে বৃন্দাবনে। তাঁকে সান্ত্বনা দিও, তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন সন্তানের হৃদয় ব্যথা। তিনি যে মা।'

কেমন যেন উম্মাদ হয়ে গেছে নিমাই। চন্দ্রশেখর হয়ে পড়লেন ভীষণ চিন্তিত। তাইত, এখন কি করবেন তিনি কেমন করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন নিমাইকে ঘরে। তিনি যে কথা দিয়ে এসেছেন শচীদেবীকে। কাজ শেষ হলেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন বাড়ী।

শিষ্যগণ নিমাইকে বোঝাল নানাভাবে। প্রবোধ দিলেন চন্দ্রশেখর। ধীরে ধীরে যেন অনেক খানি শান্ত হলো নিমাই। কিন্তু কারো সঙ্গে বড় একটা কথা বলছে না। যেন মোহাচ্ছন্ন। সব সময় অভিভূত হয়ে আছে ভাবঘোরে।

একদিন রাত্রে। সকলে নিমাইকে ঘিরে নিদ্রিত। রাত্রির শেষ যাম সমাগত। নিমাই উঠে পড়লে শয্যা ছেড়ে। তারপর, ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো গৃহের বাইরে। প্রেমে আত্মহারা। দৃক্‌পাত নেই কোন দিকে। চললে প্রেমের আবেশে—

'কৃষ্ণরে বাপরে মোর পাইব কোথায়।
এই মত বলিয়া যায়েন গৌর রায়॥' —চৈ. ভা.

এদিকে ঘুম ভেঙ্গে গেল সাথীদের। দেখলে নিমাই নাই। খোঁজাখুঁজি পড়ে গেল চারিদিকে। শিষ্যরা ছুটল বিভিন্ন পথ ধরে বিভিন্ন দিকে।

নিমাই চলেছে। মুখে তার কৃষ্ণ নাম। দেহ মন কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা। সে যে কোথা দিয়ে কোন পথে চলছে, জানে না কিছুই। সহসা—

'কতদূরে যাইতে শুনেন দিব্যবাণী।
এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমনি॥
যাইবার কাল আছে যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজ গৃহে চলই এখনে॥' —চৈ. ভা.

সহসা থমকে দাঁড়িয়ে গেল নিমাই। এদিক ওদিক সতৃষ্ণ নয়নে দেখল তাকিয়ে। কোথায় কে তাকে বাধা দিচ্ছে। হ্যাঁ, সে ত স্পষ্টই শুনেছে। দৈববাণী—কে যেন যেতে নিষেধ করেছে মথুরা। সহসা পিছন ফিরে দেখলে অনেক দূরে, কারা যেন ছুটে আসছে। দাঁড়িয়ে রইল নিমাই।

কাছে আসতেই বুঝতে পারল, ওরা তার শিষ্য। পায়ে ধরে মিনতি করে ফেরাল নিমাইকে।

আর কোন কথা নয়, আগে পিছে, মাঝখানে নিমাইকে নিয়ে ধরল দেশের পথ। মেশো চন্দ্রশেখর রইলেন সর্বদা কাছে কাছে।

আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণও শেষ হতে চললো

বিষ্ণুপ্রিয়া আর যেন পারছে না অপেক্ষা করতে। একটা একটা দিন তার কাছে যেন মনে হয় মাস। ভেবে ভেবে আকুল হয়ে উঠে প্রিয়া। কই, আজো ত এল না প্রভু! উনি ত বলেই গিয়েছেন শীতের মধ্যেই ফিরবেন। তাহলে। উনি ত কখনো মিথ্যে বলেন না।

কেমন যেন একটা আশংকায় বুকটা দুরুদুরু করে ওঠে প্রিয়ার। পথে কোন বিপদ-আপদ ঘটেনি ত। অসুখ-বেসুখ। কিন্তু সে ত ভাল করেই জানে, প্রভুর কখনো কোন অসুখ হয়নি, তা ছাড়া হতেও পারে না। তার মন বলছে। কিন্তু যদি কোন দস্যু-তস্কর।

আর ভাবতে পারে না প্রিয়া। কেমন যেন বড্ড অসহায় মনে করে নিজেকে। ছুটে যায় মায়ের কাছে। দেখে মা বসে আছেন উদাস দৃষ্টি মেলে-পথের দিকে তাকিয়ে। ওর সাড়া পেয়ে অঞ্চল দিয়ে মুছে ফেলেন চোখের জল। বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝতে পারে। মায়ের মনও হয়ে উঠেছে অস্থির। রাতে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে গিয়েছে চোখের কোণে কালি।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে আঁকড়িয়ে ধরেন বুকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা পান না খুঁজে। দরদর ধারে নেমে আসে অশ্রুধারা। নীরবে দুজনকে দুজন ধরে কাঁদেন। পুত্র স্নেহ আর স্বামী প্রেম, সব যেন মিলেমিশে প্লাবিত হচ্ছে একই ধারায়।

প্রতীক্ষা, এ এক অসহনীয় প্রতীক্ষা কি জানি কবে শেষ হবে এই উন্মুখ ব্যাকুল প্রতীক্ষার। শরৎ, হেমন্ত শেষ হয়ে এসেছে পৌষের শীতও। মাঠের ধান উঠে এসেছে চাষীদের ঘরে। শূন্য পৌষের মাঠ। কুয়াশার শুভ্র চাদরে ঢাকা তার সর্ব অঙ্গ। বিষ্ণুপ্রিয়ার উন্মুক্ত অঙ্গ। গৌরাঙ্গ তোষক নেই গায়ে তার ঢাকা।

'পৌষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে।
কান্ত নেই আলিঙ্গনে শীত কিসে ঢাকে॥'

কিন্তু শীতের জড়তাও পারে না শচীদেবীকে কাবু করতে। তিনি সারারাত বসে থাকেন শয্যায়। ঘুম তাঁর আসে না। রাতের অন্ধকারেও চোখ যেন তাঁর জ্বলে উঠে। তিনি তাকিয়ে থাকেন পথের দিকে। সামান্য একটু শব্দ হলেই বেড়িয়ে পড়েন কপাট খুলে। বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘরের কপাটেও শব্দ হয়। জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে মায়ের পিছনে পিছনে সেও বেরিয়ে আসে সদরে। শচীদেবী বলেন—'কার যেন পায়ের সাড়া শুনলাম না।' তুমিও নিশ্চয় শুনেছ বৌমা?

উত্তর দেয় না বিষ্ণুপ্রিয়া। মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ, সেও যেন শুনেছে মনে হল। কিন্তু কই কাউকে ত দেখছি না বৌমা। তবে কি···

'কে মাঠান ?' বাইরের ঘর থেকে ঈশান জিগগেস করে।

কোথাই খোঁজাখুঁজি করছ গো তোমরা। আমি ত বাইরেই রয়েছি। দাদাবাবু এলে আমি কি উঠতুম না। আমি ত জেগেই রয়েছি। পোড়ার চোখে ঘুম কি আছে।'

ঈশানও তাহলে ঘুমায়নি। সেও রয়েছে এই শীতের রাতে জেগে।

'ঈশান, নারে, কার যেন পায়ের শব্দ শুনলুম বলে মনে হল।' বললেন শচীদেবী।

'না গো মাঠান, ও তোমার মনের ভ্রম। আমি চাকর হলেও বুঝতে পারি তোমাদের মনের কোথাটা কোথায়। আমার পানটাও যে আকুলি বেকুলি করছে দাদাবাবুর জন্যি। কি হলো, এখনো দাদাবাবু ফেরল না কেন।'

মা আর প্রিয়া, কেউ কোন জবাব দিতে পারল না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল দু'জনেই।

॥ তেইশ ॥

অতি প্রত্যুষে ফুল তুলছিলেন শ্রীমান পণ্ডিত।
কুন্দ ফুল। ফুটেছে অপর্যাপ্ত শ্রীবাসের উদ্যানে। একটি মাত্র ফুলের ঝাড়। তাতেই ফুটেছে রাশি রাশি ফুল। প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুষ্প চয়নে অনেকেই আসেন, আজও এসেছেন সকলে।

এসেছেন শ্রীমান পণ্ডিতও। ফুল তুলছেন, আর হাসছেন আপন মনে। কথা মনে করে শ্রীমান পণ্ডিতের হাসি যেন আর ধরে না। হাসি চেপে রাখতে পারছেন না তিনি। অথচ কাউকে কিছু বলছেন না। বলা যায় না, বলতে ইচ্ছে করছেও না তাঁর। হাসছেন তিনি আপন মনেই।

জিগগেস করলেন শ্রীবাস—'বলি এত হাসি কিসের?'

'কারণ আছে অবশ্য'।

'কারণটা কি তাই শুনি।' শ্রীবাস বললে।

'নিমাই না, গয়া থেকে ফিরে পরম বৈষ্ণব হয়েছে। আমরা কয়েকজন কাল বিকেলে গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখি, এমন নম্র বুঝি আর জগতে দ্বিতীয়টি নেই। দেখলে সহজেই চিত্ত আকর্ষণ করে। গল্প করছিল গয়ার। সহসা এল বিষ্ণু পাদপদ্মের প্রসঙ্গ। বলতে গিয়েই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল আনন্দে। অমন ভাব সমাধি চোখে দেখা ত দূরের কথা, কানেও শুনি না কখনো। দেখলে মনে হয় নিমাই বুঝি মানুষ নয়।

'তুমি বড় শুভ সংবাদ শুনালে শ্রীমান। নিমাই পণ্ডিত যদি বৈষ্ণব হয়, এবার দেখে নেব বৈষ্ণব বিদ্বেষীদের। আমি এতদিন এই কামনাই করছিলাম। 'হে ভগবান, তুমি আমাদের শ্রীবৃদ্ধি করো।' আত্মগত ভাবে শ্রীবাস বললেন।

'তারপর কি হলো জান?' শ্রীমান পণ্ডিত বলতে আরম্ভ করলেন। 'ডেকেছে আজ সকালে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ীতে। নিমাই বলবে তার মনের কথা। যেতে হবে সেখানে। তাই ত ফুল তুলছি তাড়াতাড়ি।'

পণ্ডিত গদাধরও তুলছিলেন ফুল। মুখে কিছু বললেন না। যেন কোন উৎসাহ নাই তাঁর। শ্রীমান পণ্ডিত সত্যি সত্যি চলে গেলেন তাড়াতাড়ি।

শ্রীবাসের বড় আগ্রহ, সে দেখবে নিমাইকে। অতএব গঙ্গার ধারে শুক্লাম্বর

ব্রহ্মচারীর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন। চুপি চুপি গদাধরও গেলেন। কিন্তু সেখানে থাকার অনুমতি পেলেন না। লুকিয়ে রইলেন ঘরের মধ্যে। একে একে সদাশিব, মুরারি এরাও এসে হাজির হলো।

দেখা গেল একটু পরেই নিমাই আসছে টলতে টলতে। ভাবে তন্ময়। অর্ধোন্মাদ যেন। দীর্ঘ শরীর, প্রশান্ত কান্তি, বলিষ্ঠ বপু, কিন্তু নয়ন দিয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় ঝরে পড়ছে অশ্রু।

শুক্লাম্বরের বাড়ীতে ঢুকেই বসে পড়লে পিঁড়ায়। তারপর 'হা কৃষ্ণ' বলে পড়তে পড়তে ধরে ফেললো পিঁড়ার পায়া। মাথাটা তার ঝুকে পড়ল। চাঁচর চিকুরে আবৃত হলো মুখমণ্ডল।

ধরে ফেললো মুরারি, সদাশিব ওরা সকলে। কি আশ্চর্য, চক্ষু স্থির, অবিরল ধারায় মুখ দিয়ে ঝরে পড়ছে লালা। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ। সকলে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলে। তাড়াতাড়ি শুক্লাম্বর নিয়ে এল জল। চোখেমুখে ছিটাতে লাগল। ক্ষণ পরে যেন ফিরে এল অর্ধচেতন। 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলে রোদন করে উঠল হাহাকার করে। তারপর, 'এই ত আমার কৃষ্ণ ছিল। দেখা দিয়ে কোথায় লুকলো।' বলেই গড়াগড়ি দিতে লাগল ভূমিতে। সোনার অঙ্গ হয়ে উঠল ধূলিধূসরিত। আস্তেব্যস্তে সকলে ধরে তুললো নিমাইকে। আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল নিমাই।

ক্ষণে মূর্চ্ছা ক্ষণে চেতন। মুহুর্মুহুঃ আর্তনাদ। সে কি হৃদয় বিদারক অতি মর্মন্তদ। বুঝি পাষাণও বিগলিত হয়। নিমাইয়ের সে অবস্থা দেখে বেদনার্ত হয়ে উঠল সকলে।

কোথা দিয়ে সময় যে কেটে যাচ্ছে, সে খেয়ালই নেই কারো। দুপুর গড়িয়ে উপস্থিত হল অপরাহ্ণ। আক্ষেপ আর প্রলাপ তবু থামে না নিমাইয়ের। মুরারির গলা জড়িয়ে বলছে—'মুরারি, শ্রীকৃষ্ণ ভজ। তুমি কি শ্রীকৃষ্ণ ভজবে না ভাই? কৃষ্ণ নাম বড় মধুর। সদাশিব, তুমিও ভজবে ত আমাদের সঙ্গে। বলো, বলো, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।

সহসা ঘরের ভিতর থেকে উঠল ক্রন্দন ধ্বনি। 'কে যেন কাঁদছে না?' জিগ্গেস করলে নিমাই। হ্যাঁ, গদাধর ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। নিমাইয়ের ভাব দেখে সে আর পারছে না নিজেকে ধরে রাখতে।

'ও ত তোমার গদাধর। ও ত শিশুকাল থেকেই কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা। ও ত ছায়ার মত অনুসরণ করছে তোমাকে।' আকুল হয়ে বলে উঠল মুরারি।

'গদাধর, তুমিই ধন্য। সার্থক তোমার জন্ম। তুমি শিশুকাল থেকে ভজন

করছ কৃষ্ণকে। আমার জন্মটা গেল বৃথা-রসে। আমি ডাকতে পারলাম নারে। গদাধর বেরিয়ে আয়। অভিমান করে থাকিস না লুকিয়ে। আয়, আয় গদাধর আমার বুকে আয়।

কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল গদাধর। এসে পড়ে গেল নিমাইয়ের পায়ে। কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। নিমাই জড়িয়ে ধরল গদাধরের গলা। বলতে লাগল আক্ষেপ করে। 'ভাই গদাধর, আমি পেয়েছিলাম কৃষ্ণকে রে। কিন্তু হারিয়ে ফেললাম। নিজের দোষেই সে পালিয়ে গেল। দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। গদাধর, তুই বলনা, কোথায় গেলে আবার ফিরে পাব কৃষ্ণকে। তুই শোন…'।

কি যেন বলতে গিয়ে আর বলতে পারল না। মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। যেন দেহে নেই কোন প্রাণের স্পন্দন। নীরব, নিথর।

সন্ধ্যার সময় ঢলতে ঢলতে গৃহে চললো নিমাই। সারাদিন স্নানাহার নাই।

বসে আছেন শচীমাতা খাবার নিয়ে। সারাদিন বিষ্ণুপ্রিয়াও আহার করে নি। প্রভু তার অভুক্ত, কেমন করে খাবে সে। ভেবে যেন থৈ পায় না। কেন প্রভু তার এমন হল। গয়া থেকে যেন ফিরেছে সম্পূর্ণ অন্য মানুষটি। সে হাস্যোজ্জ্বল নয়ন লোভন মনোহর কান্তি, সে বিদ্যার মত্ততা, কোথায় অন্তর্হিত হল।

আর ভাল করে সম্ভাষণও করে না। কি যেন ভাবে। মাঝে মাঝে তাকায় বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে। কিন্তু সে দৃষ্টি ত দেখে না ওকে। যেন মনে হয় সুদূর প্রসারিত, কোন অদৃষ্ট লোকে খুঁজছে কাকে। তার সামনে যে বসে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া, সে হুঁসই যেন নাই তার। সে যেন অপরিচিত। চেনেই না প্রিয়াকে।

সন্ধ্যা তখন হয়েই গেছে। টলতে টলতে গৃহে এলো নিমাই। বসেছিলেন শচীদেবী। উঠে পড়লেন শশব্যস্তে। 'বলি নিমু সারাদিনটা কোথায় ছিলি? নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। এ কি হাল হয়েছে তোর শরীরের। হ্যাঁ রে, কোন কথা বলছিস না কেন?'

'আহা, কি দেখলাম, কি অপরূপ সুন্দর মধুর মূরতি।'

'হ্যাঁ, বেশ হয়েছে। চল ত আগে খেয়ে নিবি। তুই খাস না বলে বৌমাও যে এখনো খায়নি রে। একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখ। ওকে কষ্ট দিস নারে। ওযে তোকে ছাড়া আর কিছুই জানে না।'

শচীদেবী অনেক কষ্টে ধরে খাওয়ালেন নিমাইকে। প্রিয়া পরিবেশন করল

কাছে বসেই। পৌষের শেষ। শীতের প্রকোপ। নিমাইয়ের সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপ নাই। সে খাচ্ছে কি খাচ্ছে না, সেদিকে তার যেন কোন খেয়ালই নেই।

অন্যদিন খেতে বসে কত গল্পই না করত। আজ কিন্তু কোন কথাই নাই মুখে। চিন্তায় কেমন যেন ভেঙ্গে পড়েন শচীদেবী। একি হলো তার নিমাইয়ের। প্রার্থনা করেন, হে রঘুনাথ, তুমি তাকাও মুখ তুলে। ভাল করে দাও আমার নিমাইকে। ওকে ফিরিয়ে দাও ওর পূর্বাবস্থায়। ওকে অমন করে আমার কাছ ছাড়া করো না। বিষ্ণুপ্রিয়া সরলা অবলা বালিকা। তাকে দুঃখ দিও না প্রভু।'

নিমাই কিন্ত খেয়ে ঘরে রইল না। বললে—'মা, আমি দেখা করে আসি ওদের সঙ্গে। গয়া থেকে ফিরেছি, এখনো দেখা করা হয়নি সবার সাথে।'

'এত রাতে তুই আবার কোথায় যাবি ? আজকে আবার শীতটাও পড়েছে। সারাদিন ত খাওয়া দাওয়া না করে কেটেছে। এখন কোথাও যাস না। যেতে হয়, ও তখন কালকেই যাস।'

'কিন্তু মা, ওদের সঙ্গে যে দেখা করা একান্ত প্রয়োজন। গুরুজনদের একটা প্রণাম করেও ত আসতে হয়। ও তুমি কিছু ভেব না। আমি এক্ষুনি ফিরে আসব।'

নিমাই শুনল না মায়ের কথা। বেরিয়ে গেল চাদরটা গায়ে দিয়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেই ঘিরে ফেললো পড়ুয়ারা। একে একে নমস্কার করল তারা নিমাইকে। 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলে দাঁড়িয়ে গেল নিমাই। মুহূর্তে যেন চেতনা ফিরে এল তার। বললে—'ও, তাইত বটে, তোমাদের পাঠ অনেক দিন বন্ধ আছে।'

'আমরা আসছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আপনি গয়া থেকে ফিরেছেন শুনেই···।' ছাত্ররা আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল।

নিমাই বললে—'বেশ, বেশ। তা আমি ত এখন যাচ্ছি গুরুদেব গঙ্গাদাস পণ্ডিত মশায়ের বাড়ী।'

'তাহলে ত খুব ভালই হয়। আমরাও যাই চলুন আপনার সঙ্গে।'

পড়ুয়ারা ধরলে নিমাইয়ের সঙ্গ। তারা মনে মনে ভারী খুশি হলো। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে ইতিপূর্বেই দেখা করেছে তারা। বলেছে নিমাইয়ের ভাবান্তরের কথা। আশ্বাস দিয়েছেন তিনি নিমাইকে বুঝিয়ে বলবেন। যাতে শীঘ্র

আরম্ভ করে অধ্যাপনা। যখন নিমাই যাচ্ছে সামনা-সামনি সব কথাবার্তাও হবে।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিমাইকে দেখে ভারী খুশি হলেন। আনন্দ আলিঙ্গন করে বললেন—, বিদ্যালাভ হোক। তোমার বাবা ছিলেন আমার একান্ত সুহৃদ। তার পুণ্যবলে কুশলে পিতৃকার্য সম্পন্ন করে এলে। পুত্রের যোগ্য কাজই করেছ। অনেক দিন হলো বৃথা সময় নষ্ট হয়েছে। আর ত দেরী করা ভাল দেখায় না। এবার টোলে গিয়ে বসো। তুমি ত বিরাট পণ্ডিত হয়েছ। সারা গৌড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তোমার নাম। জানই ত,পাঠে অল্প ক্ষান্ত দিলেই অনভ্যাস হয়ে যায়। আর তোমার পড়ুয়ারা হয়েছে তেমনি, প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে তোমার কাছে ছাড়া পড়বে না। তাই ডোর বেঁধে রেখে দিয়েছে পুঁথিতে।'

তারপর ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'কি হে, ঠিক বলছি না?' বলতে বলতে হেসে উঠলেন আত্মপ্রসাদে গঙ্গাদাস পণ্ডিত 'হো-হো' করে।

অপরাধীর মত নিমাই বললে—'হ্যাঁ, পণ্ডিত মশাই আপনি ঠিক বলেছেন। আমার কেমন যেন খেয়াল ছিল না। আপনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভালই করলেন। কাল থেকেই বসব টোলে গিয়ে।'

'হ্যাঁ, বৃথা সময় নষ্ট করো না। অনেক রাত হলো, আজকে আবার শীতটাও পড়েছে বড় চেঁসে। এখন এসো।'

নিমাই সহ ওরা সকলে বেরিয়ে এল গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী থেকে।

অনেক রাত। শীতের নবদ্বীপ ঘুমুচ্ছে চাদর মুড়ি দিয়ে। সহসা বিষ্ণুপ্রিয়ার ডাকে চমকে উঠলেন শচীদেবী। 'মা, ও মা, শীগ গির ওঠ।'

'কে, বউ মা?'

'এস নাগো, ও যেন কেমন করছে।'

কপাট খুলে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন শচীমাতা। দেখলেন নিমাই বিছানায় নেই। বসে আছে খালি গায়ে মেঝের উপরে। দৃকপাত নাই কোন দিকে। কাঁদছে, আকুল হয়ে শুধু কাদছে নিমাই।

উৎকণ্ঠায় কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে বললেন—'কি হয়েছে রে নিমাই, অমন করে কাঁদছিস কেন?'

কোন কথা বলে না নিমাই। শুধু কাঁদছে আর কাঁদছে। প্রিয়া একপাশে দাঁড়িয়ে আছে জড়সড় হয়ে। বড় দুঃখ হল শচীমাতার। আকুল হয়ে উঠলেন

তিনি। বললেন—'বাবা কথা বল। শুধু কাঁদছিস কেন, কি হয়েছে ?'

'তুমি স্থির হও মা।'

'তুই স্থির হলেই ত আমি স্থির হই। এত শীতে খালি গায়ে বসে বসে শুধু কাঁদছিস কেন। কি হয়েছে তোর, খুলে বল ?'

'জানো মা, স্বপ্ন দেখলাম। এসেছেন আমার শ্যামসুন্দর। বাঁশী বাজাচ্ছেন শিয়রে দাঁড়িয়ে। কি সুন্দর সু-স্বর। কি অপরূপ। গলে বনমালা। মাথায় শিখি পুচ্ছ। মা, ওই ত আমার কৃষ্ণ। আমার নয়নলোভন হৃদিকান্ত। আমার প্রাণ-ধন। আমার অন্তর সুন্দর। মাগো, আমি তাকে ভুলতে পারছি না কিছুতেই।'

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল নিমাই। শচীদেবী গায়ে, মাথায়, পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন আদর করে। সান্ত্বনা দিলেন—'ও ত স্বপ্ন বাবা। ওর জন্য অত আকুল হলে কি চলে। স্বপ্ন কখনো সত্য হয়। স্থির হ বাবা। দেখ দেখি, তোর কান্না দেখে কি রকম বৌমাও ফুলে ফুলে কাঁদছে।'

মায়ের কথা শুনে যেন অনেকটা শান্ত হলো নিমাই। একবার চোখ তুলে তাকাল প্রিয়ার দিকে। কাঁদছে বিষ্ণুপ্রিয়া। মাঝে মাঝে আঁচলে মুছছে চোখের জল।

'প্রিয়া, তুমিও কাঁদছ। দেখছ আমার কৃষ্ণকে। কি সুন্দর মনোহর কান্তি, তাই না প্রিয়া ? বলো না, তুমি অমন চুপ করে রয়েছ কেন ?'

এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়া। বলে—'তুমিই ত আমার কৃষ্ণ। তুমিই ত আমার মদন মোহন। তুমি কাঁদলেই আমি কাঁদি।'

শচীদেবী পারলেন না নিজেকে ধরে রাখতে। তিনি কেঁদে উঠলেন ড়করে।

'তোমরা সকলেই কাঁদছ। হ্যাঁ, এমনি করেই কাঁদো। বলো, কৃষ্ণের কথা বল। তার নাম কীর্তন করো।' অনুনয় করে বললে নিমাই।

'তা বাবা; তুই বল। তোর কৃষ্ণের কথা শোনা আমাদের।' বললে শচীদেবী। এবার নিমাই যেন অনেকটা শান্ত হলো। সংযত করল নিজেকে। বললো—'তোমরা কৃষ্ণের কথা শুনবে। স্থির হও। বসো আমার কাছে' বলে আরম্ভ করল কৃষ্ণ কথা। নিমাই কৃষ্ণের কথায় কাটিয়ে দিল সারা রাত। মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে বসে শুনছে বিষ্ণুপ্রিয়া আর শচীদেবী। কি সুন্দর করে বলছে নিমাই। যত শোনে, আরো শুনতে ইচ্ছে করে। কৃষ্ণ নাম, এতে অতৃপ্তি কোথায়। এ নামে মাধুর্য আছে। আছে মাদকতাও। তায় নিমাইয়ের মুখে কৃষ্ণ নাম। সে ত অমৃত সমান। তাই ঘুম নাই কারো চোখে।

ক্লান্তি নাই দেহে। অবসাদে ক্লিষ্ট করে না মন কে। বিষ্ণুপ্রিয়া মুগ্ধ বিস্মিত। তার মনের মধ্যে যেন আর কোন অভিমান, কোন বেদনা নেই বিন্দু মাত্র। এক অপার্থিব আনন্দে ভরে উঠেছে দেহের প্রতিটি কোষ।

শুনতে শুনতে প্রভাত হয়ে গেল। বৃক্ষের শাখায় শাখায় পাখিদের কলকাকলি সম্ভাষণ জানালো উষার নবারুণকে।

প্রাতঃস্নান করে আসতেই প্রিয়া বাড়িয়ে দিল প্রাতঃরাশ। নিমাই খেয়ে চাদরটা কাধে দিয়ে চললো টোলে। গিয়ে দেখল শতাধিক পড়ুয়া উপস্থিত। আসন গ্রহণ করতেই হরি ধ্বনি দিয়ে পড়ুয়ারা খুললো পুঁথির ডোর। হরি ধ্বনি শুনেই পুলকিত হয়ে উঠল নিমাইয়ের মন। বললে—'কি মধুর, অমিয় মাখা নাম। কৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমরা এসেছ বিদ্যা শিক্ষা করতে। এত শুধু অনর্থক কালক্ষেপ। শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তিই হলো জীবনের পরম পুরুষার্থ।'

সকলে তাকিয়ে রইল অধ্যাপকের মুখের দিকে। নিমাই শ্রীকৃষ্ণ ভজনকে জীবের প্রধান উদ্দেশ্য, শ্রীকৃষ্ণকে ডাকার জন্যই যে আমরা এসেছি পৃথিবীতে, তাই বুঝাতে লাগল নানা ভাবে, নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করে। মন্ত্রমুগ্ধের মত একাগ্র চিত্তে শুনছে ছাত্রগণ।

বলতে বলতে সহসা চুপ করে গেল নিমাই। বাহ্যজ্ঞান তার যেন ফিরে এলো। বুঝতে পারল, সে এসেছে টোলে ছাত্র পড়াতে। পাঠ দেবে ছেলেদের। তা না, এখানেও সেই কৃষ্ণকথা। এখানেও সেই ভাবাবেশে ভগবদ্‌গুণ বর্ণন। এ কি করছে নিমাই। নিজেকে সে সংযত করল। বললে—'আজকে এই পর্যন্ত যাক। রইল মঙ্গলাচরণ হয়ে। বিকেলে তখন আরম্ভ করা যাবে পাঠ। এখন চল, গঙ্গাস্নানে যাই।'

নিমাইয়ের ভাবান্তর বড় ভাবিয়ে তুললো শচীদেবীকে। বিমূঢ়া বিষ্ণুপ্রিয়া। একি হলো। কেন ঘটল এমন অঘটন। কি মানুষ কি হয়ে গেল।

'গয়াধামে ঈশ্বর পুরী কিবা মন্ত্র দিল।
সেই হতে নিমাই আমার পাগল হইল॥'

শচীদেবীর মনে অতীতের দিনগুলো কেমন যেন ভাস্বর হয়ে ওঠে। অতীতের সেই ফেলে আসা অধ্যায়গুলো। বাল্যে কি দুষ্টুটাই না ছিলো। সে কি দুরন্তপনা। সে দুষ্টুমির মধ্যে ছিল মধুরতা। তারপর এল চাঞ্চল্য। নিমাইয়ের দুরন্তপনাতে অস্থির হয়ে উঠল পাড়াপড়শী। তারপর কৈশোরে

কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে লীলা বিলাস। যৌবনের দ্বারদেশে নিমাই বিখ্যাত পণ্ডিত। নদীয়াশিরোমণি। একজন পরিপূর্ণ আদর্শ গৃহী। অতিথি পরায়ণ। কোথায় হারিয়ে গেল সে সব দিন।

ভাবতে ভাবতে ঠিক দীর্ঘশ্বাস নয়, কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন শচীদেবী। একি সর্বনাশ হলো তার। যার মুখ দেখে তিনি ভুলে যেতে চাইছেন সকল দুঃখ, সকল ব্যাথা, সেই নিমাই তার কেন এমন হলো।

বিষ্ণুপ্রিয়া শ্বাশুড়ীকে বললে—'মা, ওকে ভাল কোবরেজ দেখান। চিকিৎসা করুন।'

বৌমার কথা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন শচীদেবী। কিন্তু মন যেন তাঁর কেমন সায় দেয় না। তাই কখনো সম্ভব। মাথা খারাপ হয়েছে তাঁর নিমাইয়ের। কিম্বা কোন ভূত-প্রেতের দৃষ্টি পড়েছে কি—এমন হতে ও ত পারে। কিন্তু তাইবা কেমন করে হয়। অত বড় সিদ্ধ সাধু যাকে দীক্ষা দিয়েছেন, তার শরীরে পড়বে প্রেতের ভাব। শচীদেবীর মন কেমন যেন এমনি নানান সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকে।

বিষ্ণুপ্রিয়া দুশ্চিন্তা আর বেদনায় অধীর। উদ্ভিন্ন যৌবনা, অর্ধপ্রস্ফুটিতা মুকুলিকা যেন সে। প্রেম আর শ্রদ্ধার ডালি নিয়ে দীর্ঘ চার মাস অপেক্ষা করে আছে। অনন্য চিত্ত হয়ে প্রভুর প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় কেটেছে তার দিন আর রাত্রি।

কিন্তু এ কে ফিরে এল ?

জীবন্ত দেহ, অথচ যেন বড় হৃদয়হীন।

প্রণয় সম্ভাষণ, নাইবা করল। অন্তরঙ্গ স্নেহমধুর দুটো কথাবার্তা, তাও কি আশা করতে পাবে না বিষ্ণুপ্রিয়া।

এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে ওঁর কি একবারও মনে পড়েনি এই অভাগীর কথা। বিরহ ব্যথার কাতর হয়নি কি ওঁর মন। এটুকুও ত শুনতে আশা করে প্রিয়া। কিংবা দেশভ্রমণের বিচিত্র কাহিনী। পথের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। তীর্থযাত্রী-দলের গল্প। পান্থনিবাসের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এ সব শুনতে ভারী ইচ্ছে করে বিষ্ণুপ্রিয়ার। ও কত আশা করে ছিল, যে দিন অনধ্যায় থাকবে, টোলে যাবে না নিমাই। কিংবা রাত্রিতে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করে একান্ত সংগোপনে নিশ্চয় শোনাবে ও।

কিন্তু এ সব প্রত্যাশা, রাত্রির সুখ-স্বপ্নের মত। প্রভাতের বাস্তব রূঢ়তায় কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেল।

পূর্বের স্নেহটুকুও যেন অন্তর্হিত। শয়ন করতে এলে পূর্ব অভ্যাস মত

পদসেবা করতে বসে বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু নিমাইয়ের মুখে নাই কোন সম্ভাষণ। নির্জীব মূর্তির মত গ্রহণ করে সেবা। এমন ত পূর্বে কখনো করত না। এ যে ছিল ওর স্বভাব বিরুদ্ধ। সস্নেহে আকর্ষণ করে টেনে নিত বুকের কাছে। সে সব দিনের কথা কি ও ভুলে গেল একেবারে। যেন আমার অস্তিত্বই আজকাল অনুভব করে না ও।

এক একবার ভারী সন্দেহ হয় বিষ্ণুপ্রিয়ার। আমার সেই মানুষটিই ফিরে এসেছে ত! পরক্ষণে ধিক্কার দেয় নিজের সন্দেহকে।

এ আমি মাথামুণ্ডু কি সব ভাবছি। শেষে আমারই কি মাথার গণ্ডগোল হলো। ওর বদলে আমাকেই কি দেখাতে হবে কোবরেজ।

ওই ত, গঙ্গার ঘাটে প্রথম যাকে দেখিছিলাম, যার সঙ্গে প্রথম চার চোখের মিলন হয়েছিল, অবিকল সেই মানুষটিই ত আছে সেই দিব্য কান্তি, সেই সুদীর্ঘ বপু, সেই মাথার কুঞ্চিত চিকুর। না, দীর্ঘ পথশ্রমে, অনিয়মে, অনাহারে কই এতটুকু ম্লান ত হয়নি। আরো দ্বিগুণ অঙ্গের জ্যোতি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপূর্ব প্রভায় এ দৃশ্য ত বিষ্ণুপ্রিয়া দেখেছে নিজের চোখে। রাত্রির অন্ধকারে, প্রদীপের মৃদু আলোকে গৌরকান্তি সত্যি হয়ে ওঠে অপূর্ব গৌরবান্বিত। তখন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়া। পলক যেন পড়ে না কিছুতেই। দেখেছে, স্বচক্ষে দেখেছে প্রিয়া, প্রদীপের মৃদু আলোকে ওর অধরোষ্ঠের মাধুর্যময় অপূর্ব হাসি। প্রদীপের শিখায় দেখেছে প্রিয়া গৌর দিব্য কান্তি।

টোলে টলতে টলতে চলছে নিমাই।

ভাবছে মনে মনে। না, আজ আর কোন মতেই বেহুঁস হবে না। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে পড়ুয়ারা অভিযোগ জানিয়েছে। সে নাকি যা কিছু পড়ায়, সব কথাতেই টেনে আগে কৃষ্ণকে। তিনি তিরস্কার করেছেন। এ কি হচ্ছে তার। কৃষ্ণভজা রোগে ধরেছে নাকি। কৃষ্ণছাড়া কি আর কথা নেই জগতে। ও সব বুজরুকি চলবে না। ভাল করে মন দিয়ে পড়াতে হবে। তাই করবে নিমাই। গুরু আজ্ঞা পালন করবে।

কিন্তু টোলে এসে বসতে একি হলো নিমাইয়ের। সব যেন কেমন উল্টো-পাল্টা হয়ে গেল। চিন্তা করে দেখলে তার দ্বারা আর পড়ান সম্ভব নয়। শুধু শুধু পড়ুয়াদের সে ক্ষতি আর করবে না। তাই বললে—

'দেখো তোমাদের একটা গোপন কথা বলি। এ কথা অন্য কারো কাছে

বলা যায় না। তোমরা আমার অন্তরঙ্গ আত্মীয়। তাই তোমরা আমার গোপন কথা শোনার প্রকৃত অধিকারী। শোন, এগিয়ে এস সকলে। একেবারে আমার দিকে। আমি তোমাদের কি পড়াব বলো। সব সময় দেখি, কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু আমার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। কি সুন্দর নয়ন ভোলান মূর্তি তার। তাকে দেখব না তার বাঁশি শুনব। আমি কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ি। তখন দেখি সর্বত্র কৃষ্ণময়। আমার কোন জ্ঞান থাকে না। পড়াতে গেলে বদনে স্ফুরে কৃষ্ণের নাম। তাহলে কেমন করে পড়াই বলো ত?'

পড়ুয়ারা জবাব দেবে কি, এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল উৎসুক হয়ে। এ কি বলছে তাদের অধ্যাপক। যেন নিজেদের কানকে নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারছে না।

'তোমরা খুব অবাক হয়েছ, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ—

'সবে দেখোঁ তাই, সেই বোলোঁ সর্বথায়
কৃষ্ণ বর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়॥
যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখো—গোবিন্দের ধাম॥
কৃষ্ণ বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনার॥'

তাই বলছিলাম কি, আমার কাছে পড়া, বিড়ম্বনা মাত্র। তোমরা এক কাজ করো, অন্য গুরুর স্মরণাপন্ন হও। আমি তোমাদের অনুমতি দিচ্ছি। যার কাছে ইচ্ছে, তাঁর কাছে গিয়েই পাঠ গ্রহণ করো। দয়া করে আমাকে নিষ্কৃতি দাও।' অশ্রু সজল চক্ষে প্রশ্নে ডোর বাঁধলে নিমাই

'আমরা আর কার কাছে পড়ব। আপনি ছাড়া কে আর আমাদের এত স্নেহ, এত যত্ন আদর করে পড়াবে। না, আমরা কোথাও যাব না। পড়তে হয় আপনার কাছেই পড়ব।' সমস্বরে কাঁদতে লাগল পড়ুয়ারা। 'যা শিখেছি আপনার কাছে, তাই আমাদের যথেষ্ট' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সকলে।

নিমাই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। একে একে সকলকে স্নেহ ভরে আলিঙ্গন করল। বললে—'আমি যদি একদিনও কৃষ্ণকে ডেকে থাকি, তাহলে তোমাদের আশীর্বাদ করি তোমাদের জীবনের অভিলাষ পূর্ণ হোক। বিদ্যার স্ফূর্তি হোক কৃষ্ণ-কৃপায় তোমাদের হৃদয়ে। বিদ্যা আর কি? কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ-বিলাসই তো বিদ্যা। তোমরা নিরবধি শোন কৃষ্ণ নাম। তোমাদের বদন মুখর হয়ে উঠুক কৃষ্ণ নাম গানে। এস, আমরা সকলে মিলে কৃষ্ণ-কীর্তন করি।'

কৃষ্ণ কীর্তন কেমন, তা তো আমরা জানি না। আপনি শিখিয়ে দিন।' কাঁদতে কাঁদতে বললে সকলে।

হাতে তালি দিতে দিতে গেয়ে উঠল নিমাই—

'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
(যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ।)
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'

পড়ুয়ারাও তালি দিতে লাগল। সমস্বরে গাইতে লাগল সুমধুর স্বরে। গাইতে গাইতে কেমন যেন নেশা ধরে গেল। কৃষ্ণ-প্রেম-সমুদ্রের চারিদিকে উঠল উত্তাল তরঙ্গ। পাড়াপ্রতিবেশীরা ছুটে এল চারিদিক থেকে। মনে করল মুকুন্দ সঞ্জয়ের চন্ডীমন্ডপের চৌপাটিতে বুঝি কৌতুক রঙ্গের আসর বসেছে। কিন্তু একি, এত খেমটা রসের গান নয়। এযে ভক্তি-ভাবের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম। কেউ নাচছে বাহু তুলে। কেউ আবার গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। আর নিমাই পন্ডিত, নিজনাম রসে আবিষ্ট হয়ে কীর্তনানন্দে আছাড় খাচ্ছে বারে বারে।

দেখে নয়ন সফল করছে সকলে। জগতে এত ভক্তি আছে, এত প্রেম আছে, তা কে জানত আগে। সকলে বলাবলি করতে লাগল—

'হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়।
না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছে এবা কিবা নয়॥'

১৪৩০ শকাব্দ। নবদ্বীপে হলো এই কীর্তনের প্রথম উদয়। মহাপ্রভুর প্রকাশেরও হলো শুভ সূচনা।

ওদিকে শচীদেবী আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠেও উঠল কীর্তনের বোল। সে কীর্তন কান্নার। সে কীর্তনের ঘরানা বিরহ-বেদনা-বিধুর। বিষ্ণুপ্রিয়ার ব্যথার বাসরে ব্যথিত চন্দ্র তারা। কৃষ্ণ-প্রেম রসে হায় নিমাই হইল হারা।

হতাশায় হাহাকার করে উঠল শচীদেবীর হৃদয়।

একি হলো, একি করল নিমাই। টোল বন্ধ করে দিল। তাহলে চলবে কেমন করে সংসার। আবার বেঁচে থাকতে হবে পাড়া প্রতিবেশীর দয়ায়। সনাতনের বাড়ী থেকে অবশ্য পর্যাপ্ত তৈজসপত্র আসে। কিন্তু তাতে কি সংকুলান হয়। দেখতে সংসারটি ছোট। কিন্তু অতিথি অভ্যাগতের ত বিরাম নেই মেলার মত লোক আসছে ত আসছেই। সকাল সন্ধ্যায় কখনো

লোকের বিরাম নেই। যেই আসুক, অতিথি সৎকারে ত্রুটি হলে চলবে না। অতিথি বিমুখ হলে গৃহস্থের অকল্যাণ। কিন্তু কোথা থেকে চলবে। নিমাই যদি তার এমন হয়ে যায়।

কোথা ছিল নিমাই। এসে জড়িয়ে ধরলে মায়ের গলা হাসতে হাসতে বললে—'এইতো, এইতো আমার মা যশোদা।'

আজকাল এ আবার এক পাগলামো শুরু করেছে। কখনো বলছে—'মা, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কৃষ্ণের খোঁজে বৃন্দাবনে যাই।'

বয়স ত আর কম হলো না। প্রায় ৬৭ বছর। কিন্তু ভাগ্যটা বড় খারাপ শচীদেবীর। বড় ছেলেটার কোন সন্ধান নাই। কোথায় যে বিবাগী হয়ে চলে গেল, আজো তার কোন হদিস মেলেনি। স্বামীকেও হারালেন। পর পর আটটি কন্যা হলো। বাচল না একটিও। তারা থাকলেও কতকটা সান্ত্বনা পেতেন শচীদেবী। সব হারিয়ে সবেধন নীলমণি তার নিমাই। কিন্তু হায়, তার কানেও বেজে উঠল কালার বাঁশি। আকুল হয়ে উঠেন তিনি। রঘুনাথের মন্দিরে গিয়ে লুটিয়ে পড়েন তাঁর পদপ্রান্তে।

'অনাথিনী মোরে প্রভু, এই দেহ বর।
সুস্থচিত্তে গৃহে মোর রহুক বিশ্বম্ভর॥'

কেমন যেন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। বুঝতে পেরেছেন, নিমাইকে আর ঘরে ধরে রাখা যাবে না। তাইতো এই কাতর প্রার্থনা।

কত আশা শচীদেবীর। নিমাই তার জুড়িয়ে দিয়েছে অন্তরের জ্বালা। বিরাট পণ্ডিত হয়েছে নিমাই। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা সকলে শ্রদ্ধা করে নিমাইকে। শুধু কি নবদ্বীপে সারা গৌড় ছড়িয়ে পড়েছে তার খ্যাতি। যশ সৌরভে পরিব্যপ্ত সারাটা দেশ। ছেলেকে বিয়ে দিলেন শচীদেবী। যেন নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী এসে দাঁড়াল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সুখ তার কপালে সইল না। লক্ষ্মী তার পুত্রের বুকটাকে ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেল স্বর্গে। লক্ষ্মীহারা নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকালে অন্তর তার শুকিয়ে উঠত। যাতে নিমাইয়ের বুকে লক্ষ্মীর বিরহ দাগ না কাটতে পারে, সেজন্য তিনি দেখে শুনে ঘরে আনলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। কত আশা শচীদেবীর, রূপে গুণে, বিনয়ে নম্রতায় নিশ্চয়ই নিমাইকে সে খুশি করতে পারবে। ভুলিয়ে দিতে পারবে লক্ষ্মী হারানোর ব্যথা। নির্বাচন ত ভুল হয়নি তার। বিষ্ণুপ্রিয়া রাজপণ্ডিতের দুলালী। সে যোগ্যতা তার আছে। ছন্দে, সুরে শচীদেবীর সংসারকে সে মধুময় করে তুলেছে কিন্তু একি হলো। গয়া থেকে ঘুরে এসে নিমাই যে সম্পূর্ণ বদলে গেল। গয়ার গোবিন্দ কি তার সব সুখ কেড়ে নিতে চান।

হে প্রভু, এ অভাগিনীকে আর তুমি কাঁদিও না। অন্ততঃ একটি একটি ভিক্ষে দাও। একটি ভিক্ষে মঞ্জুর কর তুমি। আমার বিশ্বম্ভরকে কোল থেকে কেড়ে নিও না। এটুকু করুণা চাইছি তোমার শ্রীচরণে।

শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজাতে বসে মনের মত করে। যদি রূপসীর রূপে আকৃষ্ট হয় নিমাই। দৃষ্টি যদি ফিরে প্রিয়ার প্রতি। যৌবনের পদধ্বনি প্রিয়ার প্রতি অঙ্গে হচ্ছে অনুরণিত। অঢেল ঐশ্বর্যে ভরপুর প্রিয়া। যুবক নিমাই। ভোগের সামগ্রী সামনে ধরলে সে কি মুখ ফিরিয়ে নেবে। স্পর্শ করবে না।

কিন্তু শচীদেবীর সব চেষ্টা বুঝি ব্যর্থ হয়। নিমাইয়ের দৃষ্টি যুবতীর দেহ পেরিয়ে সুদূরে প্রসারিত। বিশ্বসৌন্দর্যের পানে আকৃষ্ট। সে খুঁজছে বিশ্বস্রষ্টাকে। সে চাইছে অরূপ কে রূপের মধ্যে ধরতে। অসীমকে সীমার মধ্যে বাঁধতে।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে সামনে বসিয়ে দেয় উপদেশ। এ সংসার ত অনিত্য। নশ্বর। এর জন্য এত মাতামাতি কেন। কথা বলতে বলতে কখনো উঠে বিকট গর্জন করে। কেঁপে উঠে প্রিয়ার বুক। মুখ যায় শুকিয়ে। কোমল বক্ষ তার উঠে দুরুদুরু করে। ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে প্রিয়া। তাড়াতাড়ি ব্যজনি নেয় হাতে। বাতাস করতে থাকে নিমাইয়ের দেহে। পদ সম্বাহন করে অনুরাগ ভরে।

গৌর তনু আবেশে অবস। চোখে তার জল। স্বভাবে নেই নিমাই। কাঁদছে, কৃষ্ণ অদর্শনে কাঁদছে নিমাই।

সহসা নিজেকে একটু সামলে নেয়। তাকায় অসহায়ভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে। করুণ কণ্ঠে বলে—'ওগো, এখন যে আমার তোমার দিকে তাকাবার অবসর নাইগো। আমার কোন কিছু বুঝবার সাধ্যও নেই, নাম করো। কৃষ্ণ নাম! আমায় শীতল কর, কৃষ্ণ বিরহে পুড়ে যাচ্ছে সর্ব অঙ্গ। ওগো, কৃষ্ণ নাম শুনিয়ে শীতল কর এ দহনদীপ্ত অঙ্গ।'

কেমন যেন আশা বসে বিষ্ণুপ্রিয়ার। এই ত প্রভু কথা বলেছেন। বুকে ভরসা হচ্ছে। বিষ্ণুপ্রিয়া সাহস করে এগিয়ে যায় নিমাইয়ের কাছে। আরো ঘনিষ্ঠ হয়। ধীরে ধীরে আড়ষ্ট কণ্ঠে বলে—'আমি যে কৃষ্ণ নাম জানি নাগো তুমি আমায় শিখিয়ে দাও। তোমার কাছে বসে বসে কৃষ্ণ নাম করব। তুমি যেমনটি চাও, তেমনি করে গাইব।'

'সত্যি তুমি প্রিয়া কৃষ্ণ নাম গাইবে?' আগ্রহ ভরে প্রিয়ার দিকে ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে নিমাই।

কথা বলে না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় প্রিয়া।

'তাহলে আমি আগে গাই। তুমি শোন, যেমনটি গাইব, ঠিক তেমনি করে গাইবে। কেমন!' ভাবাবেগে নিমাই ধরলে—

'ভজ শ্রীকৃষ্ণ, কহ শ্রীকৃষ্ণ, লহ শ্রীকৃষ্ণের নাম রে।
যে জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে॥'

কই বিষ্ণুপ্রিয়া গাবে। গাও, গাও প্রাণভরে। মুদ্রিত দু'নয়ন বিষ্ণুপ্রিয়ার। সে ধীরে ধীরে আরম্ভ করল গাইতে—

'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে॥'

'এ তুমি কি গাইলে প্রিয়া। এত কৃষ্ণ নাম নয়। এ তোমায় কে শেখালে?'

'আমি ত কেবল তোমার নামটিই জানি গো। আর ত কাউকে চিনি না? কাউকে জানিও না। তুমিই ত আমার কৃষ্ণ, তুমিই ত আমার মদনমোহন।' ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বললে বিষ্ণুপ্রিয়া। ঝরে পড়ছে দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ধারা।

'কিন্তু প্রিয়া, ও নামে ত আমার কৃষ্ণকে পাবে না?'

'আমি ত কৃষ্ণকে চাইনা গো। আমি চাই তোমাকে। তুমি অত উতলা হয়ো না গো। শান্ত হও। তুমি যে মাকে অত ভালবাস, ভক্তি করো। তুমি কি বোঝ না মায়ের দুঃখ। তুমি বলো ত, মাকে কে রক্ষে করবে?'

'কেন, কৃষ্ণ রক্ষে করবেন?' নিরাসক্ত ভাবে বললে নিমাই।

কৃষ্ণ নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নিমাই আবার আকুল হয়ে উঠল। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলতে বলতে কেমন যেন অবস হয়ে গেল। নিথর। নিস্পন্দ। শুধু ঠোঁট দুটি নড়ছে মৃদু মৃদু। ক্ষণ পরে তাও আর নড়ছে না। বুঝি অন্তরে অন্তরে জপে চলেছে কৃষ্ণ নাম। শিয়রে জেগে একা বিষ্ণুপ্রিয়া অতন্দ্র। সে যে তার সর্বস্ব সমর্পণ করেছে গৌরাঙ্গরে।

সনাতন মিশ্র শুনেছেন সব। সে ত পরম বৈষ্ণব। নিমাইও বৈষ্ণব হয়েছে। খুব আনন্দের সংবাদ। কিন্তু তাই বলে টোল বন্ধ করে দিয়েছে, মনের দুঃখে পড়ুয়ারা অন্য টোলে চলে গেছে। এসব সংবাদ শুনে তিনি ব্যথিত হয়েছেন মনে মনে। কিন্তু কি বলবেন তিনি নিমাইকে। সংবাদ শুনে এসেছিলেন মেয়ের বাড়ীতে।

কি বলে কাকে সান্ত্বনা দেবেন। শচীদেবীর দুঃখ দেখা যায় না চোখে। অবশ্য দু'একটা কথা যে বলেননি এমন নয়। যিনি দুঃখ দিয়েছেন, তিনিই দুঃখ হরণ করবেন। তিনি যে দুঃখহারী মধুসূদন। উদ্ধার করবে লক্ষ লক্ষ জীবকে। আমার মন বলছে, নিমাই সাধারণ মানুষ নয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া কোন দুঃখ প্রকাশ করেনি বাবার কাছে। সে ত তার সর্বকিছু সমর্পণ করে দিয়েছে নিমাইকে। অভিযোগ তার কিছুই নাই॥ যদি কিছু জানাতে হয়, সে তার প্রভুকেই জানাবে। অন্তরের দঃখ থাক অন্তরেই।

মহামায়া শুনে অবশ্য ব্যথিত হয়েছেন। প্রিয়ার জন্য মাতৃ হৃদয় তার হয়ে উঠেছে উতলা। কিন্তু তিনি কি করবেন। পেটে ধরেছেন, দুঃখের ভাগ ত নিতে পারবেন না।

॥ চব্বিশ ॥

'মা গো, ওমা, বেরিয়ে এস। এই দেখো কাকে এনেছি। তোমার বড় ছেলে গো'

শচীদেবী ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন বাইরে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আগন্তুকের মুখের দিকে। দেখছেন অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে। ক্ষণ পরে বললেন—"বাবা, নিমাই বলছে তুমি, তুমি আমার বিশ্বরূপ এ কি সত্যি ?'

'হ্যাঁ মা, আমিই ত তোমার সেই বিশ্বরূপ।'

'অ্যাঁ, সত্যিই তুই ফিরে এসেছিস।'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে গেলেন শচীদেবী। 'ওরে বাপ, ফিরে এসেছিস।' বলতে বলতে জাপটে ধরলেন কোলের মধ্যে। গায়ে, হাতে, মাথায়, মুখে হাত বুলোতে লাগলেন পরম স্নেহভরে। আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল তাঁর দুটি নয়ন বেয়ে। বারে বারে আবেগে আপ্লুত হয়ে বলতে লাগলেন—

'এত দিন মার কথা ভুলে ছিলি কেমন করে বাবা মাকে ফেলে এমন করে কি থাকতে আছে। আমি যে তোর জন্য কত কেঁদেছি। কত ভেবেছি। তুই কোথায় ছিলি বাবা ?'

মায়ের কোলে বসে মৃদু মৃদু হাসছে নিতাই। মাতৃস্নেহ হৃদয় ভরে লুটে নিচ্ছে সে। বহু কাল পরে বসেছে মায়ের কোলে। সে ত মাতৃস্নেহ উপভোগ করতেই।

বর্ধমানের একচাকা গ্রাম। সেখানেই জন্মেছে নিত্যানন্দ। বাবার নাম হাড়াই, আর মায়ের নাম পদ্মাবতী মা বাবা নাম রেখেছিল কুবের। বয়স যখন বারো। বাড়ীতে এল এক সন্ন্যাসী। হাসি-খুশি কুবেরকে দেখে, হাড়াইকে জিগগেস করলে সন্ন্যাসী—'এ ছেলের নাম কি ?'

'কুবের।'

হাসল সন্ন্যাসী। 'সদানন্দ যে ছেলে আর নিত্যের প্রতি যে অভিমুখী। তার নাম ত নিত্যানন্দ হওয়া উচিত ছিল। তা তুমি আমায় একটি ভিক্ষে দেবে ?'

'কি ভিক্ষে চাই বলুন ?'

'তোমার ছেলেটি আমাকে দাও না। নানা, চিরকালের জন্য চাইছি না। আবার তোমাকে ফিরিয়ে দেব। কিছু দিন পরে ফিরে আসবে ও।'

হাড়াই ওঝা সম্মত হল সন্ন্যাসীর কথায়। মা পদ্মাবতীও আপত্তি করলেন না। অতএব কুবের নিত্যানন্দ হয়ে চললো সন্ন্যাসীর সঙ্গে।

তীর্থযাত্রী হয়ে ঘুরে বেড়াল তীর্থে তীর্থে। কত তীর্থই না ঘুরল। বক্রেশ্বর থেকে সুরু করে বৈদ্যনাথ, সেখান থেকে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা বৃন্দাবন। তারপর—

'বলরাম কীর্তি দেখি হস্তিনানগরে।
ত্রাহি হলধর বলি নমস্কার করে॥'

এমনি তীর্থে তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখা হয়ে গেল শঙ্করারণ্যের সঙ্গে। ওকে দেখে ভারী ভাল লাগল নিতাইয়ের। ভাবও হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। জিগ্‌গেস করলে নিতাই—'তা ভাই, তোমার পূর্বাশ্রমের নাম কি ? কোথায় ছিল বাড়ী ?' নিতাই জানতে চাইলে ঠিকানা।

শঙ্করারণ্য বললে—'নাম ছিল আমার বিশ্বরূপ। জগন্নাথ মিশ্র বাবার নাম। মায়ের নাম শচীদেবী। বাড়ী নবদ্বীপে। আমার আরো একটি ছোট ভাই আছে। নাম তার বিশ্বম্ভর। ডাকে সবাই নিমাই বলে। এ ছাড়া আরো তার নাম আছে। গৌর, গোরা, গৌরাঙ্গ। যদি কোন দিন যাও নবদ্বীপের ওদিকে, যেও আমাদের বাড়ীতে। দেখে এসো ভাইকে।'

শুনে ভারী খুশি হয়েছিল নিতাই। সন্ন্যাসী ত ঘর বাঁধে না কোথাও। তায় আবার অবধূত নিতাই। পথই তার সম্বল, ঘরও তার পথেই। দক্ষিণ ভারত দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নীলাচল, সেখান থেকে গঙ্গাসাগর। আবার হাজির মথুরায়। হাঁটিতে হাঁটিতে বৃন্দাবন। এখানে এসে, কেমন যেন কাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল পাগলের মত।

'নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে কে বুঝে সে রস॥'

দেখা হয়ে গেল ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে। জিগ্‌গেস করলেন পুরী—'তা শ্রীপাদ, আপনি ইতিউতি কাকে খুঁজছেন এত ?'

'কেন, তুমি জান না ? সেই নন্দের ব্যাটা কানু গো। তাকেই ত আমি খুঁজছি বৃন্দাবনের বনে বনে। বলতে পার, কোন বনে সে লুকিয়ে রয়েছে ?' জিগ্‌গেস করলে নিতাই।

'তা এখানে ত তুমি তাকে পাবে না। সে ত এখানে নেই। গেছে সেই নবদ্বীপে।'

'কি নাম তার?'

'নিমাই পণ্ডিত গো। দেখতে যদি চাও, নবদ্বীপেই যাও। এখানে খুঁজছ যে পাবে কোথায়।' ঈশ্বর পুরী চলে গেলেন পাশ কাটিয়ে।

নিতাই তাই ত এসেছে নবদ্বীপে। ও জিগ্যেস করে করেই পৌঁছে গেছে। না, অসুবিধে কোন হয়নি। এসে উঠেছে নন্দন আচার্যের বাড়ীতে। ছিল লুকিয়ে নিমাই-ই খুঁজে বের করেছে নিতাইকে। সে আগে ভাগেই বুঝতে পেরেছিল সব। খুঁজতে অবশ্য পাঠিয়েছিল অনেককে। কিন্তু খুঁজে পায়নি কেউ। নিমাই সটান গিয়ে হাজির নন্দন আচার্যের বাড়ীতে।

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তেজদীপ্ত মধুর মুখমণ্ডল। মাথায় নীলবস্ত্রের পাগড়ী। পরিধানে ও নীলাম্বর। সদাহাস্য মুখমণ্ডল নিমাইকে দেখেই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল ওর মুখমণ্ডলের দিকে।

'রসনায় লেহে যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায়ে ঘ্রাণ॥
এইমত নিত্যানন্দ হইল স্তম্ভিত।
না বোলে না করে কিছু সভেই বিস্মিত॥'

চোখে চোখে কি যেন কথা হলো দু'জনের। তারপর মেতে উঠল কীর্তনানন্দে। অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীনিবাস মুরারি, মুকুন্দ—দলে জুটেছে অনেকেই। এখন নবদ্বীপ মেতে উঠেছে কীর্তনানন্দে। দুটিতেই সমান। কৃষ্ণের নাম শুনলেই হয়। এই ত সেদিন, নিমাই বললে শ্রীবাসকে— 'পড়ো ত ভাগবতের একটি শ্লোক।'

শ্রীবাস আরম্ভ করলে—

'বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কার্ণিকারং।
বিভ্রদবাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।
রন্ধ্রান বেণোরধর সুধয়া পুরয়ন্ গোপবৃন্দৈ।
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্‌গীত কীর্তিঃ।'

'বৃন্দাবনে প্রবেশ করছে নটবর শ্রীকৃষ্ণ। মাথায় তার শিখি পুচ্ছ, দুটি কর্ণে কর্ণিকার ফুল, পরিহিত পীত নীল বস্ত্র, আর গলায় দুলছে বৈজয়ন্তী মালা। বেণুর ছিদ্রগুলো অধর সুধায় দিচ্ছে ভরে ভরে। যেখানেই রাখছে পদযুগল, অঙ্কিত পদচিহ্নে জেগে উঠছে রতি, প্রীতি, আনন্দ।'

শ্লোক শুনেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল নিতাই। জ্ঞান ফিরতেই কাঁদতে লাগল

বালকের মত। গড়াগড়ি খেতে লাগল ধূলিতে। আবার ক্ষণপরেই লাফিয়ে উঠল কৃষ্ণানন্দে। নাচতে লাগল দু'বাহু তুলে। কেউ কি ধরে রাখতে পারে। শেষে নিমাই গিয়ে স্পর্শ করল নিতাইকে।

ওতেই কাজ হলো। নিস্পন্দ হয়ে গেল নিতাই। আর সেই মুহূর্তে কোলে টেনে তুলে নিল নিমাই। কাঁদতে লাগল অবিশ্রান্ত ধারায়।

'ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যে হেন রামকোলে॥'

অশ্রু বিহ্বল নিতাই শান্ত হল কতক্ষণ পরে। নিমাই বললে—'সার্থক আজ আমার জীবন। স্বচক্ষে দেখলাম ভক্তি কাকে বলে। এই স্বেদ, কম্প আর অশ্রু, এই গর্জন আর হুঙ্কার, এত ঈশ্বরের শক্তি ছাড়া হতে পারে না। তুমি কৃষ্ণপ্রেমের মূর্তিমন্ত বিগ্রহ। তোমাকে ভজনা করলেই জীবের স্ফূরণ হবে কৃষ্ণভক্তি। তোমাকে যখন পেয়েছি, আমার আর ভাবনা কি। তুমিই হরণ করবে ভূ-ভার।'

বড় লজ্জা পেল নিতাই নিমাইয়ের কথায়। বললে—'এ কেমন কথা বলছ ভাই। সারা দেশটায় ত ঘুরলাম। গেলাম কত কত কৃষ্ণ স্থানে। খুঁজে বেড়ালাম পাতি পাতি করে। কিন্তু না, সব স্থানেরই সিংহাসন শূন্য। কৃষ্ণ কোথাও নেই। ভাবি কোথায় পালালো। শেষে ঈশ্বর পুরীই ত হদিস দিলে। ছুটে এলাম নবদ্বীপে। দেখি কৃষ্ণ আমার ধারণ করেছে গৌর বরণ। নিজেকে লুকিয়েছে ছদ্মবেশে। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দেবে কেমন করে। আমি ঠিক চিনে ফেলেছি।'

বলে কোলে করে চুমু খেলে নিমাইয়ের। সকলে তাকিয়ে রইল ওদের দু'জনের দিকে। কেউ বললে—শঙ্কর মাধব। আবার কেউ কেউ বললে—'নানা তা কেন হবে। ওরা কৃষ্ণ-বলরাম। ওরা ত দু'জন, দুজনকেই চেনে। অনেক দিনের পরিচয় ওদের। দেখছ না ঠারে ঠোরে কথা বলছে। কেউ বুঝতে পারছে না বিন্দু-বিসর্গ'।

কথা হচ্ছিল দু'জনে নিভৃতে। শচীদেবীই বলছিলেন নিমাইকে।

'বুঝলি নিমাই, আজ শেষ রাতে ভারী একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। তুই আর নিতাই হয়ে গিয়েছিস্ পাঁচ বছরের খোকা।'

'বল কি? তারপর কি হলো?' মজা করে জিগ্যেস করলে নিমাই।

'তোরা দু'জনে ভীষণ দুষ্টুমি করছিস্। দৌড়াদৌড়ি আর মারামারি।

শেষে আবম্ভ করলি ঠেলাঠেলি। তাবপর দেখি, ঢুকে পড়েছিস ঠাকুর ঘরে ওমা, অমনি ঠাকুব ঘব থেকে দেখি, বেবিয়ে আসছে দ্'টো নতুন ছেলে। ঠিক তোদেবই বয়েসী। তাবা কে জানিস ?

'তাবা কে গো মা ?' শিশুব মত কৌতুহল নিয়ে প্রশ্ন কবলে নিমাই।

'তাবা কৃষ্ণ আব বলবাম।'

'বাঃ ভাবী মজা ত। তাবপব তাবা কি কবলো ?' ভীষণ আগ্রহ ভবে প্রশ্ন কবে মাকে নিমাই। হাসতে হাসতে শচীদেবী বললেন—

'তাবা না, তোদেব দ্'ভাইয়েব সঙ্গে মাবামাবি শুব্ব কবে দিলে। তাবপব বললে এই, তোবা কে ? এখানে এসেছিস কেন ? এ বাড়িতে যত দ্ধ দই আছে, সব আমাদেব।

তাতে তোদেব ভাগ নাই। ভাগো।'

'তখন আমবা কি বললাম'।

'তুই আব কি বলবি। বললে নিতাই। হ্যা, হ্যা, এখন আব সে কাল নেই। তখন ছিল গোয়ালাব যুগ। দুধ-ঘি-ননী-সব যত পাব খেয়েছ লুটেপুটে। এখন আব সেটি হচ্ছে না। বুঝলে, এখন বামুনেব যুগ। এখন খাব আমবা। ভাল চাও ত কেটে পড বেলাবেলি। বাড়াবাড়ি কবলে মাব খাবে বাড়িব।'

'নিতাইয়েব অমন কথা শুনে কৃষ্ণ-বলবাম কিছু বললে না ?' মাকে আবাব প্রশ্ন কবে নিমাই।

'তা না বলে কি আব অমনি অমনি পালিয়ে গেল ভেবেছিস। কৃষ্ণেব চেয়ে বলবামেব ত বেশী বাগ। সে গেল নিতাইযেব দিকে তেড়ে। ভয দেখায নিতাইকে। শাসায। বলে, তোব ত ভাবী জোব দেখছি। জানিস আমাব পাশে কে বয়েছে ? বুঝলি কৃষ্ণ আছে আমাব দিকে।'

অমনি নিতাই উঠলে ক্ষেপে। বললে—'ভাবী ত তোব কৃষ্ণ, জানিস আমাব পাশে কে আছে গৌবচন্দ্র বিশ্ব ভব—স্বয়ং ঈশ্বব।'

'বাঃ বাঃ, ভাবী মজাব স্বপ্ন ত। দু'দিকে দু'ঈশ্বব, তাই না মা ? বলো, বলো, তাবপব কি হলো ?'

'কি আব হবে, ঝগড়া কবতে কবতে চাব জনে কাড়াকাড়ি আবম্ভ কবলে। যা ছিল চাব জনেই ফেললে খেয়ে। এমন সময় স্পষ্ট শুনতে পেলাম ডাকছে নিত্যানন্দ। ঘুম আমাব ভেঙ্গে গেল। বুঝলি নিমাই, এই অদ্ভুত স্বপ্নেব অর্থ কি বল দেখি। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।' কেমন যেন বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন শচীদেবী।

নিমাই বললে—'এত খুব ভাল স্বপ্ন। এর আবার কি ব্যাখ্যা করব বলো। তবে এ কথা তুমি কাউকে বলো না।'

'জানো মা, তোমার ঘরের ঠাকুর না, খুব জাগ্রত। ভোগ দেখাতে গিয়ে আমি প্রায়ই দেখি, নৈবেদ্যের আধাআধি নেই। আমার ভারী সন্দেহ হয়। কিন্তু লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারি না।'

'নৈবেদ্য থাকে না, এসব তুই কি বলছিস নিমু?'

'হ্যাঁ গো মা, সত্য কথাই বলছি।' তারপর হাসতে হাসতে বললে—আমার কি মনে হতো জানো, তোমার ঐ লোভী বৌমাই বুঝি দিত সাপটে। এখন মনে হচ্ছে সন্দেহটা আমার সত্যি নয়।'

গৃহের অন্তরাল থেকে শুনছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। মাতা-পুত্রের কথা। স্বামীর কৌতুক পরিহাস শুনে হাসল মনে মনে। বিশেষ তাকে প্রভু 'লোভী' বলে পরিহাস করছেন। গয়া থেকে ফেরার পর প্রভুকে এমন করে কথা বলতে কখনো দেখেনি প্রিয়া।

'তোর কথাই যদি সত্যি হয়, তাহলে আমার স্বপ্নটা ত নিছক স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে না। তুই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দে আমায়।' শচীদেবী যেন অনেকটা কাতর হয়ে বললেন নিমাইকে।

'ওর আর ব্যাখ্যা কি করব বলো। তুমি একদিন নিত্যানন্দকে ডেকে খাইয়ে দাও।'

'তবে তাই যা।' আজই ডেকে নিয়ে আয় নিতাইকে।' চটপট্ বললেন শচীদেবী।

মায়ের কথা শুনেই নিমাই চললে শ্রীবাসের বাড়ী। ওখানেই থাকে নিতাই। 'চলো আমাদের বাড়ী। মা আমাদের বাড়ীতে আজ তোমার ভিক্ষের বন্দোবস্ত করছেন। কিন্তু দেখো, সেখানে গিয়ে যেন কোন চঞ্চলতা প্রকাশ করো না।'

'নিতাই যেন কথাটা কানেও নিল না। আপন মনে শুধু হাসল একটু।'

নিমাই নিতাই দুটি ভাই। বসেছে পাশাপাশি। পরিবেশন করছেন শচীদেবী নিজেই। খাওয়াচ্ছেন বসে বসে। কিন্তু একি, কি দেখছেন তিনি। এয়ে রাম-লক্ষ্মণ।

'আবরাব আসি আই দুইজন দেখে।
বৎসর পাঁচের শিশু যেন পরতেকে॥
কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুই জনে চতুর্ভুজ—দুই দিগম্বর॥

শঙ্খ চক্র গদা-পদ্ম শ্রীহল মুষল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখে মকরকুণ্ডল॥'

কাঁদতে কাঁদতে ভাবাবেশে কেমন যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন শচীদেবী। দু'ভাই আস্তে ব্যস্তে খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাকে সুস্থ করতে।

নিমাই শুধু বললে—'চঞ্চলতা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলাম না।'

বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে বসে বসে একে একে সব শুনেছে। কীর্তনের বান ডেকেছে নদীয়াতে। এই ক'মাসের মধ্যে সারা নবদ্বীপ যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে। নিত্য শ্রীবাসের বাড়ীতে বসছে কীর্তনের আসর। দীর্ঘ রাত পর্যন্ত চলে কীর্তন। তখন কারো কোন হুঁস থাকে না। কোন কোন দিন প্রভু বাড়ীই ফিরেন না। কাটিয়ে দেন শ্রীবাসের বাড়ীতে।

শান্তিপুর থেকে এসেছেন অদ্বৈতাচার্য। তিনি ত প্রভুকে স্বয়ং ভগবান বলে প্রচারও করছেন। প্রভু তাঁকে 'নাড়া' বলে ডাকেন। অভিষেকও হয়েছে প্রভুর। হৈ-হৈ, রৈ-রৈ পড়ে গেছে চতুর্দিকে।

রামাইকে দিয়ে প্রভু ডেকে এনেছিলেন অদ্বৈতাচার্যকে। নাকি বলে পাঠিয়েছিলেন তুমি যার জন্য কেঁদেছিলে, ছাড়তে হুঙ্কার, তুলসী গঙ্গাজলে আহ্বান করতে, কঠোর উপবাসে দিনের পর দিন শুষ্ক হয়েছ, বলো তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি এসেছেন নদীয়াতে।

'যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ॥'

এই কথা শুনে আচার্যদেব নাকি উঠেছিলেন নৃত্য করে। এসেছিলেন সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর প্রভুর পায়ের কাছে এসে বসলেন দু'জনে। পূজো করলেন প্রভুর শ্রীচরণ স্বামী-স্ত্রী দু'জন মিলেই। পূজার শেষে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। প্রভু পূর্ণ করলেন ওদের মনোবাঞ্ছা। কি করলেন? না—

'সর্বভূত অন্তরাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
চরণ তুলিয়া দিল অদ্বৈত মাথায়॥'

তারপর সে কি কাণ্ড। কত বয়স আচার্যদেবের। তিনি নৃত্য করতে

লাগলেন। যোগ দিলেন কীর্তনে। ভেবে থৈ পায় না বিষ্ণুপ্রিয়া। সে ত ওসব কৃষ্ণ ভগবান কিছুই বোঝে না। সে জানে তার নিমাইকে, জানে তার প্রাণ গৌরাঙ্গকে।

সেদিন কথাটা শুনে বিষ্ণুপ্রিয়া চমকে উঠল। নিমাই নাকি শ্রীবাসের বাড়ীতে ধরেছে সাত-প্রহরিয়া ভাব। প্রথমে বুঝতে পারে না কথাটা। কৃষ্ণপ্রেম যখন উথলে উঠে প্রভুর হৃদয়ে, বাহ্য জ্ঞান থাকে না দেহে। এমন ভাবে কাটে পুরো এক প্রহর। এর বেশী কখনো স্থায়ী হয় না। কিন্তু যা শুনছে, আজকে প্রভু নাকি বিষ্ণুখট্টায় বসেছেন সজ্ঞানে। বলছেন—'আমাকে অভিষেক কর।'

ছুটেছে ভক্তরা গঙ্গাজল আনতে গঙ্গায়। একশ আট ঘট ভরেছে গঙ্গাজলে। বসিয়েছে প্রভুকে বাইরের আঙিনায় পিঁড়ির উপরে। ঢালছে সেই একশ আট ঘড়া জল প্রভুর মাথায়। মনে মনে চিন্তা করে শিউরে উঠলে বিষ্ণুপ্রিয়া। যদি প্রভুর কিছু হয়। অত জল সহ্য হবে কি প্রভুর শরীরে। যদি ঠাণ্ডা লাগে।

শ্রীবাসের দাসী। নাম তার দুঃখী। সেও নাকি বইছে ঘড়া ঘড়া জল। প্রভু তার নামটাই দিয়েছেন পাল্টে। 'আজ থেকে তোর নাম 'সুখী' হয়ে গেল বুঝলি ?'

তাই না শুনে দুঃখীর নাকি কি আনন্দ। সে নাচছে ধেই ধেই করে।

যবন হরিদাসকেও কৃপা করেছেন প্রভু। কথাটা শুনে বড় দুঃখ হলো প্রিয়ার। সকলকেই বর দিচ্ছেন প্রভু কল্পতরু হয়ে। শুধু কি বিষ্ণুপ্রিয়াই থাকবে উপেক্ষিতা। অবহেলা অনাদরে কেঁদে কেঁদে কাটবে তার সারা জীবন। প্রিয়ার বুকটা ব্যথায় কেমন যেন টনটন্ করে উঠে।

হরিদাস বলেছিল—'তুমি যদি এই অকিঞ্চনকে কৃপা করো, তবে আমাকে এই বর দাও, আমাকে আরো দীন করো। যেন অভিমান আমাকে স্পর্শ না করে। যারা তোমার ভক্ত, আমি যেন তাদের উচ্ছিষ্ট পেয়ে ধন্য হই।'

'তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
তোমার স্মরণহীন পাপ জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর॥
শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে॥'

কথা শুনে হরিদাসকে প্রভু বলেছেন, 'আর্তি বিনা মেলেনা পেমধন। হরিদাস, তোমার এই আর্তি, তোমার এই দীনতার জন্যই তুমি লাভ করেছ

প্রেমধন। আর তোমার মত ভক্তকে নিয়েই আমার ঠাকুরালি। তুমি জেন, তোমার দেহেই আমার বাস। যে তোমাকে শ্রদ্ধা করবে, যে তোমাকে ভালবাসবে, জানবে সে যথার্থ আমারই প্রতি ভক্তিমান।

গঙ্গার ঘাটে স্নানে গিয়েই কথাটা শুনলো বিষ্ণুপ্রিয়া। নিমাই নাকি বলেছে ভিক্ষে করতে নবদ্বীপে। তাই নিয়ে কত জনেই কত কথা বলছে। সংসাব চলে না শচীদেবীর। তা চলবে কেমন করে। নিমাই ত অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে উন্মাদ। তা খাবে কি শুনি। বড়লোকের মেয়েকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বিয়ে করে এনেছে। এখন পারছে না খাওয়াতে। আর নিজেও পারছে না ভিক্ষে করতে। তাই বলেছে নিতাই আর হরিদাসকে, তোরাই যা নগরে ভিক্ষে করতে। কথাটা শুনে লজ্জায় হেঁট হয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়াব মাথা।

'হ্যাঁ, সতিই ত, নিমাই বলেছে ভিক্ষে করতে। নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে ভিক্ষে চায় নিমাই। নিতাই আর হরিদাস সম্মত নিমাইয়ের কথায়।

'হ্যাঁ, তাই ভিক্ষে করব।'

কি ভিক্ষা?

না, নাম ভিক্ষা।

> 'শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
> সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
> প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
> কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বোল কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
> ইহা বই আর না বলিবা বোলাই বা।
> দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥
> তোমরা করিলে ভিক্ষা যেই না বলিব।
> তবে আমি চক্র হস্তে সভারে কাটিব॥'

প্রভুর আদেশ। অতএব বেরিয়ে পড়ল ওরা দু'জনে। দু'জনেরই সন্ন্যাসী বেশ। দ্বারে গিয়ে দাঁড়ালেই গৃহস্থ আনে বেকার ভবে চাল, ডাল, ফল-মূল। ওরা বলে—'বলো, তোমরা কৃষ্ণ বোল। ও সব ভিক্ষে আমরা চাই না। চাইছি নাম ভিক্ষে।'

কথা শুনে পিছিয়ে যায় গৃহস্থ। বুঝতে পারে না ওদের কথা। নানা জনে নানা কথা বলে। 'তোমরা পাগল হয়েছ, ঐ নাম মুখে বলব। শেষে নিমাইয়ের মত পাগল হব নাকি। যাও, যাও, ওসব ভিক্ষেটিক্ষে হবে না। যে পথে এসেছ, কেটে পড় সেই পথেই।

কেউ বা তেড়ে আসে চোর বলে। আবার কেউ বা ভয় দেখাতেও ছাড়ে না। বলে কাজীর কাছে গিয়ে দেব ধরিয়ে। দেবে ফাটকে পুরে। নবদ্বীপে এ আবার কি উপদ্রব হাজির হলো। আরে, শত্রুর চরটর নয় ত। এমনি নানা জনের নানান্ মন্তব্য।

নিতাই, হরিদাস কিন্তু নির্ভীক। তাদের এত ভয়টা কিসের শুনি। তারা ত প্রভুর আদেশ পালন করছে। বলার কিছু থাকে, বলুক গিয়ে প্রভুর কাছে।

নিমাইকে এসে জানালে সব বৃত্তান্ত। শুনে নিমাই হাসলে। বললে—'নিতাই, হরিদাস, তোমরা এক কাজ করো, নামের পসরা কেউ যদি না নেয়, কি আর করবে দোকানদারের কাছে গিয়ে, বস্তাবন্দী করে, রেখে দাও গোলাজাত করে। ও বীজ ত আর নষ্ট হওয়ার নয়। জল, আলো, বাতাস পেলে আপনাতেই আপনি অঙ্কুরিত হবে। বুঝলে?' মৃদু মৃদু হাসতে লাগল নিমাই কথাটা বলেই।

নিতাই, হরিদাস কেমন যেন তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল্ করে। কি বলছে প্রভু। 'দোকানদারের কাছে। বা, ভারী সুন্দর বলেছেন ত। দো-কান-দ্বারের কাছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দু'কান দ্বারের কাছে। বিলাও, বিলাও। নিতাই, হরিদাস, নাম বিলাও।

'দোকানদারে দু'কান দ্বারে, দ্বারে দ্বারে।
নেচে নেচে বাহু তুলে, বিলাও তোমা যারে তারে॥
দু'কান দ্বারে।'

মেতে উঠল ওরা। বাহু তুলে নাচতে নাচতে চললো ফিরে করে, জীবের দুয়ারে দুয়ারে। মেতে উঠল নামগানে।

কি যেন ভাবছিলেন শচীদেবী। হয়ত নিমাইয়ের কথাই। নিমাই যে আর ঘরেই আসে না। থাকে শ্রীনিবাসের গৃহে। কপাট বন্ধ করে সারারাত কৃষ্ণ নাম করে। ঘরে নবোদ্ভিন্না যুবতী বৌমা। বিনিদ্র রজনী জেগে জেগেই কাটায়। এ জ্বালা যে বড় দুঃসহ। তিনি বুঝতে পারেন প্রিয়ার বেদনা দীর্ণ মনের কথা। বুক ফেটে যায় বৌমার কথা ভেবে। তিনিও নারী। কেন বুঝতে পারবেন না নারীর অন্তর বেদনা।

সহসা ত্রস্ত পদে বিষ্ণুপ্রিয়া এসে বললে—'ও মা, এ কি শুনছি!'

'কেন কি হয়েছে?' শংকিত দৃষ্টি মেলে তাকান প্রিয়ার দিকে।

'বট ঠাকুরকে নাকি মাধাই মেরেছে কলসীর কানা দিয়ে। মাথা ফেটে গেছে তাঁর। দরদর ধারে পড়ছে রক্ত। ওরা যে, হেন দুষ্কর্ম নেই, যা পারে না করতে। মা, এখন কি হবে?'

'কেন, কি করেছিল নিতাই?' আতঙ্কিত কণ্ঠে ব্যাকুল হয়ে জিগ্যেস করেন শচীদেবী।

'যা শুনেছি, রাতে নগর ভ্রমণ করে ফিরছিলেন উনি আর ঠাকুর হরিদাস মদে মত্ত দু'ভাই। জিগ্যেস করলে—'কে যায়?'

'আমি অবধূত।'

নাম শুনেই ক্ষেপে উঠল মাধাই সামনে পড়েছিল শূন্য মদের কলসী তাই দিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মেরেছে মাধাই। বট ঠাকুরের মাথা ফেটে বইছে রক্তের বন্যা। তবু ক্ষান্ত হয়নি মাধাই আবার মারবে বলে তুলেছিল ভাঙা কলসী খণ্ড। জগাই হাতে ধরে থামিয়ে দিয়েছে তাতেই ত রক্ষে নইলে বট ঠাকুর একেবারে যেতেন জখম হয়ে'

'নিতাই কিছু বলেনি?'

মাথা নেড়ে বললে প্রিয়া 'উনি ত এখন দয়ার অবতার। রাগ-গোসা একটুও নাই শরীরে বলছেন—'মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দেব না?'। 'শুনেছ কথা?'

'নিমাই কোথায়? সে শোনেনি এসব ঘটনা?' সাগ্রহে জিগ্যেস করলেন শচীদেবী।

শুনেই ত তোমার ছেলে দলবল নিয়ে ছুটে গেছে। এখন আমার বড্ড ভয় করছে যে মা। ওরা যে নগরের কোটাল। সব কিছুই করতে পারে। ও মা, কি হবে বলো না?'

বৌমাকে সান্ত্বনা দিবেন কি শচীদেবী নিজেই তিনি আকুল হয়ে উঠলেন। শুকিয়ে গেল মুখ। ভয়ে যেন বন্ধ হয়ে আসছে হৃদস্পন্দন তাঁর। শাশুড়ীর অবস্থা দেখে কি করবে বিষ্ণুপ্রিয়া। তাড়াতাড়ি খুঁজতে গেল ঈশানকে। দেখলে সেও ঘরে নেই। ঘরে বাইরে চতুর্দিকে বিপদ। প্রিয়ার চিত্ত হয়ে উঠে অস্থির। উদ্ভ্রান্তের মত ঘরবার হতে লাগল বিষ্ণুপ্রিয়া।

খানিক পরে দেখলে ঈশান আসছে আপন মনে হাসতে হাসতেই আসছে। আর বলছে—'হতেই হবে। হতেই হবে। দাদাবাবু যে আমার স্বয়ং ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ।'

'ঈশান দা, কি হয়েছে? তুমি এত হাসছ কেন?' ব্যগ্রকণ্ঠে জিগ্যেস করলে বিষ্ণুপ্রিয়া।

'কি আর হবে। বুঝলে বৌঠান, জগাই মাধাই উদ্ধার হয়ে গেল। শুধু নামের গুণে। এখন দু'ভাই দাদাঠাকুরের পায়ে ধরে কাঁদছে। আর বলছে, পাপীকে উদ্ধার কর প্রভু। বুঝলে বৌঠান, দাদাঠাকুর আমার দু'জনকেই উদ্ধার করেছেন।'

বিষ্ণুপ্রিয়া দেখলে ঈশানও ভাবে গদগদ। সেও যেন রাতারাতি কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে উঠেছে। আপন মনে বলছে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।

'ঈশান দা, এখন ওঁরা কোথায়? খুলে বলো না, পুরো ব্যাপারটা কি?'

'বুঝলে বৌঠান, ব্যাপার আর শুনে কাজ নাই। ওই তেনারা আসছেন। এলিই দেখি সার্থক করবেন নয়ন যুগল।'

বৈষ্ণবরা ধরাধরি করে জগাই মাধাইকে নিয়ে এল প্রভুর বাড়ি।

লোকে লোকারণ্য। সারা নবদ্বীপ যেন ভেঙ্গে পড়েছে নিমাইয়ের বাড়ীতে। লোক সংঘট্ট ঠেকাতে কপাট পড়ল সদরে। ভিতরের আঙিনায় বসল বৈষ্ণব সমাজ। নিমাইয়ের পাশে নিত্যানন্দ আর গদাধর। চারপাশে পুণ্ডরীক, হরিদাস, গরুড় পণ্ডিত, রামাই, শ্রীবাস আর গঙ্গাদাস। বক্রেশ্বর পণ্ডিত আর চন্দ্রশেখর আচার্য। আর সকলের সামনে ভূমিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে জগাই মাধাই। সর্ব অঙ্গে কম্প আর রোমাবলি প্রকাশ করছে হর্ষোৎফুল্লতা। কাঁদছে, অঝোরে কাঁদছে দু'জনে। মাধব আর জগন্নাথ।

যারা চুরি ডাকাতি করত, জ্বালিয়ে দিত লোকের ঘরবাড়ী করত নরহত্যা, মদ্য মাংস খেত নির্বিচারে, সেই দুর্ধর্ষ পাষণ্ড আজ কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত বিনীত।

কীর্তি রাখল নিমাই। দুর্জনেরা, যারা নিন্দা করে, সেইসব পাষণ্ডের দল বলাবলি করতে লাগলা নিমাই সামান্য মানুষ হলে জগাই মাধাইয়ের মত দুর্জন কি সন্ন্যাস হয়? আর পণ্ডিতেরা—এ জয়, কেশব কাশ্মীরীর পরাজয়কেও ম্লান করল।

গঙ্গার ঘাট মার্জনা করে পাপ ক্ষালন করে দুভাই। স্থির হয়ে জপ করে জগাই। মাধাই কোদাল দিয়ে তৈরি করে ঘাট আর গান করে প্রেমানন্দে—

তোমরা দু'ভাই গৌর নিতাই,
আর, আমরা দু'ভাই জগাই মাধাই॥'

নগর ভ্রমণে বেরিয়েছে চাঁদ কাজী। নবদ্বীপের শাসনকর্তা সে প্রবল প্রতাপ

তার। শুনতে পেল হরিনামের কোলাহল। নগরিয়া'রা বাজাচ্ছে মৃদঙ্গ মন্দিরা। মনে পড়ল, তাহলে এদের বিরুদ্ধেই নালিশ করেছিল নদীয়ার নাগরিকরা। এদেরই উচ্চন্ড কোলাহলে বিঘ্নিত হচ্ছে নগরের শান্তি। রাতেও কাউকে দেয়না ঘুমাতে পথে পথে শৃগাল কুকুরের মত বেড়ায় উচ্চ চীৎকার করে। যতসব অনাচারীর দল। সরোষে হুকুম দিলে কাজী। ধরো, ধরো অনাচারীদের। দেখাচ্ছি ওদের হিন্দুয়ানি।'

ভয়ে পালাতে লাগল নগরিয়ারা। যে যে দিকে পারল দিল চোঁচা দৌড়। আর যাদের ধরতে পারল কাজীর লোক, প্রহারে প্রহারে করে তুললো জর্জরিত। ভাংগল মৃদঙ্গ-মন্দিরা। দ্বারে দ্বারে করল নানা অত্যাচার। আবার যাওয়ার সময় শাসিয়ে গেল—'বলে যাচ্ছি, মনে থাকে যেন, আর যদি কেউ নগরে প্রকাশ্যে উচ্চ কণ্ঠে হরিনাম করে, জাত মারব তার। তখন বুঝবে নামের ঠেলা।

যেন বজ্রপাত হল সকলের মাথায়। 'এখন উপায়!'

এদিকে বৈষ্ণব বিদ্বেষীদের, আনন্দ দেখে কে। শাক্তরা কথাটা শুনে ভাবল —'এবার নির্জনে তন্ত্র সাধনা জমবে ভাল। শালাদের জ্বালায় চক্রে আরোহণ একেবারে বন্ধই করতে হয়েছিল। মদ মৈথুন না হলে সাধনা করে শালারা আনন্দ পাবি কোথায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে গলা ফাটিয়ে কি সুখ পাস রে শালারা। বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। এবার বোঝা যাবে, তোর নিমাই পণ্ডিতের বিদ্যের দৌড় কতখানি। এবার বেরোবে জগাই মাধাই উদ্ধারের স্ফূর্তি।

এবার কিন্তু কথাটা দুজনেই শুনে ফেললো। বিষ্ণুপ্রিয়া আর শচীদেবী, কারো অগোচর রইল না। শুধু কাজীর হুকুম নয়, তার প্রতিক্রিয়াও শুনেছে দুজনে। নিমাইয়ের বিরুদ্ধে যারা—তারা পথে বলাবলি করে যাচ্ছিল—। এবার চূর্ণ হবে নিমাই পণ্ডিতের অহংকার।

'শুধু কি তাই, নিত্যানন্দের বঙ্গও বেরুবে।' অন্যজন ফোড়ন দিলে।

নাগরিয়ারাও এসেছিল নিমাইয়ের কাছে, 'কাজীর হুকুমে নগরকীর্ত্তন ত বন্ধ হয়ে গেল। এখন আমাদের অনুমতি করুন, নবদ্বীপ ছেড়ে আমরা অন্যত্র চলে যাই। কীর্তন না করতে পেলে বেঁচে থেকে সুখ কোথায়।'

কথাটা শুনেই রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছে নিমাই। হুংকার ছেড়ে বলেছে —. কাজী বেটা কীর্তন বন্ধ করবে, দেখা যাবে কতবড় শক্তি তার। আমি নিজেই বেরব কীর্তনের দল নিয়ে নগরে। ভাই নিতাই, তুমি যাও, এখুনি নগরে ঘোষণা করে এস, আজ সন্ধ্যায় আমি নগরের পথে পথে কীর্তন করব। সকলে যেন খেয়েদেয়ে বিকেলে পৌঁছে আমার বাড়ীতে। হাতে আনবে একটি

করে প্রদীপ। সবাই এস, তিলার্ধেক ভয় করো না কেউ। কৃষ্ণ নামের ?
কত শক্তি বুঝতে পারবে আজকেই।

'কীর্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্রমূর্তিধর॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন॥
দেখ আজি কাজির পোড়াও ঘর-দ্বার।
কোন কর্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার॥
প্রেমভক্তি বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডীগণের আজি হৈব আমি কাল॥
ভাঙ্গিয়া কাজির ঘর কাজির দুয়ারে।
কীর্তন করিমু দেখোঁ কোন কর্ম করে॥'

ভয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া আর শচীদেবীর বুক কেঁপে উঠল দুরু দুরু করে। এযে কাজির বিরুদ্ধে অভিযান। না জানি কি হয়। দুজনে বলাবলি করে, আচ্ছা মা, শ্রীবাসের বাড়ীতেও ওঁরা সকলে মিলে কীর্তন করতেন, সেই ত ভাল ছিল মা ?' আমিও ত তাই বলি, কীর্তন করে তোরা আনন্দ পাস, তা শ্রীবাসের আঙিনায় করতে আপত্তি কোথায়।' পরক্ষণে কতকটা যেন অভিযোগ করে বললেন শচীদেবী—'আচ্ছা বৌমা, তুমি ত আর ছোটটি নও, তুমিও ত বলে কয়ে নিমাইকে ঘরে রাখতে পার।'

বিষ্ণুপ্রিয়া যেন কতকটা অভিমান ভরা কণ্ঠে বললে—'সে ভাগ্য আমার কোথায় মা, আমি ত আমার সব সমর্পণ করে দিয়েছি তোমার ছেলের পায়। যেখানে তোমার কথা উনি শুনেন না, সেখানে আমার কথার আর কতটুকু দাম বলো।'

কোন উত্তর দেন না শচীদেবী। তাঁর বুকের পাঁজর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল শুধু হাহাকার ভরা একটা দীর্ঘশ্বাস। কাকে কি বলবেন তিনি, অমন সোনার প্রতিমাকে তিনি নিজেই কালি করছেন।

ঘরে ঘরে প্রজ্বলিত হলো প্রদীপ। কোন পথ দিয়ে যাবে কীর্তনের দল, কেউ ত তা জানে না। তাই সব পথই হলো আলোকিত। সজ্জিত হলো দ্বারে দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ। পথের বাঁকে বাঁকে রচিত হল দলি-তোরণ। বেশ-ভূষায় মন দিল স্ত্রীলোকেরা। ভিড় করল বাতায়নে। শিশুরা মেতে উঠল যেন এক অপার্থিব আনন্দে।

যারা বেরুবে কীর্তনের দলে হাতে নিল তারা জ্বলন্ত মশাল। কটিতে

বাঁধল তেলের কুপি, গলায় পরল ফুলের মালা, অঙ্গে নিল চন্দনের প্রলেপ। নিমাইকে সাজাল গদাধর। অলকা তিলকা বদনে, ললাটে দিল ফাগ্ন বিন্দ্ন, কাজলের রেখা টেনে দিল নয়ন য্নগলে। চুড়ো বাঁধল মাথায়, মালতীর মালা দিল বেষ্টন করে তাতে, সর্বাঙ্গ শোভিত হল স্নচন্দনে, কাঁধ থেকে ব্নক বেয়ে প্রলম্বিত হল যজ্ঞস্নত্র। গলায় চাদর, পরিধানে পট্টবস্ত্র। দাঁড়ালেন যেন জ্যোতির্ময় স্নদীর্ঘ এক কনক বিগ্রহ। আহা, কি মধ্নর ম্নরতি।

'মধ্নরং মধ্নরং বপ্নরস্য বিভোঃ মধ্নরং মধ্নরং বদনং মধ্নরং।

মধ্নগন্ধি মধ্নস্মিত মেতদহো মধ্নরং মধ্নরং মধ্নরং মধ্নরং॥'

বেশ কয়েক দলে ভাগ হল কীর্তনের দল। বর্ষীয়াণ অদ্বৈতাচার্যই হলেন প্রথম দলের কর্তা। হরিদাস রইলেন মাঝের দলে। তৃতীয় দলের অধিকারী হলেন শ্রীবাস। আর সর্বশেষ চতুর্থ দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলো স্বয়ং নিমাই।

কি বিরাট বিশাল যে কীর্তনের দল। এ যেন কেউ ভাবতে পারে নি। নদীয়ার ঘরে ঘরে প্নর্নষ ব্নঝি কেউ রইল না। বেরিয়ে এল সকলেই। বিভিন্ন দলের মধ্যে চলেছেন ম্নকুন্দ, শ্রীবাস, গঙ্গাদাস, চন্দ্রশেখর, বাস্নদেব। চলেছেন রামাই চক্রেশ্বর, জগদীশ, জগদানন্দ। চলেছেন শ্রীধর, নন্দন আচার্য, শ্নক্লাম্বর গোপীনাথ, আরো কত শত কে বা চিনে রেখেছে তাদের। হাজারে হাজারে।

চলছে নাচতে নাচতে গৌরহরি। গাইছে, প্রাণভরে গগন বিদীর্ণ করে—

'হরি হরয়ে নমঃ ক্নষ্ণ যাদবায় নমঃ।

গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধ্নস্নদন॥'

দেখতে দেখতে কত ছোট ছোট দল এসে মিশে গেল ম্নল দলের সঙ্গে। তার কি ঠিক ঠিকানা আছে, না, গোনা-গ্ননতি আছে। নবদ্বীপ যেন কীর্তন তরঙ্গে হয়ে উঠছে উত্তাল। জগাই-মাধাই উদ্ধারের দিন কটা লোকই বা এসেছিল। আজ নবদ্বীপ হয়ে উঠেছে হরি নামে উন্মাদ। সকলের ম্নখেই হরিধ্বনি। সকলেই ন্নত্য করছে 'হরি, হরি' বলে।

নিমাইয়ের সে কি অপ্নর্ব ন্নত্য—দেহে সে এক অপ্নর্ব বিকার। সে কম্প, সে ঘর্ম, সে প্নলক বর্ণনাতীত। নেয়ে গেছে সর্বাঙ্গ নয়নের জলে।

'ক্ষণে হয় প্রভু অঙ্গ সব ধ্নলাময়।

নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়॥'

চলেছে কীর্তনের দল গঙ্গার তীর ধরে। তারপর এল নিমাইয়ের নিজের ঘাটে। এখানে বেশ কিছ্নক্ষণ ন্নত্য করল নিমাই। নাচতে নাচতে মাধাইয়ের

ঘাট। এঘাট পেরিয়ে বারকোনা ঘাট। তারপর একেবারে নবদ্বীপের শেষ প্রান্তে সিমুলিয়া পল্লী। এখানেই কাজীর বাড়ি। অন্তঃপুর থেকে চমকে উঠল কাজী। কিসের এত বাদ্য কোলাহল। এত আলোই বা কিসের। এ কি শোভাযাত্রা, না কারো বিয়ে। সহসা কানে এল—কাজী গেল কোথা? বেরিয়ে আসুক, মাথা দেব গুঁড়ো করে।'

কাণ্ডকারখানা দেখে কাজী ঝটপট লুকিয়ে পড়ল অন্তঃপুরে। এত বিরাট কাণ্ড, মালুমই করতে পারেনি সে। আগে থেকে জানতে পারলে অন্ততঃ পালাতে পারত। প্রাণটা ধুক্‌ধুক্ করতে লাগল কাজীর। জানালা কপাটে লাথি মারছে, শব্দ হচ্ছে ধুপ্‌ধাপ্। বুঝি ভেঙ্গে চুরমার করছে সব। এমন সময় শুনতে পেল যেন বজ্র কণ্ঠের ডাক—

চাঁদ কাজী বুঝতে পারল এ নিমাইয়ের কণ্ঠস্বর।

"ক্রোধে বলে প্রভু, আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলো মাথা॥
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কাল যবন॥
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বলে বার বার॥"

কাজী বেরুবে কি। সে তখন ঘরের মধ্যে বসে কাঁপছে থরথর করে। অনুসন্ধানে নিমাই বুঝতে পারলে ভয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছে কাজী। তখন ক্রোধ সম্বরণ করে শান্তভাবে বললে—'বলি কাজী, এ তোমার কেমন সদাচার। আমি অতিথি তোমার দ্বারে। ডাকাডাকি করছি, আর তুমি লুকিয়ে রয়েছ অন্তঃপুরে।'

বেরিয়ে এল কাজী ঘর থেকে। মাথা নত করে বললে—'তুমি ত অতিথি হয়ে আসনি। এসেছ রুদ্র মূর্তি ধরে। ধ্বংস করছ চতুর্দিক। আত্মীয় হয়ে তোমার একি ব্যবহার?'

'আমি তোমার আত্মীয়, বল কি কাজী?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে নিমাই।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ত আমার ভাগিনা হও।'

'কি রকম! কি রকম?'।

'এই দেখো দেখি, তুমি এখনো জানো না দেখছি।'

'গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥

নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥' —চৈ. চ.

'তা তুমি যদি আমাব মামা হও তাহলে কীর্তন বন্ধ করলে কেন?'

'নানা, ভাগনা, আ-আ-মি বন্ধ কবতে যাব কেন। ওই ত ওরাই এসে নালিশ জানালে। তোমাব কীর্তনের চোটে নাকি হিন্দুয়ানি যেতে বসেছে। হিন্দুশাস্ত্রে আছে ঈশ্বব নাম গোপনে মনে মনে জপতে হয়। উচ্চস্বরে করলে নষ্ট হয়ে যায় মন্ত্রের শক্তি। ওরাই ত বললে কীর্তনটা বন্ধ কবে দিতে। তা যাক গে, আমাব যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।'

'মানে?' বিস্ময়ে জিগ্গেস কবে নিমাই।

'এই দেখো আমাব বুক।' কাজী খুলে দেখালে তাব বক্ষদেশ। বুকে দু'তিনটে লাল দগ্দগে আঁচড়ের চিহ্ন।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে বইল নিমাই কাজীব মুখেব দিকে। কাজী বললে—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাগিনা, এ হলো কীর্তন বন্ধেব শাস্তি। বাতে স্বপ্নে এসেছিল এক সিংহ। সে আমাব বুকেব উপবে চেপে বললে—মৃদঙ্গ ভেঙ্গেছিস এই নে তাব প্রতিফল। এবাব বুঝলে? এ হল সিংহেব থাবাব আচড।'

নিমাই বললে—'তাহলে?'

'তাহলে আব কি। বাধা আর দেব না। চালাও কীর্তন। আমি ত দূরের কথা, বংশের সকলকে দিব্যি দিয়ে যাব, তারাও যেন কোনদিন কীর্তনে বাধা না দেয়।'

'কাজী কহে মোব বংশে কত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্তন না বাধিবে ॥' —চৈ. চ.

হুঙ্কার ছেড়ে নিমাই হবি ধ্বনি দিয়ে উঠল। প্রতিধ্বনি কবে উঠল সঙ্গে সঙ্গে সকলে।

ফিরে চললো কীর্তনেব মিছিল। কাজী বিজয় কবে নিমাই চললো সংকীর্তন করে নেচে নেচে। বেজে উঠল মৃদঙ্গ মন্দিরা। বেজে উঠল শঙ্খ করতাল। সকলে আনন্দে দিয়ে উঠল জয়ধ্বনি 'বামকৃষ্ণ', 'গোবিন্দ গোপাল।'

আর পাষণ্ডীরা, যারা দেখতে এসেছিল রঙ্গ। তারা বসেছিল গাছেব ডালে। লুকিয়ে ছিল হেথায় হোথায়। ঝোপে জঙ্গলে। তাদের মনটা হয়ে উঠল বিষাদাচ্ছন্ন। একি হলো? শেষে জয় হল বৈষ্ণবদেরই। কৃষ্ণভজারা

কেউ জখমই হলো না। দ'দশটার মাথা ভাঙল না পাইক-পেয়াদার লাঠির ঘায়ে। এবার ত দেখছি নিমাই ধরাকে সরা জ্ঞান করবে। ইতিমধ্যে ত বেটাকে শ্রীকৃষ্ণ বানিয়ে ফেলেছে। মায়ের খড়্গ নাকি কেটে ফেলবে সুদর্শন চক্রে। তাই—

'পাষণ্ডীর হইল চরম চিত্ত ভঙ্গ।
পাষণ্ডী বিষাদ ভাবে, বৈষ্ণবের রঙ্গ ॥'

॥ পঁচিশ ॥

ক্ষেপে উঠলেন কৃষ্ণানন্দ আগামবাগীশ। তাঁর ভক্তরাও হয়ে উঠল মারমুখো। হাজার হাজার ভক্ত কৃষ্ণানন্দের। সারা নবদ্বীপে প্রচণ্ড প্রতাপ তাঁর। কটা আর বৈষ্ণব আছে নবদ্বীপে। আঙুলে গুণতেও কুলোয় না। কিন্তু কৃষ্ণানন্দের শিষ্য পরিপূর্ণ সারা গৌড়ে। শাক্তরাই প্রভাবশালী।

তাহলে নিমাই সেখানে কল্কে পায় কেমন করে।

গাত্র জ্বালা করে উঠল শাক্তদের। নিমাইয়ের প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুতে সহ্য করবে না তারা। যেমন করে হোক দমন করতে হবেই ওকে।

'কিন্তু দমন করতে পারলি কই?' কেউ কেউ খোঁটা দিয়ে বললে ওদের।

'লাগিয়েছিলি জগাই মাধাইকে, লাগিয়ে ছিলি চাপাল-গোপাল আর আরিন্দা ব্রাহ্মণকেও, কই, কেউ ত পারল না নিমাইকে জব্দ করতে। উল্টে তারাই গেল উদ্ধার হয়ে। এমনি লাগিয়েছিলি ত অনেককেই। কিন্তু নিমাইয়ের এমন ক্ষমতা, সে সকলকেই নিল দলে ভিড়িয়ে।'

কথা শুনে 'রি রি' করে উঠল শাক্তদের সর্বাঙ্গ।

আর একজন ফোড়ন কাটলে—'নিমাইকে কোন দিকে জব্দ করতে না পেরে তোরাই ত গিয়েছিলি কাজীর কাছে নালিশ করতে। গ্রামের ঠাকুর বানিয়েছিলি কাজীকে। কিন্তু কেমন ফলটা ফললো দেখলি ত। চেয়েছিলি কীর্তন বন্ধ করতে। যাতে সমূলে বৈষ্ণবরা ধ্বংস হয়। কিন্তু শেষে কি হলো, কাজী প্রাণের ভয়ে নিমাইকে ভাগনা বানালো। কাজীর কাছে নিমাই অনুমতিও আদায় করে নিয়েছে, নদীয়ায় কীর্তন করবে যে যার ইচ্ছে মত। নবাব দরবার থেকে কেউ কখনো আর বাধাও দেবে না।'

সত্যি সত্যি শাক্তরা বৈষ্ণবদের বাড়বাড়ন্ত দেখে ঈর্ষায় যেন জ্বলে পুড়ে উঠল। এর একটা বিহিত যেমন করেই হোক করবে তারা। চারিদিকে বসল পরামর্শ সভা। শাক্তদের আড্ডা গঙ্গার তীরে শ্মশানে শ্মশানে। আর কালী মন্দিরে মন্দিরে। যত্র তত্র পঞ্চমুণ্ডীর আসন। সেই আসনে বসেই চললো শলা-পরামর্শ।

শেষে তারা সিদ্ধান্ত করল, এত করেও যখন নিমাইয়ের বৈষ্ণব দলকে জব্দ করা গেল না, তখন ধরতে হবে অন্য পন্থা। তারা এসে হাজির হলো

গুরুদেব তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের কাছে। মনের অভিপ্রায় জানালো গুরুদেবের পায়।

কৃষ্ণানন্দ অমনিতেই মনে মনে জ্বলছিলেন। কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না নিমাইকে। অবশ্য নিমাই ছিল তাঁর সহপাঠী। একই সঙ্গে পড়েছেন দুজনে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে।

কিন্তু হলে কি হয়, তাই বলে নিমাইয়ের 'কৃষ্ণভজার দল সারা নবদ্বীপে পড়বে ছড়িয়ে আর নিমাই হয়ে উঠবে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন অর্থাৎ ভগবান, এ কিছুতেই হতে পারে না, অসহ্য। ধৈর্যেরও ত একটা সীমা আছে।

তাই শিষ্যদের আবেদন শুনেই বললেন—'হ্যাঁ, এর প্রতিবিধান ত করতেই হবে। তোমাদের বলছি, নিমাইকে যেমন করে হোক ন'দে ছাড়া করবই।'

'কিন্তু গুরুদেব, নিমাইকে তাড়ান কি সম্ভব হবে?'

'তাহলে আমি আর কিসের গুরু। তোমরা যখন এসেছ আমার কাছে, এর একটা বিহিত আমি করবই। দেখা যাক মায়ের কৃপা হয় কি না হয়।'

মথুরায় কৃষ্ণকে নিয়ে চলে গেছে অক্রূর। কত বাধা দিল গোপীরা, কত কান্নাকাটি করলো, কৃষ্ণ কারো কথা শুনলেন না। চলে গেলেন মথুরায়। কৃষ্ণ-বিরহে গোপীরা কাঁদছে আকুল হয়ে। দগ্ধ হচ্ছে অহোরাত্র বিরহ জ্বালায়।

বড় অভিমান হল নিমাইয়ের। কৃষ্ণ এত নির্দয়, এত কৃতঘ্ন। তিনি ত্রিজগতকে না হয় মোহিত করতে পারেন। কিন্তু তাই বলে সরলা গোপীদের সর্বনাশ করা কেন। তাদের মোহিত করে বের করলি কুলের বাইরে, তারা সর্বস্ব সমর্পণ করল, আর তাদেরই নিষ্ঠুর কৃষ্ণ পালাল পরিত্যাগ করে। এতবড় নির্দয় কৃতঘ্ন শ্রীকৃষ্ণ। ওর ভজনা করে কি লাভ। না, ও নিষ্ঠুরের নাম আর জপ করব না।

গোপীদের বিরহ জ্বালা নিমাইয়ের অন্তরকে দগ্ধ করতে লাগল অহরহ। কৃষ্ণ বিচ্ছেদের জ্বালা যে কত অসহনীয় নিমাই বুঝতে পারল গোপীদের দেখে। অমন কৃষ্ণকে, না, আর কিছুতেই ভজবে না সে। গোপী মন্ত্রই সার। 'গোপী,' 'গোপী' নাম জপতে আরম্ভ করল নিমাই।

ঠিক এমনি সময় এসে হাজির হলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। বিস্মিত হলেন নিমাইকে দেখে। আরো বিস্মিত হলেন 'গোপী' নাম ভজতে শুনে। এ 'কৃষ্ণভজা' আবার গোপী নামও ভজছে যে, ব্যাপার কি। বড় বিস্মিত

হলেন কৃষ্ণানন্দ। তা নিমাই ত ফুক্‌কুড়িটা আরম্ভ করেছে মন্দ না। বেশ আছে। জাঁহাবাজ ছোঁড়া বলতে হবে। পরের অর্থে জুটছে উত্তম আহার, ভাল ভাল বস্ত্রাদিও পৌঁছে দিচ্ছে ভক্তরা। সংসারে কোন অভাবই নেই। সম্পদ যেন দিন দিন উথলে উঠছে। তা ভাই ঠাকুর হয়ে আখেরে গোছাচ্ছ ভাল। ক্ষীর, ছানা, ননীও জুটছে। শরীরটাও রেখেছ নাগরের মত তোয়াজ করে। ঘরে রয়েছে সুন্দরী নবীনা যুবতী। সম্ভোগের ত কোন অব্যবস্থা দেখছি না।

দেখছি এযুগে হরিনামই সর্বোত্তম ব্যবসা। হে-হে ভায়া আছো ভালো, আছো ভাল।

নিমাই মনে করলে এ বোধ হয় কৃষ্ণেরই দূত। আমার কুঞ্জে এসেছে, ভুলিয়ে নিয়ে যেতে আমাকে। তাই বললে—'বেরোও, বেরোও বলছি আমার কুঞ্জ থেকে। তুমি আমাকে এসেছ ভুলাতে। কি এখনো বেরোলে না, দেখাচ্ছি মজাটা।' এই না বলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করলে আগমবাগীশকে।

'বাপ্‌রে, মারে, মেরে ফেলরে, মেরে ফেলরে!' বলে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রাণভয়ে মারলেন ছুট। একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে। পিছন ফিরে তাকাবেন সে অবকাশ কোথায়। যদি মাথায় পড়ে লাঠির বাড়ি! বাব্‌বা, চার হাত লম্বায়। তায় দেহে অসুরের মত বল। এখন প্রাণটা নিয়ে পালাতে পারলে রক্ষে।

কোন রকমে শিষ্যদের ডেরায় এসে কৃষ্ণানন্দ বসে পড়লেন ধপাস্ করে। ভয়ে কাঁপছেন আর হাঁপাচ্ছেন। যাহোক, কোন রকমে বেঁচেছে পৈত্রিক প্রাণটা।

গুরুর মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে শিষ্যরা উঠলে ক্ষেপে। এই হলো বৈষ্ণবের বিনয়। এ আর কোন মতেই সহ্য করা যাবে না। ওকে দিতে হবে উত্তম মধ্যম। সঙ্গে সঙ্গেই বসে গেল পরামর্শ সভা। একমত হলো সকলেই। দেখা যাবে কত বড় ভগবান ও। নদে ছাড়া করব ঐ নচ্ছার, বজ্জাত নিমে ভগবানকে। দেখাব ওর কত বড় নাগরালি।

এদিকে ক্ষণপরেই কেটে গেল নিমাইয়ের গোপীভাব। ফিরে এল বাহ্যবস্থায়। বুঝতেই পারল সে বড় চঞ্চলতা প্রকাশ করে ফেলেছে। একে একে সব মনে পড়ল। তাড়া করেছিল লাঠি দিয়ে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে। সে ত তার নিজ জন নয়। বড়ই বিষণ্ন হয়ে উঠল নিমাই। একি করল সে। কেন এমন করতে গেল। কিন্তু সে কি তখন স্বভাবে ছিল।

নগরে জোর গুজব। কথাটা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে! শেষে নিমাইয়ের কানেও এল কথাটা। বললে নিত্যানন্দকে—'শ্রীপাদ, তুমিত

শুনেছ, আমাকে প্রহার করবে। এমন কি দরকার হলে যা করা উচিত নয়, তাও করবে।'

নিত্যানন্দ কোন উত্তর দিলেন না। বসে রইলেন অধোমুখে। তখন নিমাই বললে—'দেখ নিত্যানন্দ, যারা আমাকে মারবে বলে পরামর্শ করছে, আমি তাদের চিনি। আমি স্থির করেছি সন্ন্যাস গ্রহণ করব। কৌপীন পরে, হাতে করোয়া নিয়ে, ভিক্ষা চাইব লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে। আমার গার্হস্থ্য ধর্ম আমি পরিত্যাগ করব। দেব সংসারের সব সুখই বিসর্জন। তখন আমার ভিক্ষুকের অবস্থা দেখে ওদের আর রাগ থাকবে না আমার উপরে। ওরা বুঝতেই পারবে সত্যি সত্যি আমি নিজ সুখের জন্য কৃষ্ণকে ভজনা করি না। তখন ওদের দয়া হবে, ওরা গ্রহণ করবে স্বচ্ছন্দে আমার হরি নাম।'

বলতে বলতে কেমন যেন তন্ময় হয়ে পড়ল নিমাই। চুপ করে রইল ক্ষণকাল। যেন নিজে নিজেকে প্রস্তুত করছে মনে মনে। দৃঢ় হচ্ছে আপন সংকল্পে। ক্ষণপরে মুখ তুলে তাকাল নিত্যানন্দের দিকে। বললে দৃঢ় কণ্ঠে নিমাই—'শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, সাক্ষী রইলে তুমি, আর সাক্ষী রইল চন্দ্রসূর্য, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করবই। আমি জানি, এতে আমার নিজ জন বড় দুঃখ পাবে। দুঃখ পাবে মা আর বিষ্ণুপ্রিয়া। হয়ত আমার শোকে তারা হবে মুহ্যমান। অসহনীয় হবে আমার বিচ্ছেদ জ্বালা। হয়ত তোমরা কেউ কেউ আমার উপরে রাগ করবে। কেউ হয়ত ছেড়েও যাবে আমাকে। আর কোন কোন ভক্ত নিন্দাও করবে।

কিন্তু তুমি ত সাক্ষী রইলে, আমি স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণ করছি না। ভেবেছিলাম, আমার কৃষ্ণকে নিয়ে আমি থাকব সুখে। কিন্তু সে সুখ ত ওদের সইল না। আমি হবো চির দুঃখী ভিক্ষুক। তাহলেই ওরা সন্তুষ্ট হবে। ওদের আমার উপরে রাগ আর থাকবে না। নিত্যানন্দ, আমি যে ঘরের বার হোলাম, আমি বুঝেছি, এ জন্য আমার কোন দোষ হবে না।

এবার নিত্যানন্দ আর স্থির থাকতে পারলেন না। বললেন—'প্রভু, তুমি যদি সন্ন্যাস নেবে, তাহলে মা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে? তাঁরা বাঁচবেন কেমন করে।' তারপর ক্ষণকাল মৌন থেকে বললেন—'আমি আর কি বলব। তুমি ত চিরদিন স্বেচ্ছাময়। তোমাকে বিধি আর নিষেধ দেবে কে? তবে আমার নিবেদন—পাঁচ জন ভক্তের কাছে ব্যক্ত করুন আপনার মনের কথা। আপনার বিরহ জ্বালায়, যেন তারা মারা না যায়। বাৎলে যান উপায়। এই শুধু আমার নিবেদন।'

কথা শুনে বড় সুখী হলো নিমাই। আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল নিত্যানন্দকে।

তারপর প্রভু বললে—'নিত্যানন্দ, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি যাওয়ার আগে বলব তোমাদের। না বলে, স্থির না করে যাব না কিছুতেই।'

কেমন করে যেন সংবাদটা পৌঁছে গেল শচীদেবীর কানে। আতঙ্কে শিউরে উঠলেন তিনি। চিৎকার করে উঠলেন—'নিলে, নিলে! আমার নিমাইকে নিলে।'

কি করবেন কোথায় যাবেন, ঠিক করতে পারছেন না কিছুই। ডেকে পাঠালেন ভগ্নিকে। আচার্য চন্দ্রশেখরের স্ত্রী। নিমাইয়ের আপন মাসী। শচীদেবী ডেকে পাঠালেন তাঁকে। সংবাদ পেয়েই ছুটে এলেন তিনি। বোনকে নিয়ে বসলেন নির্জনে। বললেন অতি বিষন্ন মনে—

'শচী বলে—ভগ্নি শুন তোমারে কহি যে পুনঃ
আমার জীবন বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাসী দেখিয়া তারে বড়ই আদর করে
তা দেখিয়ে মোর লাগে ডর॥' (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)

'সন্ন্যেসীকে নিমাই বরাববই আদর করে। এতে আবার ভয়ের কি আছে। ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার কথা।' বোন জিগ্‌গেস করলেন শচীদেবীকে।

'ভয়টা ত আমার ওখানেই বোন। কাটোয়া থেকে এসেছিল কেশব ভারতী। কি আদর যত্নটাই না করল তাকে নিমাই। খাওয়াল তাকে বসে থেকে। তারপর নির্জনে বসল দুজনে। অনেকক্ষণই কি কথাবার্তা হলো। তারপর চলে গেল কেশব ভারতী। বুঝলি বোন, সেই থেকেই আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'তা, এ কথা ত নিমাইকে জিগ্‌গেস করলেই হয়।'

'সেটাই ত পারছি না রে বোন। তাই ত ডেকে পাঠিয়েছি তোকে। কি করি এখন উপায় বল?' কাতর হয়ে জিগ্‌গেস করলেন শচীদেবী।

'আমার মনে হয় সোজাসুজি নিমাইকে জিগ্‌গেস করাই ভাল।'

সহসা শচীদেবী কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। উঁকি মেরে তাকাতে লাগলেন ইতিউতি। তারপর ফিস্‌ফিস্‌ করে বোনের কানের কাছে বললেন—'নিমাইয়ের আসার সময় হয়েছে। হয়ত এসে পড়বে।'

চন্দ্রশেখরের পত্নী বসেছিলেন রাস্তার দিকে মুখ করেই। সহসা তিনি বলে উঠলেন—'ওই ত, ওই নিমাই আসছে।'

'শচীদেবী চেয়ে দেখলেন, নিমাই আজ অনেকটা সচেতন আছে। নিমাই এসে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করলে দু'জকে। মাসী বড় সংকুচিত হয়ে পড়লেন। বললেন—'থাক্, থাক বাবা হয়েছে। দীর্ঘজীবী হও। পরিপূর্ণ কর মায়ের স্বাদ।'

শচীদেবী যেন অনেকটা ভরসা পেলেন। বোন রয়েছে কাছে। যদি কিছু ঘটে সামলাবে সেই। তাই মনের সমস্ত কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে জিগ্গেস করলেন—

'দেখো, আমাকে ভাঁড়িও না। বলত সেদিন কেশব ভারতীকে অত আদর-যত্ন করছিলে কেন?'

'ও, এই কথা। তিনি ভক্ত মানুষ। তায় অতিথি, আদর-যত্ন করব না। তুমি কি যে বল মা।'

'না-না, তুমি আমাকে ভাড়াচ্ছ। ঠিক ঠিক উত্তর দিচ্ছ না কথার। সত্য করে বলত বাবা, তুমি কি আমাকে বিশ্বরূপের মত কাঁদাবে। পালাবে আমার বুকে শেল মেরে। উত্তর দে স্পষ্ট করে?'

কণ্ঠস্বর উঠছে কেঁপে কেঁপে। কখনো 'তুমি' বলছেন, কখনো 'তুই' বলে সম্বোধন করছেন। মায়ের ভাব দেখে নিমাই বললে—'দেখ মা, আমি কি করব, তা ত বলতে পারছি না। কারণ আমি স্ববশে নেই। তবে একথা তোমায় বলছি, যেখানেই যাই না কেন, তোমায় না বলে যাব না।'

শচীদেবী অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। নিমাইয়ের প্রতি এ বিশ্বাস তাঁর আছে। কখনো মিথ্যে বলেনা। চন্দ্র সূর্য মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু নিমাই কখনো মিথ্যে বলবে না। যেন অনেকটা শান্ত হল মায়ের মন। নিমাই আর যাই করুক, অন্ততঃ বিশ্বরূপের মত ছেড়ে পালাবে না। সহসা বড়ছেলের জন্য হয়ে উঠলেন অনুতপ্ত। বললেন—'দেখ বাপ নিমু, তোর কাছে আমি বড় অপরাধী রে। তুই ত আমার বাবা, আমাকে ক্ষমা করিস।'

'মা, এসব আবার কি বলছ। পুত্রের কাছে মায়ের আবার অপরাধ কি। কি হয়েছে খুলে বল?'

'তোর দাদা বিশ্বরূপ। আমাকে একটা পুঁথি দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল বড় হলে তোকে দিতে। তা আমি নিতে চাই নি। তাকে বলেছিলাম, বড় হলে তুই তোর ভাইকে দিস। সে কিন্তু শুনল না কিছুতেই। দিয়েছিল আমাকেই।'

ব্যগ্র কণ্ঠে নিমাই বললে—'দাদার পুঁথি, দিয়ে গিয়েছে আমাকে। বলে গেছে পড়তে। কই দাও। দেখি কোথায় দাদার পুঁথি।'

'রেখেছিলাম রে নিমু, যত্ন করেই রেখেছিলাম। কিন্তু হতভাগা যখন

সন্ন্যাস নিয়ে পালালো, তখন আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না। ভাবলাম, পুঁথি পড়ে তুইও যদি পালাস, তাই উনুনেই দিয়েছি তাকে ঝেঁটিয়ে। সে আর নেই রে। পুড়ে গেছে।' বলতে বলতে কেঁদে উঠলেন শচীদেবী।

'দাদার একমাত্র নিদর্শন, তাও তুমি পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে নষ্ট করে ফেলেছ। বড্ড দুঃখ হচ্ছে মা। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার কিছু দোষ নাই। ওসব তুমি ভুলে যাও, আমিও ভুলে যাচ্ছি।' সান্ত্বনা দিলে মাকে নিমাই।

'দেখ বাবা, তুই যাই কর। আমাকে দুঃখ দিস না। তোকে না দেখলে আমি বাঁচব না রে।' শচীদেবীর বুক থেকে বেরিয়ে এল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস।

'আচ্ছা মা, তুমি এত চিন্তা করছ কেন। কৃষ্ণ আছেন, তিনিই রক্ষে করবেন।'

'না না, আমি অত কৃষ্ণ-টিস্‌ন বুঝি না। আমি তোকেই চাই। নইলে বাঁচবনা।' আবেগাপ্লুত কণ্ঠে যেন মিনতি জানালেন শচীদেবী।

নিত্যানন্দের মুখখানা বিবর্ণ পাণ্ডুর। বললেন—'প্রভু, তবে কি তুমি সত্যি সন্ন্যাস নেবে?'

'কিছু কি আর আছে এদেহে? কৃষ্ণ বিরহে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমাকে এবার ছেড়ে দাও ভাই। আমি পথে পথে কেঁদে কেঁদে খুঁজব আমার কৃষ্ণকে। আমার জন্য কাঁদবে তোমরা ভক্তবৃন্দ। কাঁদবেন মা। কাঁদবে বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমাদের চোখের জল দেখলেই ত আসবে জীবের চোখে জল। তবেই ত কৃষ্ণ আমায় কৃপা করবেন।'

'প্রভু, আর যে সহ্য করতে পারছি না প্রভু।'

'কেন কাতর হচ্ছ শ্রীপাদ? তুমি না শান্ত হলে, আমার যে কিছুই হবে না।' তারপর যেন নিজেকে কতকটা সংযত করে বললে—'এখানে অদ্বৈত রয়েছেন, আছেন শ্রীবাস, হরিদাস। আপনাদের মুখ দেখে ভরসা পাচ্ছি আমি। আমাকে সাহায্য করুন এই কঠিন ব্রত উদযাপন করতে।'

ভক্তবৃন্দ বিষাদাচ্ছন্ন স্তিমিত নয়নে তাকিয়ে রইলেন প্রভুর পানে। গম্ভীর প্রশান্ত কণ্ঠে বললে নিমাই—'দেখুন, আপনারা শান্ত হোন। আমার এ দেহ, এ ত আপনাদেরই। এ দেহ নিয়ে আপনারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। বেচতে পারেন যেখানে সেখানে। তবে সর্বদা দেখতে পাবেন আমাকে। যেখানেই সংকীর্তন করবেন, আমি নৃত্য করব তার মধ্যস্থলে।'

নিমাই তাকাল শ্রীবাসের মুখের দিকে। অঙ্গীকার করে বললো নিমাই 'আমাকে দেখতে পাবেন সর্বদা আপনার ঠাকুর মন্দিরে। শুধু তাই নয়, যিনিই শ্রীকৃষ্ণ ভজন করবেন, আমার জননী, কিংবা বিষ্ণুপ্রিয়া বা ভক্তবৃন্দ আপনারা—সকলেই দেখতে পাবেন আমাকে। রইল আমার এ প্রতিশ্রুতি আপনাদের সকলের কাছেই।'

কথাটা আর চাপা রইল না। কানাকানি হয়ে উঠল শচীদেবীর কানে। বিষ্ণুপ্রিয়া গিয়েছে বাপের বাড়ীতে। সেই অগ্রহায়ণ মাসে। ফেরেনি এখনও।

শচীদেবী সংবাদটা শুনেই ছুটে এলেন নিমাইয়ের কাছে। 'ওরে নিমাই, নগরে একি শুনছি রে?'

তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে নিমাই। ৬৭ বছরের বৃদ্ধা জননী। ক্ষত বিক্ষত অন্তর তাঁর। দুঃখের দহন জ্বালায় জ্বলছে যেন দাউ দাউ করে। দু'চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে তপ্ত অশ্রু ধারা। 'কি রে নিমাই, কিছু বলছিস না কেন?'

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল নিমাই—'তুমি আমায় ক্ষমা কর মা। শোক-সন্তপ্তা তুমি। অতি বৃদ্ধা। আমি তোমার একমাত্র পুত্র। পালন করেছ কি অফুরন্ত স্নেহে। আমাকে দেখে ভুলে রয়েছ সকল সন্তাপ। ঘিরে রেখেছ প্রগাঢ় মমতায়। আমি তা বুঝি। উপলব্ধি করি মর্মে মর্মে। কিন্তু…

কি জান মা, আমি তোমার বড় অক্ষম সন্তান। পারলাম না, এ জীবনে তোমার ঋণ শোধ করতে পারলাম না। জানি, কোটি জন্ম জন্মান্তরেও পারব না শোধ করতে। লোকের যেমন অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, বধির, অক্ষম পুত্র জন্মে। আমিও তোমার তেমনি এক অপদার্থ সন্তান। আমি লাগলাম না তোমার কোন কাজে। পারলাম না তোমার সেবা করতে।'

'ওরে নিমাই, এসব তুই কি বলছিস রে। তুই যে আমার নয়নের নিধি। লক্ষ তারার একটি মাত্র চন্দ্র। তুই কি মারতে চাস আমাকে?'

কৃষ্ণ-বিরহী নিমাই বুঝি আজ মানবে না কোন বাধা বন্ধন। ভালই হয়েছে, মা তাকে আজ জিগ্যেস করছেন নিজে থেকেই। ভাবছিল সে কেমন করে বলবে কথাটা। মায়ের চোখে জল, নিমাইয়ের চোখেও জল। সহসা শচীদেবী বসে পড়লেন পুত্রের সামনে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন নিমাইয়ের মুখের দিকে। যেন পুত্রের চোখের ভাষা পড়তে চাইছেন তিনি।

সহসা বললে নিমাই—'বলেছিলাম, তোমাকে না বলে কোথাও যাব না। এখন বলছি বৃন্দাবন যাব খুঁজব আমার শ্রীকৃষ্ণকে। সন্ন্যাসী হয়ে খুঁজব বৃন্দাবনের পথে পথে। দাও মা, তুমি সহজ মনে আমায় অনুমতি দাও।'

'না, শচীদেবী মূর্চ্ছিত হলেন না। নিমাইয়ের কথার উত্তরও দিলেন

না। পুত্রের মুখের দিখে তেমনি স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন অস্ফুট স্বরে—

'বিষ্ণুপ্রিয়া ?'

হেঁট হল নিমাইয়ের মাথা। দেখি এবার নিমাই কি বলে। পরের মেয়েকে ও কি শেষে কাঁদাবে। তাকে কি করবে অনাথিনী। সে যে জ্বলন্ত আগুন। যৌবন তার কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

এবার মাথা তুললে নিমাই। বললে—'তার জন্য ত আমার দুঃখ নাই। তাছাড়া যে দুঃখ পাবেই বা কেন। দুঃখ তার হতে পারত, আমি যদি আকৃষ্ট হোতাম অন্য নারীর প্রতি। কিংবা চলে যেতাম এ জগত ছেড়ে। আমি ত রইলাম। তবে একটু দূরে। আমি ত সাধু পথেই যাচ্ছি। সে আমার হয়ে তোমার সেবা করবে। সুখ পাবে তাতেই সে। তুমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিও আমার কথা। সে জানাবে তোমাকে তার অন্তরের ব্যথা। দু'জনেই হবে ব্যথার ব্যথী। দেখবে সুখী হবে দু'জনেই। শুধু তোমার পদে একটি নিবেদন মা, তুমি তাকে শিক্ষা দিও কৃষ্ণ নাম। তোমার কাছে এই শুধু আমার ভিক্ষা।'

'আচ্ছা নিমাই, তুই যে বলিস মা বাবার মত গুরু সংসারে নেই। আবার বলছিস কৃষ্ণ নামের কথা। মা বাবার চেয়ে বড় হল কি তোর কৃষ্ণ ?' কাঁদতে কাঁদতে প্রশ্ন করেন শচীদেবী।

বুঝলে নিমাই, মার কাছ থেকে সহজে অনুমতি মিলবে না। বললে, মাগো—

'সকল জন্মেতে মাতা পিতা সবে পায়।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥' চৈ· ম·

এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললেন শচীদেবী। 'হ্যাঁরে নিমাই, লোকে তোকে ভগবান বলে। সর্বজীবে তোর দয়া। কেবল এই চিরদুখিনী অভাগিনী মায়ের প্রতি কেন তুই এত নির্দয় ?'

'সর্বজীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ।
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ॥
আগেতে মরিব আমি পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিবে ভক্ত সব বুক বিদারিয়া॥' চৈ· ম·

নির্বাক নিমাই। যেন নির্মম পাষাণ। মায়ের অনুমতি তার চাই। তা না হলে সন্ন্যাস গ্রহণ সম্ভব নয়। শচীদেবী দেখলেন নিমাইকে কিছুতেই সংকল্পচ্যুত করতে পারছেন না। তাই কিছু উপদেশ দিয়ে বললেন—'তুই যদি

নিতান্তই সন্ন্যাস নিবি, আরো কিছু দিন সংসারে থাক। এমন তরুণ বয়সে কেউ কি সন্ন্যাস নেয়। তোর ত কাম আছে, লোভ আছে, মোহ আছে। দেহে আছে যৌবন। এদের পীড়ন করে সন্ন্যাস ব্রত কি সফল হবে ?

বুঝলে নিমাই, মায়ার বন্ধনে মা তাকে চাচ্ছেন জড়াতে। তাই নিমাই তাকালো মায়ের দিকে প্রেমপূর্ণ নয়নে। কি যেন হয়ে গেল শচীদেবীর। কোথায় যেন চলে গেলেন তিনি। ছিন্ন হলো তার লৌকিক বন্ধন। উপস্থিত হলেন জ্ঞান তীর্থে। দেখতে পেলেন প্রিয় পুত্রের এক প্রশান্ত অপার্থিব রূপ।

'সেইক্ষণে বিশ্বম্ভর কৃষ্ণ বুদ্ধি হইল।
আপনার পুত্র বলি মায়া দূরে গেল॥
নবমেঘ জিনি দ্যুতি শ্যাম কলেবর।
ত্রিভঙ্গ মুরলীধর বর পীতাম্বর॥' চৈ· ম·

আবেগাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন শচীদেবী—'বাপ নিমাই, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কে। আমি তোকে অনুমতি দিচ্ছি, জীবের কল্যাণের জন্য তুই সন্ন্যাস নে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তোকে শান্ত মনেই বলছি।'

সহসা বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে গেল শচীদেবীর। মনে হল তিনি যেন ভ্রমে পতিত হয়েছেন। উথলে উঠল তাঁর বাৎসল্য প্রেম। নিমাই যে তার সন্তান। জ্বলে উঠল হৃদয়ে অনুশোচনার আগুন দাউ দাউ করে। লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতে। কেঁদে উঠলেন ডুকরে।

—'এ আমি কি করলাম। নিমাইকে অনুমতি দিলাম সন্ন্যাস গ্রহণের।'

'আমি কি বলিতে কি বলিলাম।
মা হয়ে নিমায়ে বিদায় দিলাম॥' চৈ· ম·

হায় এ কি সর্বনাশ করলাম। নিমাই ত আমার উপরেই নির্ভর করেছিল। আমি বিসর্জন দিলাম আমার সোনার গৌরাঙ্গকে। হায়রে, এ আমি কি করলাম। ওরে নিমাই···নিমাই···নিমাই !!!' মূচ্ছিত হয়ে পড়লেন শচীদেবী।

নিমাই আর স্থির থাকতে পারছে না। করুণ নয়নে তাকালো মায়ের দিকে। তারপর সান্ত্বনা দিয়ে বললো মাকে—তুমি অমন করে কেঁদ না মা। যে দিন আমাকে অনুরাগ ভরে স্মরণ করবে, তোমায় আমি দেখা দেব কথা দিচ্ছি।'

কোন উত্তর দিলেন না শচীদেবী। তাকিয়ে রইলেন বাণ-বিদ্ধা বিহঙ্গিনীর মত নয়নে। শুধু চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

নিমাই এগিয়ে গেলো মায়ের কাছে। বললে—'ওঠ মা। যাওয়ার আগে তোমায় না বলে যাব না।'
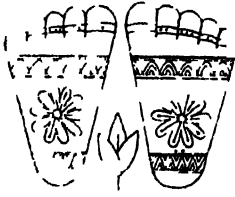
॥ ছাব্বিশ ॥

ধীরে ধীরে এল বিষ্ণুপ্রিয়া। ঘুমাচ্ছেন প্রভু। শীতের রাত। নিস্তব্ধ। নিঝঝুম। হাতে পানের বাটা। রেকাবিতে চন্দন আর মালা। করেছে অল্প-স্বল্প বেশবিন্যাস। আস্তে আস্তে পানের বাটা আর রেকাবি রাখল খাটের তলায়।

আধো ঘোমটা মাথায়। কপালে সিন্দুরের ফোঁটা নিয়েছে ভারী সুন্দর করে। এসে দাঁড়ালো শিয়রের কাছে। তোষকে আবৃত সারা দেহ। শুধু মুখমণ্ডল অনাবৃত। কি সুন্দর সৌম্য শান্ত প্রশান্ত সে মুখ। লেগে আছে হাসিটুকু। দেখছে, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণভরে দেখছে। জ্যোতি যেন ঠিকরে পড়ছে।

বাপের বাড়ী থেকে চলে এসেছে। অনাহূত ভাবেই। নিজেকে সে ধরে রাখতে পারে নি। চারিদিকে কানাঘুষা। নিমাই নাকি সন্ন্যাস নেবে। ছেড়ে যাবে তাকে, মাকে। কথাটা কেমন যেন বিশ্বাস হয় না। যদি সত্যি সন্ন্যাস নেবে, তাহলে কীর্তন কি বন্ধ হয়ে যাবে। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর, ঠাকুর হরিদাস—এরা সব বাঁচবেন কেমন করে। এঁরা যে অত্যন্ত ভালবাসে তার প্রভুকে। কেন, মাকেও কি প্রভু কম ভালবাসেন। আমি না হয় তার পথের কাঁটা, সাধনার অন্তরায়। আমার প্রতি অনাদর, অবহেলা করছেন। সে আমার দুর্ভাগ্য। তিনি করুন। এঁদেরকে উনি কাঁদাবেন কেমন করে।

বাপের বাড়ী থেকে আসতে আসতে অনেক কথাই ভেবেছে প্রিয়া। সে জিগ্গেস করবে, একথা কি সত্যি। সত্যি কি উনি সবাইকে ছেড়ে যাবেন। ভাসাবেন সবাইকে শোক সাগরে।

কিন্তু এখন যে ঘুমোচ্ছেন উনি। জাগান কি ঠিক হবে। অমনিতেই ত ঘুমান না। মা বলছিলেন, কয়েকদিন ধরে শরীরটা নাকি ভাল যাচ্ছেনা। তাই যাননি কীর্তনে। ভালই হয়েছে। ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন।

ধীরে ধীরে বসে পড়ল প্রিয়া। একেবারে স্বামীর পায়ের কাছে, খাটের উপরে। অপলক। প্রিয়া দেখছে স্বামীর মুখচ্ছবি। একবার ভাবলে, হাত বুলিয়ে দিই প্রভুর পায়ে। যদি ভেঙ্গে যায় ঘুম। হাত যা ঠাণ্ডা। শীতে যেন বরফ। এ হাত স্পর্শ করলেই ত ভেঙ্গে যাবে প্রভুর ঘুম। চমকে উঠবেন প্রভু।

হাত দুখানা লেপের নীচে রেখে বসে রইল বিষ্ণুপ্রিয়া। তেমনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিমাইয়ের মুখের দিকে। একটু উষ্ণ হল। এবার ধীরে কোমল করে হাত বুলোতে লাগল প্রভুর পায়ে আহা, কি সুন্দর দীঘল পদযুগল। প্রাণভরে স্পর্শসুখ অনুভব করছে প্রিয়া। তারপর ধীরে ধীরে দু'হাত দিয়ে আদর করে প্রভুর চরণ তুলতে লাগল। বুকের কাছে। বড় ভয়, যদি ঘুম ভেঙ্গে যায় প্রভুর। চরণযুগল কবোষ্ণ বক্ষে চেপে ধরল প্রিয়া। আহা, একটু সুখ যদি পান। যদি জুড়ায় আমার হৃদয়। পদস্পর্শে হয়ত মুছে যাবে আমার মনের মালিন্য।

না না, আমি আজ থেকে স্মরণ নিলাম এই পদে। এই চরণ তীর্থে। পুলকে, আনন্দে, গর্বে এই মুহূর্তে বিষ্ণুপ্রিয়া মহাভাগ্যবতী মনে করল নিজেকে। রসবল্লভা তার নীরব সেবা দিয়ে তৃপ্ত করছেন রসবল্লভকে। এও ঈশ্বর-সমীপে তার সেবা নিবেদন। বিষ্ণুপ্রিয়া ত জীবেরই প্রতিভূ।

বিষ্ণুপ্রিয়ার দুগণ্ড বেয়ে নেমে এল আনন্দাশ্রু। দু'ফোটা উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দু পড়ল স্বামীর শ্রীপাদপদ্মে। ঘুম ভেঙ্গে গেল নিমাইয়ের। তাকিয়ে দেখল, প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে পদতলে বিষ্ণুপ্রিয়া। কাঁদছে নীরবে অঝোর ধারায়।

'দুনয়নে বহে নীর ভিজিল হিয়ার চীর,
চরণ বাহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে পহু আচম্বিতে,
বিষ্ণুপ্রিয়ার পুছে অভিপারা॥
মোর প্রিয়-প্রিয়া তুমি কান্দ কি কারণে জানি,
কহ দেবি ইহার উত্তর।' চৈ. ম.

'কি হলো, কাঁদছ কেন প্রিয়া?'

আদর করে প্রিয়াকে তুলে বসাল আপন উরুর উপরে। টেনে নিল বুকের মধ্যে। তারপর স্নেহমাখা স্বরে বলতে লাগল—প্রিয়া, বল, কেন কাঁদছ তুমি? অমন করে আমাকে দুঃখ দিও না। কথা বল, কি হয়েছে তোমার। এই ত তোমায় আমি কোলে করেছি। বুকে নিয়েছি আদর করে। কি দুঃখ তোমার, দয়া করে বল।'

নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রুসিক্ত নয়ন যুগল সোহাগ ভরে মুছিয়ে দিল নিজ হাতে।

কিন্তু কি বলবে বিষ্ণুপ্রিয়া। কণ্ঠ যে তার রুদ্ধ। প্রিয়া ত বলতে চায়। চেষ্টা করছে সে। তবুও পারছে না কিছু বলতে। নিমাই আদর করে

হাত বুলাতে লাগলো বিষ্ণুপ্রিয়াব মাথায়। নীরব ভাষায় দিতে চাইল সান্ত্বনা।

অনেক কষ্টে বিষ্ণুপ্রিয়া তাকালো তার প্রাণবল্লভের দিকে। থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে দুটো ঠোঁট। বলতে লাগল কম্প কণ্ঠে—'ওগো, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে বলো। তুমি কি দাদাব মত চলে যাবে আমাদের ছেড়ে? তুমি কি সন্ন্যাস নেবে?'

কেমন যেন কেঁপে উঠল নিমাই। বিষ্ণুপ্রিয়া এ কথা জানল কেমন করে। ওব বাপেব বাডীতে এ সংবাদ পেঁছাল কেমন করে? এ সংবাদ ত সে রেখেছিল একান্ত গোপনে। এখন কি বলবে সে। কি বলে প্রবোধ দেবে বিষ্ণুপ্রিয়াকে।

নিমাই আরো নিবিড করে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল প্রিয়াকে। তারপব চিবুকটা ধবে মুখেব কাছে মুখ বেখে মিষ্টি হাসি হেসে বললে—'এ কথা কে বললো তোমাকে? দেখ দেখি মিছে মিছি কত দুঃখ পাচ্ছ।'

'কই তুমি আমাব মাথায হাত দিযে দিব্যি কব। বল, সত্যি কথা বলো।'

'এই দেখ দেখি আবাব কান্নাকাটি কবছ। কতদিন পবে কাছে এলে। কই আদব কবব। দেখব প্রাণভবে তোমাকে। তা না কেবল পাগলামি।'

এবাব কেমন যেন অভিমান হলো প্রিয়াব। ধরা গলায় বললে—তুমি নাকি আমাকে দেখবে, আদব কববে। এতদিনে একবার কি গিয়েছিলে? খোঁজ নিয়েছিলে আমাব। আমি ত কথাটা শুনে নিজেই ছুটে এসেছি। অনাহূত হযে। আমি তোমাব কে, কেউ নয।'

সহজ সবল কণ্ঠে বললে নিমাই—'কেন বল ত, অকাবণ শুধু দুঃখ পাচ্ছ। একথা কে বললো তোমায?'

'আমি জানি গো জানি। সব শুনেছি। তুমি ভেবেছ আমার কাছে গোপন কববে। আমি জানতে পাবব না কিছুই।

হাসতে হাসতে নিমাই বললে—আবাব সেই ছেলেমানুষি।'

'না-না, ওসব আমি শুনতে চাই না। কই, তুমি আমাব মাথায় হাত দিয়ে বলো?'

বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়েব হাতটা নিয়ে চেপে ধরল নিজের মাথায়।

নিমাই আবেগে আশ্লেষে চেপে ধবল বিষ্ণুপ্রিয়াকে আপন বক্ষে। মুখে চুমু দিয়ে মধুব মাধুবীতে ভবিয়ে তুললো প্রিয়ার অন্তর। এ এক প্রণয়-মধুর স্নিগ্ধ বজনী। এমন রাত প্রিয়াব জীবনে আসেনি কখনো। এ স্বাদ

অনাস্বাদিত। চতুর্দশী নবীনা তন্বী আজ নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চায়। আজ সাজিয়েছে সে রূপের অঞ্জলি। নিমাই ভুলাতে চায় তার প্রিয়াকে। দুজন দুজনকে দেখেই যেন হয়ে উঠে প্রলুব্ধ।

এ যে ভুবন ভুলান রূপ। নয়ন লোভন কান্তি। বুঝি বা মদনও মুরছি যায়। দেহের প্রতিটি ঘাটে ঘাটে লেগেছে যৌবনের জোয়ার। প্রিয়ার আনিতম্ব কেশগুচ্ছ। লোভন-লোলুপ জঙ্ঘা। উন্মুখ সুডৌল স্তন যুগল। উদ্ভাসিত যেন চন্দ্রবিভায় উন্নত নাসা। সুরেখাঙ্কিত ললাট দেশ। গৌর গরবিনী প্রিয়া আজ সত্যি গৌর-প্রিয়া। মৃণাল সদৃশ দু'বাহু প্রসারিত করে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকালো বিষ্ণুপ্রিয়া। তারপর গৌরাঙ্গ সুন্দরকে আবদ্ধ করলো প্রিয়া নিজের কবোষ্ণ বক্ষে। যৌবন সম্রাট আজ উপস্থিত। একটি খরস্রোতা নদীব উপকূলে।

পিষ্ট করে বিষ্ণুপ্রিয়া স্তন হতে স্তনান্তরে। চেপে চেপে ধরে নিমাইকে। তাব প্রাণবল্লভকে। সুসজ্জিত দুটি মঙ্গল কুম্ভ। দেহ-মন্দিরের প্রবেশ পথ। উভয় উভয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ। মাঝে মাঝে উঠছে সীৎকার। অধরে অধর রেখে জেগে উঠে আত্ম মদিরা পানের আকুলতা। প্রাণের রসে প্রেমের বন্ধনে যেন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল দু'টি কুসুম একটি বৃন্তে। এ বুঝি ভক্ত ভগবানের মিলন। অভেদাত্মা নারী আর পুরুষ।

শ্রীরাধিকা আজ বুঝি আবদ্ধ করেছেন তার কুঞ্জে কৃষ্ণকান্তকে। রসবল্লভা যৌবন দিয়ে পবিতৃপ্ত করছেন তার রসবল্লভকে। তাইত—

'না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভাব পেশল জানি॥'—রায় রামানন্দ

আজ নদীয়াবিনোদ নদীয়া-বিনোদিনীর সঙ্গে লীলামত্ত বিলাস বাসরে। আজকেব এ রজনী হোক বিশ্ব-বন্দিত। এ রাত হোক ভক্ত বন্দিত। বুকেব দিগন্তে প্রিয়ার যেন একটি প্রার্থনা রণিত হয়ে হচ্ছে ধ্বনিত—'এমনি করে তুমি আমায় বক্ষে রেখ চিরকাল।'

হয়ে এল আনন্দ অবশ তনুমন। কে যেন ঢেলে দিল ক্লান্তির মাদকতা। ঘুম নেমে এল চোখে। প্রিয়া আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে ঢুলে পড়ল নিদ্রার সুখদ ক্রোড়ে।

'হিয়ার উপর হৈতে শেজে না ছোঁয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
নিদের আলিসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥

হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ানে।
নাসিকায় নাসিকায় নয়ানে নয়ানে ॥
ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ নিসাস।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস ॥'—জ্ঞানদাস

রাত স্তগভীর সহসা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে জেগে উঠল প্রিয়া। বিস্ময়ে বিমূঢ়া। অন্তরআত্মা কেঁদে উঠল হাহাকার করে।—'এ কি! ওগো, তুমি এমন করে কাঁদছ কেন?'

চমকে উঠল নিমাই। বললে—'কই, না ত। কাঁদছি কই। কে বললো তোমায়? এই ত আমি দিব্যি হাসছি।'

বিষ্ণুপ্রিয়া ধরে ফেলল নিমাইয়ের কপট কৌতুক। কেমন যেন একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠল তার বুকে। প্রভুর দুখানি হাত আপন বুকে চেপে ধরে বললে—'দেখ, তোমার ভাব আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমি মেয়ে মানুষ, কিন্তু তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ। আমার কাছে লুকোচ্ছো তুমি সত্যি করে বলত কেন তুমি কাঁদছিলে?'

প্রভু কর বুকে নিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,
মিছা না বলিহ মোর ডরে।
হেন অনুমান করি যত কহ সে চাতুরী,
পলাইবে মোর অগোচরে ॥' —চৈ. ম.

মাথা তুলে তাকাতে পারছে না নিমাই। অবনত মস্তক তার। রুদ্ধ বুঝি কণ্ঠস্বর। মাথা তেমনি নীচু করে প্রভু বললে—'যা শুনেছ, সব সত্যি। আমি বৃন্দাবন যাব। আমার কৃষ্ণের অনুসন্ধানে।'

যেন বজ্রাঘাত হল বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথায়। সে চাইল আর্ত চীৎকার করে উঠতে। কিন্তু কণ্ঠ তার রুদ্ধ। স্ফুরিত হলো না কোন স্বর। ঘন ঘন কাঁপছে অধরোষ্ঠ। সেঁচে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে অশ্রুর বন্যা। হতাশায় বিদ্ধ-বিহঙ্গের মত ক্ষীণ স্বরে বলে উঠল প্রিয়া।

—'তুমি, তু-উ-মি, স-ন্যা-স নেবে?'

মূর্ছিত হয়ে ঝঞ্চাক্ষুব্ধ বিহঙ্গিনীর মত প্রিয়া ঢলে পড়ল গৌরাঙ্গের কোলে।

'প্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া?'

না, কোন সাড়াশব্দ নাই। রাত্রির মত নিথর। বরফের মত ঠাণ্ডা। পাষাণের মত নিশ্চল।

'হায়, হায়, এ আমি কি করলেম। আমি কি নারী বধের পাপে নিমজ্জিত হলেম।' ধীরে ধীরে প্রিয়াকে তুলে নিলে আপন কোলে। মুখের কাছে মুখ দিয়ে বললে—'ওঠ, ওঠ, প্রিয়া। তাকাও চোখ মেলে। আমাকে এত বড় আঘাত তুমি দিও না। এই যে, শোন, শোন আমার কথা!'

নিমাইয়ের আকুল কণ্ঠের ডাকে, ফিরে এল প্রিয়ার জ্ঞান। অশ্রুসজল নয়নে করুণ দুটি আঁখি মেলে তাকিয়ে রইল গৌরাঙ্গের মুখ পানে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসলে। নিমাইয়ের মুখোমুখি। তার পতি দেবতার সামনে। না, কোন দ্বিধা নয়, দ্বন্দ্ব নয়, বোঝাবুঝি সে আজ করে নেবেই। এক দিন শচীদেবী তাকে বলেছিলেন—"বৌমা, তোর জিনিস তুই বুঝে নে।'

আজ এসেছে সেই বোঝাবুঝির লগ্ন। আজ তাকে দৃঢ় হতে হবেই। না, কোন মতেই হার সে স্বীকার করবে না।

নিমাই হাত বুলোচ্ছে প্রিয়ার মাথায়। ক্ষণ পরে বললে—'দেখ, তোমার কাছে আমি আর গোপন করব না। আমি সত্যি করেই বলছি, আমি বৃন্দাবনে যাব কৃষ্ণ অন্বেষণে। এতে দেখো তোমার আমার, দুজনেরই মঙ্গল হবে। তুমি অবুঝ হয়ো না।'

'তুমি যাবে বৃন্দাবনে? কৃষ্ণ অন্বেষণে। তাহলে আমার থাকবে কি?'

'কেন, তোমারও কৃষ্ণ থাকবেন।'

'না, না, আমি ও কৃষ্ণকে জানি না। চিনি না। তোমার কথা শুনে, কত দিন, কত রাত দেখতে চেয়েছি কৃষ্ণকে। আকুল হয়ে খুঁজেছি। সেই শৈশব থেকে। বিষ্ণুবিগ্রহের পাদপীঠে কতবার মাথা খুঁড়েছি। কিন্তু কি দেখেছি জান? সেখানে ও দেখেছি তোমাকে। জ্ঞানাবধি আমি ত চেয়েছি তোমাকে। পাওয়া রত্নকে বলো না তুমি, কেউ হারাতে চায়। তুমি যে আমার জন্ম জন্মান্তরের সাধনার পুণ্য ফল গো। আমার কৃষ্ণ, বিষ্ণু, তুমি, তুমি, তুমি। আমি চাই না তোমার কৃষ্ণকে।' প্রিয়া, আজ যেন উন্মাদিনী।

না, কিছুতেই পারছে না নিমাই শান্ত করতে প্রিয়াকে। বিষ্ণুপ্রিয়া অনুমতি না দিলে তার যে সন্ন্যাস নেওয়া হবে না। তা হলে কি করে যাবে সে। সন্ন্যাস নেওয়া তার কি হবে না। এবার নিমাই অনেকটা যেন অনুরোধ করে বললে—'দেখো, তোমার নাম ত বিষ্ণুপ্রিয়া? সার্থক করে তোল সে নাম। তুমি আমার ভাল চাও, আর আমিও তোমার ভাল চাই। দুজনেরই মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়, এমন কাজই করা ভাল। এস আমরা উভয়েই কৃষ্ণ ভজনা করি।'

অত তত্ত্বকথা বোঝার ইচ্ছে নাই তার। অতসব বুঝতেও চায় না সে।

ও যাই বলুক নিমাই। এটুকু বিষ্ণুপ্রিয়া বেশ বুঝতে পারছে, দু'জনের ছাড়া-ছাড়ির কথা বলছে নিমাই। তাই বললে প্রিয়া—'দেখো, তুমি যাই করো। বাড়ী ছেড়ে যেও না। আমি যদি তোমার পথের কাঁটা হই, যদি আমাকে সহ্য করতে না পার, আমি থাকব না এখানে। চলে যাব বাপের বাড়ী। তোমার কাছে আসব না। কিন্তু মা যে তোমাকে না দেখলে বাঁচবেন না। নির্ঘাৎ মারা যাবেন তিনি। লোকে তোমার নিন্দে করবে। সে যে আমি কিছুতেই সইতে পারব না গো। না, না, তোমার সন্ন্যেস নেওয়া চলবে না।'

'কিন্তু মা ত আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।' শান্ত স্বরে অথচ স্পষ্ট করে বললে নিমাই।

'কি বললে? মা অনুমতি দিয়েছেন?'

গম্ভীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললে নিমাই—'হ্যাঁ, জীবের কল্যাণের জন্য তিনি আমাকে দিয়েছেন সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি।'

বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। মাথা নত করে বললে বিষ্ণুপ্রিয়া—'মা তোমায় অনুমতি দিলেন? তা হলে আর কি বলব।'

ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল বিষ্ণুপ্রিয়া। টপ টপ করে চোখ দিয়ে পড়তে লাগল জলের ফোঁটা। তারপর কাঁদতে কাদতে নিজেকে নিজেই বলতে লাগল—'আজ কদিন দেখছি চারদিকে বড় অমঙ্গল। বুঝেছি, আমার কপালে সুখ নেই। এখন বেশ বুঝতে পেরেছি, যেন বাসরে যাওয়ার পথে উছট্ লেগেছিল।'

এবার মুখ তুলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে—'হ্যা গো সত্যবাদী, তুমি বলেছিলে না, ও সব কিছু নয়। তোমার ভয় কি, আমি ত রয়েছি বল ত এখন কি হচ্ছে?'

নিমাই মস্তক অবনত করল। কোন উত্তরই দিলে না। বিষ্ণুপ্রিয়া নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললে—'তোমার আর দোষ কি বল? ও সবই আমার ভাগ্য। তুমি ত গুণনিধি। আমার কপাল মন্দ। তাই বিধি পতি থাকতেও লিখেছেন আমার কপালে বৈধব্য।'

কিন্তু এসব কি। এসব আমি কি দেখছি। আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না, তুমি আমার সঙ্গে তামাসা করছ?'

নিমাইয়ের চোখেও জল। অশ্রুপূর্ণ লোচনে বললে—'প্রিয়া, এ স্বপ্নও নয়, তামাসাও নয়। আমি সত্য সত্যই সন্ন্যাস নেব।'

চমকে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়া। যেন হিতাহিত জ্ঞান নাই তার। বলতে আরম্ভ করল পাগলের মত। 'কি বললে তুমি। কোথা যাবে? কেন যাবে? যাব

বললেই হলো। এই আমি ডাকছি মাকে। আমাকে না হয় তুমি পায়ে ঠেললে, দেখা যাবে বৃদ্ধা মাকে ফেলে কি করে পালাও!'

উঠে পড়লে প্রিয়া। উন্মাদিনী সে। মাকে ডেকে আনবেই।

নিমাই ধরে ফেললো প্রিয়াকে। দু'হাত দিয়ে বেষ্টন করে বসাল কোলের উপরে। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে—'ধৈর্য ধর, একটু ধৈর্য ধর প্রিয়ে। আমি ত যাব। তাতে কি তুমি ভেবেছ, আমার দুঃখ হচ্ছে না। তুমিও ত দুঃখ পাচ্ছ। তুমি পতিপ্রাণা। কিন্তু সব দুঃখ একা আমার ঘাড়ে না চাপিয়ে অন্ততঃ কিছুটা তুমিও নাও। মার কাছে ত আমি অনুমতি নিয়েছি, এখন দয়া করে ভিক্ষে চাইছি, তুমি আমায় অনুমতি দাও।'

'বল কি, মা তোমায় অনুমতি দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, খোলা মনে, বিশ্বাস করো সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন।'

'দিয়েছেন বলছ, তা তিনি দিতে পারেন। তিনি আর কদিন বাঁচবেন! কিন্তু তুমি বলত, আমি সারা জীবনটা কেমন করে, কার কাছে কাটাব? তুমি আমাকে কার হাতে রেখে যাবে? কে, কে আমাকে রক্ষা করবে?'

নিমাইয়ের কোলে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে প্রিয়া। বুঝতে পারছে না, কেমন করে কিভাবে বললে প্রভু সদয় হবেন তার প্রতি। তার যে কিছুই মনে আসছে না। তাই একই কথা বার বার ঘুরে ফিরে বলতে থাকে প্রিয়া।

—'দেখো, আমি তোমাকে একটা কথা বলি। মাকে তুমি ফেলে যেও না। ওতে ভীষণ অধর্ম হবে তোমার। তুমি সন্ন্যাস নেবে, তার মানে আমাকে ত্যাগ করবে। এজন্য বাড়ী ছাড়বে কেন? আমি না হয় বাপের বাড়ীতেই থাকব।'

সজল নয়নে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল বিষ্ণুপ্রিয়া। বুঝতে পারল প্রিয়া প্রভু তার কথা অনুমোদন করেন নি। তখন আহত অভিমানে বললে—'আচ্ছা, এতেও হবে না! তাহলে আমি বিষ খাব? না হয় গঙ্গায় ডুবে মরব। তুমি ঘর ছেড় না গো। মাকে ত্যাগ করা অধর্ম। চারিদিকে লোকে নিন্দে করবে। সন্ন্যাসের দুঃখ তুমি নিও না।

'কি কহিব মুঞি ছার আমি তোমার সংসার
সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লয়ে মরি যাই বিষ খেয়ে
সুখে নিবেসহ নিজ ঘরে॥
(প্রভু) না যাইহ দেশান্তরে, কেহো নাহি এ সংসারে।'—চৈ. ম.

বিষ্ণুপ্রিয়ার আকুল আকুতি বুঝি স্পর্শ করল নিমাইকে। অতি কাতর ও

করুণ স্বরে বললে নিমাই—"প্রিয়া, তুমি আমার সব কথা বুঝতে পারছ না। আমি এসেছি এ জন্মে শুধু কাঁদতে। এত কাঁদলেম, অশ্রু জলে ভাসিয়ে দিলেম ধরণীর ধূলি। তবু জীব নিলে না কৃষ্ণ নাম। এখন আমার নিজ জন যারা, তাদের কাঁদতে হবে সকলকে একত্রে। কেঁদে কেঁদে ভেজাতে হবে জীবের হৃদয়। আমি তোমাদের ত্যাগ করলেই—কাঁদবেন বৃদ্ধা জননী। প্রিয়া, আকুল হয়ে তুমিও কাঁদবে। তখন জীব বৃদ্ধা মায়ের বুকফাটা কান্না দেখে, আর আমার প্রাণপ্রিয়া, তোমার নবীন যৌবনের অবস্থা দেখে জীবের হৃদয় হয়ে উঠবে করুণার্দ্র। তখনি তারা নেবে হরি নাম। মায়ের কাছে নিয়েছি অনুমতি। এখন নেব তোমার কাছে। কাঁদতে হবে প্রিয়া, মাকে আর তোমাকে। তবেই ত উদ্ধার পাবে কলিহত জীব।'

নিমাইয়ের কথা শুনে বিষ্ণুপ্রিয়া হলো স্তম্ভিত। তারপর নিজের যেটুকু গর্ব ছিল, যেটুকু অহংকার ছিল, যা লজ্জায় সে বলতে পারেনি এতদিন, তাই আরম্ভ করলে বলতে।

'দেখো, আমি আজ লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে তোমায় বলব। আমি যখন গঙ্গার ঘাটে যাই, শুনি, লোকে তোমাকে দেখে তোমার রূপগুণের প্রশংসা করে। পথেও শুনি, ঘরেও শুনি সকলেই তোমার রূপগুণের প্রশংসা করছে। তখন আমার কি মনে হতো জান, গর্বে ভরে উঠত আমার বুক। সেই তুমি আমার স্বামী, একমাত্র আমার সামগ্রী। ওতে নেই অধিকার কারো। অথচ দেখ ত, আমি তোমাকে কখনো দেখতে পাইনা ভাল করে। তুমি কখনো আস না আমার কাছে। দুটো কথা পর্যন্ত কও না ভাল করে। কিন্তু তাতেও আমি দুঃখ পাইনি। ভাবতাম, না হোক, তুমিই ত আমার স্বামী। যখন কীর্তনে যাও, ফের না সারা রাত। ঘুমুতে পারতাম না। শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, আমি ত ছোট, যখন দেহে আসবে আমার যৌবন। তখন তুমি আমাকে নিয়ে করবে আহ্লাদ-আমোদ। আমি পাব তোমাকে একান্ত নিজের করে। তখন—

'আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী
তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ।
বড় প্রতি আশা ছিল নিজ দেহ সমর্পিব
এ নব যৌবনে দিবে হাত ॥' চৈ-ম·

কিন্তু, আমার ত সে আশা পূর্ণ হলো না। বলত তুমি আমার জন্য কেন দুঃখ পাবে? দেখ তুমি বাড়ী ছেড়ে যেও না। কে তোমাকে বেঁধে-বেড়ে দেবে? কে তোমার সেবা করবে? তুমি পথে চলবে কেমন করে?

দু'খানি পা তোমার যেন শিরীষ ফুল। তুমি যদি আমার গলায় ছুরি দাও, না বলে যাও চলে, বলত, তাহলে আমি কি করতে পারি? তুমি চলে যাবে, এ অনুমতি আমি দিতে পারব নাগো। তুমি আমায় অমন করে বলো না।'

স্বামী গরবে গরবিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা শুনে নিমাই বললে—'প্রিয়ে, আমি কি সংসার সুখ ইচ্ছে করে বিসর্জন দিচ্ছি। জরজর করছে আমার হৃদয়। তুমি আমাকে ঘরে রাখতে চাও কেন? তুমি ত বলছ, চাওনা নিজের সুখ, আমার সুখের জন্যে তাহলে ঘরে রাখতে চাইছ কেন? যা তোমার মনে আসছে, তাই ত তুমি বলছ। কিন্তু আমার যে নেই ঘরে সুখ। ঘরে থাকলে সুখী হবো না। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি বৃন্দাবনে যাই। তাহলেই আমি বাঁচব।'

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি বললে—'তাহলে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল আমাকে। রঘুনাথ নিয়ে গিয়েছিল জানকীকে। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে। আর নলদময়ন্তীর কথা, সে ত শুনেছি তোমার মুখেই। তুমিই ত শুনিয়েছিলে শ্রীবৎসচিন্তার কথা।' আবেগাপ্লুত কণ্ঠে উদ্বেল হয়ে বললে বিষ্ণুপ্রিয়া।

'তোমাকে নিয়ে গেলে বৈরাগ্য হয় না। ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য হলো বৈরাগ্য। বৈরাগ্য দেখলেই আকৃষ্ট হবে লোকে। আবিষ্ট হবে, করবে তার নাম কীর্তন। সস্ত্রীক আচরণ করা যায় না ভাগবত যতিধর্ম। আমি একা যাই। তুমি থাক নবদ্বীপে।'

'না, না, সে হয় না। আমি পারব না। কাঙ্গালিনী হতে তুমি আমাকে বলো না। আমি পারি না, আমার সব সুখ-সৌভাগ্য বিসর্জন দিতে।' আজ কোন স্বার্থই ত্যাগ করতে রাজী নয় বিষ্ণুপ্রিয়া।

একটু অন্তরঙ্গ হল নিমাই। বললে—'শোন, তোমাকে সার কথা বলি— 'চোখের অন্তরাল হলেই, তাকে বিচ্ছেদ বলে না। প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হলেই তাকে বলে বিয়োগ। আমি চলে গেলেও, আমার প্রীতিটুকু ত রেখে যাচ্ছি তোমার কাছে। তা যদি না রেখে যাই, তাহলে তুমি বা আমি বাঁচব কেমন করে। আমি যেখানেই যাই, আমি ত রইলাম তোমারই। জীবের দুঃখে আমি বড় দুঃখিত। তুমি আমায় বাধা দিও না। আমি তোমার পতি, তুমি ত পতিপ্রাণা। দোহাই, আমায় সহায়তা কর।'

বিষ্ণুপ্রিয়ার দু'হাত ধরে নিমাই এমনি করে জানায় মিনতি। কোন কথা বলে না বিষ্ণুপ্রিয়া। অসহায়া হরিণীর মত মুখ তুলে তাকাল স্বামীর দিকে। কিন্তু পারল না প্রিয়া। ঢলে পড়ল মূর্চ্ছিত হয়ে নিমাইয়ের কোলে।

'প্রিয় করে ধরি অনুমতি মানিতে
মূরছে পড়িলা তছু ঠাঁই ॥'

হাহাকার করে উঠল নিমাইয়ের অন্তর। অজানা আশংকায় দুরু দুরু করে উঠল বুক। প্রিয়ার কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে ডাকল নিমাই—'ওঠ, তুমি বেঁচে আছ ত? আমি তোমাকে বধ করলাম না ত? প্রিয়া, আমাকে নারী বধের ভাগী করো না। দয়া করে তুমি ওঠ। চিরদিন দুঃখ দিয়েছি তোমাকে। আজ তোমার কোমল হৃদয়ে বিদ্ধ করেছি শেল। তুমি পতিপ্রাণা। নিওনা পতির অপরাধ। চোখ মেলে তাকাও।'

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল বিষ্ণুপ্রিয়া। যেন সে হয়ে পড়েছে বড় দুর্বল। প্রভু দু'হাত দিয়ে তুলে বসাল প্রিয়াকে। চোখে আর জল নাই প্রিয়ার। শুষ্ক আঁখি পল্লব। বিহ্বল বিষ্ণুপ্রিয়া। বলল পাগলের মত।

'বলে যাও, আমি কি করব। তুমি চলে গেলে আমি তাহলে কি হবো? আমি সধবা থাকব ত? তুমি আমার স্বামী, একথা বলব ত? বা তোমার স্ত্রী বলে লোকে আমাকে বলবে ত? না বল, আমি ত্রিজগতে থাকব একাকিনী? লোকে আমাকে ভাগ্যবতী বলত, এখন যাতে অভাগিনী না বলে সে ব্যবস্থা করে যাবে ত? আর একটা কথা বলি—'

নিমাইয়ের দু'খানি হাত জড়িয়ে ধরে বললে বিষ্ণুপ্রিয়া—'তুমি সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলে লোকে আমায় বলবে কি? জগতের যত নারী আছে সংসারে তারা আমাকে নিন্দে করবে না? কালসাপিনী বলে দুষবে না আমাকে? বলবে না আমাকে, তা না হলে যৌবন কালে এর স্বামী সংসার ছেড়ে পালাল কেন? কেন হলো বনবাসী, সন্ন্যাসী। সত্যি করে বলো, আমি কি তোমাকে উত্যক্ত করে ঘর থেকে তাড়ালাম?'

নিমাই আজ পরাজিত চতুর্দশী বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। কোন মতেই পারছে না শান্ত করতে প্রিয়াকে। পারছে না আদায় করতে অনুমতি। আশ্রয় নিল নিজ ঐশ্বর্যের কাছে। মায়াতে চাইল অভিভূত করতে। যেমন হরণ করেছিল শচীদেবীর স্নেহ। তেমনি চাইল হরণ করতে পত্নীর প্রেম। উন্মীলন করল প্রিয়ার জ্ঞান চক্ষু। বললে নিমাই 'মিথ্যে মায়ায় বদ্ধ হয়ে এসব কি বকছ পাগলের মত? সকলের পতি একাই শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ ভজনই জীবের একমাত্র পথ। তুমি তাই কর। তাতেই পাবে নিত্য ও বিশুদ্ধ আনন্দ।'

কথাগুলি শুনতে খুব ভাল লাগছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার। কারণ বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী এখন সে। নিভে আসছে হৃদয়ের জ্বালা। অনেকটা শান্তি পাচ্ছে প্রিয়া। সহসা দেখলে নয়ন সম্মুখে তার।

'আপনি ঈশ্বর হঞা দূর করে নিজ মায়া
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত।
দূরে গেল দুঃখ শোক আনন্দে ভরল বুক
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত॥' চৈ. ম.

গৌরসুন্দর ধারণ করল বিষ্ণুরূপ। অধীর হয়ে উঠল আনন্দে প্রিয়া। যেন নৃত্য করে উঠল মানস অন্তর। মুগ্ধ হল প্রিয়া চতুর্ভুজ মূর্তি দর্শন করে। ভক্তিতে গদগদ হয়ে গলে বস্ত্র দিয়ে প্রণাম করল বিষ্ণুপ্রিয়া। ক্ষণ পরেই বুঝতে পারল এ মনের ভ্রম। করযোড়ে বললে—'না, না, আমি চাই না এরূপ। আমার প্রয়োজন নাই তোমার ঐশ্বর্য মূর্তির। আমার ভাল লাগে না ওরূপ। একমাত্র স্বামীই আমার আরাধ্য দেবতা। কোথায় তিনি? তোমার পায়ে পড়ি। তুমি ফিরিয়ে দাও আমার স্বামী কে!'

ব্যাকুল বিষ্ণুপ্রিয়া। লুটিয়ে পড়ল বিষ্ণুর পদতলে। পারল না গৌরসুন্দরের বিলাস মূর্তি পরাজিত করতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে। ঐশ্বর্য প্রকাশ করেও পারল না নিমাই জয় করতে প্রিয়াকে। পরাজিত হলো প্রেমের কাছে ঐশ্বর্য। বিষ্ণুপ্রিয়ার পতিপ্রেমের অস্ত্রে পরাজিত হলেন স্বয়ং শ্রীভগবানও।

নিমাই বাধ্য হল তার ঐশী মায়া সংবরণ করতে। পরাভব স্বীকার করল নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। বললে প্রসন্ন কণ্ঠে—"প্রিয়া, তুমি ধন্য। ধন্য তোমার ভক্তি আর পতিপ্রেম। তোমার চির বসতি হোক আমার অন্তরে। লোকে জানবে আমি তোমায় ত্যাগ করলাম। কিন্তু তুমি রইবে আমার অন্তরে চির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আসনে। যখনি কাতর হবে আমার বিরহার্তিতে যখনি ডাকবে আমাকে, আমি আসব। জুড়াব তোমার বিরহ-বেদনা। প্রিয়ে জেন, বিরহ ব্যতীত সুখ নেই মিলনে। বিরহরূপ লবণই এনে দেয় মিলনের আস্বাদ।'

বিষ্ণুপ্রিয়া তাকিয়ে রইল মন্ত্রমুগ্ধার মত। যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছে সে। দুটি মায়ামাখা চোখ তার বড় করুণ, বড় বেদনা-দীর্ণ।

বেদনাহত প্রভুর হৃদয়ও। কান্নাভেজা কণ্ঠে বললে নিমাই—'প্রিয়া, তুমি না কাঁদলে জীব কাঁদবে না। আমি তোমাকে তাই ত চাই কাঁদাতে। আমার একার কান্নায় হল না। জীব কাঁদল না। তাই ত আমি চাইছি তোমার সাহায্য প্রিয়ে। জীবের মঙ্গলের জন্য, জীবের দুঃখ মোচনের জন্য, তুমি কি পারবে না এটুকু সাহায্য করতে? তুমি না আমার সহধর্মিণী?

প্রিয়ার অন্তর বীণার সমস্ত তারগুলো হয়ে উঠল ঝংকৃত। এক সঙ্গে, একই লয়ে। অশ্রু জলে ভেজা আঁখি দুটি দিয়ে একবার দেখল বিষ্ণুপ্রিয়া

প্রভুকে। তারপর বললে—'তুমি বলছ, জীবের মঙ্গল হবে। সন্ন্যাস নিলে তোমার মঙ্গল হবে। ধুয়ে যাবে জীবের সমস্ত পাপ-তাপ? আমি কাঁদলে জীব কাঁদবে?'

'হ্যাঁ প্রিয়া। সত্যি জীব মুক্তি পাবে।' আড়ষ্ট কণ্ঠে বললে প্রভু।

একটা নিরন্ধ্র অন্ধকার। নিথর নিস্পন্দন বিষ্ণুপ্রিয়া। পাষাণ প্রতিমার মত ক্ষণকাল রইলে নিশ্চল। বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু। তারপর ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে শোনা গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার কন্ঠ—'হে প্রভু, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তুমি ইচ্ছাময়। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তোমার সুখেই আমার সুখ। তারপর ক্ষণকাল থেমে বললে—আমি ত তোমার দাসী। কৃপা করে এটুকু অধিকার দিও, চিত্ত যেন বিচলিত না হয় ওপদ থেকে।'......

আমি এ জীবনে এসেছিলাম শুধু কাদতে। আমি জানি এ জীবনে আমার কাটবে উপেক্ষায় আর অনাদরে। শুধু এই নিবেদন প্রভু—

'জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি।'
বধু, কি আর বলিব আমি।'

॥ সাতাশ ॥

শচীদেবী বলেছিলেন—'নিমাই, তুই আরো কয়েক দিন ঘরে থাক।' তা নিমাই তাতে সম্মতি দিয়েছে। সংসারী মানুষের মত ঘরেই আছে নিমাই। দিব্যি ঘরকন্না করছে। এখন অনেকটা স্বাভাবিক প্রভু। কৃষ্ণ প্রেমের আচ্ছন্নতা যেন নেই ততখানি।

বাড়ীতে আছে দু'জন সেবক। ঈশান আর গোবিন্দ। প্রভুর তত্ত্বাবধান করেন পণ্ডিত দামোদর। আছেন প্রভুর বাড়ীতে। পরম পণ্ডিত আর ভক্ত মানুষ। গৌরগত প্রাণ তাঁর। নিমাই ছাড়া আর কিছু জানেন না। মানেন নাও কাউকে। তিন ভাই তার উদাসীন। নিজেও তাই।

সুখ দুঃখের দোলায় যেন দুলছেন শচীদেবী আর বিষ্ণুপ্রিয়া। কখনো আনন্দ আর তৃপ্তিতে ভরপুর। আবার কখনো বিষাদ, বেদনা আর ক্রন্দন। কান্না আর বড একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না শাশুড়ী বৌয়ের হৃদয়কে। ও অধ্যায় সমাপ্ত। নিমাই তা একরকম চুকিয়ে দিয়েছে। আদেশ, মতামত সব কিছু পেয়ে প্রভু এখন অনেকটা শান্ত। আছে আনন্দ পরিহাসের মধ্যে। শচীদেবী আর বিষ্ণুপ্রিয়ার ও আনন্দের সীমা নাই। বাড়ীতে লেগেই আছে উৎসব। নিমাইয়ের গৃহ, সে ত গৃহ নয়, যেন গৌর মন্দির। লোকজনে পরিপূর্ণ গৃহ তার। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর সান্নিধ্য পেয়ে যেন হয়ে উঠেছে সঞ্জীবিত। সব সময় থাকে নিমাইয়ের কাছে কাছেই।

এমনি করে কোথা দিয়ে কেটে গেল দেড়টা মাস। সমাগত উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। মাঘ মাস। কথায় বলে মার্গশীর্ষ। লোকে বলে ভারী ভাল দিন। ভোর হল। শয্যাত্যাগ করল নিমাই। প্রাতঃকৃত্য করল সমাধান। মাকে ডেকে বললে—'মাগো, আজ বড় ভাল দিন। ভোজ লাগাও। খাইয়ে দাও বৈষ্ণবদের।'

চলল বৈষ্ণব ভোজনের আয়োজন। পণ্ডিত দামোদর তাড়াতাড়ি সব যোগাড়যন্ত্র করলেন। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন শচীদেবী আর বিষ্ণুপ্রিয়া। সব কিছু পরিচালনা করছেন দু'জনে। যোগান দিচ্ছে ঈশান আর গোবিন্দ। প্রভুর যেন আজ আনন্দের সীমা নাই। নিমাই যেন ভাসছে ভাবের সাগরে। দলে দলে আসছে ভক্তরা। ভক্তিভরে নিচ্ছে চরণ ধূলি। সকল ভক্তের হাতেই

ফুলের মালা। প্রভু ফুল বড় ভালবাসেন। ভক্তরা নিয়ে আসছে আরো নানান দ্রব্য-সামগ্রী। যার যেমন আছে। যার ঘরে যা উৎপন্ন হয়েছে। ভক্তরা প্রণাম করলেই প্রভু বলছেন—'তোমরা কৃষ্ণের ভজনা করো। তাতেই ঘুচবে দুঃখ দারিদ্র্য। রোগ শোকে পাবে সান্ত্বনা সন্তোষ পাবে মনে।'

প্রভুকে দেখে মুগ্ধ সকলে। কি অপূর্ব তনুশ্রী। যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে অঙ্গের দিব্য জ্যোতি। যেন প্রাণমন ভরে উঠছে সকলের। চলছে সেই সকাল থেকে অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন। ভক্তরা গিয়ে বসছে কীর্তন-অঙ্গনে।

ভাবমত্ত কীর্তনের আবেশে ভক্তবৃন্দ। বড় আনন্দের দিন আজ। প্রাণ-ভরে দেখছে সকলে তার প্রভুকে সেজেছেন গৌরসুন্দর অপূর্ব সাজে। গলায় ফুলের মালা। পরিধানে দিব্য বস্ত্র। ভক্তগণ পরিবৃত হয়ে নগর কীর্তনে বেরোবেন প্রভু। তাই মনের মত করে গদাধর সাজাচ্ছে তার মনের মানুষটিকে। গলায় পরিয়েছে মালা। ললাটে চন্দনের বিন্দু। গদাধর যতই সাজায় মন যেন তার ভরে না যতই অর্চনা করে গৌরাঙ্গকে। যেন তৃপ্তি পায় না সে। যেন সাজান শেষ হচ্ছে না তার কিছুতেই। ভাব গতিক দেখে প্রভু বললেন—'গদাধর, এদিকে বেলা যে যায়।'

হ্যাঁ, সত্যি বেলা বয়ে যায় সময় তো এল ঘনিয়ে। আজ একবার শেষবারের মত নিমাই দেখে নেবে তার সাধের নবদ্বীপকে। তাই ত গদাধরকে এত তাড়া। এত ব্যস্ততা।

অন্যে কেউ কিছু জানে না। কেউ কিছু বোঝে না। আনন্দ লহরিতে ভেসে চলেছে সকলে।

'নিরবধি পরানন্দ সঙ্কীর্তন রঙ্গে।
হরিষে থাকেন সর্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে॥
পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ
পাসরি রহিলা সবে প্রভুর গমন॥'

নবদ্বীপের পথে পথে ভক্তসঙ্গে প্রভুর এই কীর্তন আকাশ বাতাস করে তুলল মুখরিত। দেখা করল নিমাই অনুরাগীদের সঙ্গে। গেল প্রতিজনের দ্বারে দ্বারে। সন্ধ্যায় এল জাহ্নবীর তীরে। এই সেই জাহ্নবী। যার সঙ্গে তার আবাল্যের সম্পর্ক। যার পুণ্য সলিলে কত রঙ্গ-কৌতুক করেছে সে। কত সাঁতার কেটেছে। প্রিয় সাথীদের নিয়ে করেছে জলক্রীড়া। থমকে দাঁড়াল নিমাই। শুনল কান পেতে। নদীর কলতানে শুনতে পেল বিরহের গীতি। কলছল, কলছল শব্দে সে যেন গাইছে, কেঁদে কেঁদে গাইছে মর্মচ্ছেদী বিরহ-সঙ্গীত। মনে মনে প্রণাম জানাল নিমাই। অবাধ্য হয়ে দু'ফোঁটা গড়িয়ে

পড়ল চোখের জল। এখানের প্রতিটি বৃক্ষ, তরুলতা যেন বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর ম্রিয়মাণ।

ঘন হয়ে এল সন্ধ্যার আঁধার। এক প্রহর রাত্রি হলো অতিক্রান্ত। নিমাই ফিরে এল ঘরে। আজকে মকর সংক্রান্তির মহাপুণ্য লগ্ন। দলে দলে আসতে লাগল সবাই। কিসের একটা অদৃশ্য টানে তারা যেন ছুটে এল। গৌর-বিচ্ছেদ সন্ধ্যা ভক্ত হৃদয়ে কি কোন ছায়া ফেলে ছিল? না গৌরাঙ্গই কি টেনে আনছিল সকলকে। আজই ত শেষ দর্শন। শেষ কথা। বুঝি শেষ বাণীটি শোনাতে চায় নিমাই তার ভক্তদের।

উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীদের সম্বোধন করে বললে নিমাই—'প্রিয় পার্ষদবৃন্দ, যদি তোমরা আমাকে একটুও ভালবেসে থাক, তাহলে তোমাদের কাছে আমার প্রার্থনা। তোমরা কৃষ্ণভজন কেউ যেন ভুলো না।'

বলতে বলতে নিমাইয়ের কণ্ঠ কেমন যেন হয়ে এল অবরুদ্ধ। চোখটা কেমন যেন জ্বালা করে উঠল তার। নিজেকে গোপন করল নিমাই। আজকে তার ত কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা চলবে না। তাই কোন কিছু বুঝতে পারল না কেউ।

এখন সময় ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল শ্রীধর। সেই খোলা বেচা শ্রীধর। বেচারী বড় দরিদ্র। এসে প্রণাম করল শ্রীধর নিমাইকে। পরম ভক্তিভরে। 'প্রভু, আমার ত দেওয়ার মত কিছুই নেই। নতুন গাছে এই কচি লাউটিই হয়েছিল। তাই এনেছি। যদি দয়া করে গ্রহণ করো…' বলতে বলতে চোখ দুটি তার হয়ে উঠল অশ্রুসিক্ত।

'কে রে, শ্রীধর? এসেছিস্ তুই? বাঃ, তোর কচি লাউটি ত ভারী সুন্দর রে। আয়, আয়, আমার বুকে আয়।' আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল শ্রীধরকে নিমাই।

শ্রীধরের ঐকান্তিকতার অশ্রুসিক্ত উপচার প্রভু গ্রহণ করল সানন্দে। এ উপহার না গ্রহণ করে কি থাকতে পারে নিমাই। শ্রীধরের সঙ্গে কত কোন্দলই না করেছে নিমাই। সামান্য খোলা মুচি বেচেই চালায় সে সংসার। অতি কষ্টে শিষ্টে। সে ত সব জানে নিমাই। সে সব কোন্দল চুকে বুকে গেছে কতদিন আগেই।

মাকে ডেকে বললে—'মা গো, শ্রীধর কাচ লাউ এনেছে। পায়েস রান্না করো। ভক্তরা সকলেই প্রসাদ পাবে।'

'হ্যাঁ রে শ্রীধর, তুই কিন্তু যাস্ না। ভাল হয়ে বোস। প্রসাদ পেয়েই বাড়ী যাস। ভারী খুশি শ্রীধর। প্রভু তার সামান্য উপচার গ্রহণ করেছেন।

সার্থক হয়েছে তার মনের বাসনা হ্যাঁ, শ্রীধর ভাল করেই জানত, প্রভু ভারী ভালবাসে লাউয়ের পায়েস খেতে।

নিমাই ভাবলে, শ্রীধরকে দুঃখ দিয়ে কি আর হবে। ভালবাসার দান প্রত্যাখান করা ঠিক হবে না। তা ছাড়া গার্হস্থ্য জীবনে এই ত তার শেষ খাওয়া।

খেতে বসে বেশ তৃপ্তি সহকারে খেলে নিমাই। কত গল্পই না করলে। শচীদেবীর কাছে নিমাই যেন এখনো সেই ছোট্টটি। তাই বললেন—'কইরে নিমু, তুই ভাল করে খাচ্ছিস না কেন? সব যে পড়ে রইল রে।'

'অমন করলে আমি আর খাব না বলছি। এই ত তোমার সব খেয়েনিয়েছি। তুমি কি এখনো আমাকে ছোট্টটি ভাব? তাহলে আমি কিন্তু রাগ করব বলছি, হ্যাঁ।' যেন সত্যি সত্যি ছোট ছেলে। আড়ি করে বসলে নিমাই।

'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। আমি ঘাট স্বীকার করছি। অমন গোসা করে বসে থাকিস্ নে। বড়ি দিয়ে ঐ যে শাকের ব্যঞ্জনটা বেঁধেছে বৌমা, এটুকু খেয়ে নে।'

'আচ্ছা খাচ্ছি। আর কিন্তু কিছু বলবে না বলে দিচ্ছি।' নিমাই উত্তর দিলে ঠিক ছোট্ট ছেলেটির মত। তারপর এক গ্রাসে সবটুকু শাকের ব্যঞ্জন খেয়ে ফেললো নিমাই।

'এবার আর একটু পায়েস দি? শেষে মিষ্টি খেতে হয় না।' আদর করে বললেন শচীদেবী। এবার নিমাই কিন্তু আপত্তি করল না। বললে—'তুমি ভারী দুষ্টু আছ মা, জান আমি পায়েস খেতে ভালবাসি। ও যদি তোমার বেশি ছিল, আগেই দিলে পারতে। তা না, তোমার বৌমার রান্নাটা খাওয়াবেই। তা কিন্তু জান মা শাকটাও কিন্ত রান্না খুব ভাল হয়েছে।'

হাসতে হাসতে শচীদেবী বললেন—'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। তুই ত ভাল-মন্দ খুব বুঝিস্। এখন পায়েসটা খেয়ে নে।'

শচীদেবীর বাৎসল্য রসের এই সাধ্যসাধন রূপ বড় মধুর। বড় অপরূপ। আর ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ, স্নিগ্ধ। তারা অপার আনন্দে হয়ে উঠল উৎফুল্ল।

চুকে-বুকে গেছে খাওয়া-দাওয়া। ভক্তরা প্রসাদ পেয়ে ফিরে গেছে যে যার বাড়ী। সব সেরে স্নানে গিয়েছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। ছুটে এল পাগলিনীর মত। কাঁদতে কাঁদতে—

'পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র চুলে।
ত্বরা করি গৃহে আসি শাশুড়ীরে বলে॥

বলিতে পারে না কথা কাঁদিয়া ফাঁপর।
শচী বলে মাগো এত কি লাগি কাতর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননী।
চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণী॥
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর।
ভাঙ্গিবে কপাল মাথে পড়িবে বজর॥
থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে নাচে বাম আঁখি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি॥
কাঁদি কহে বাসুদেব কি কহিব সতী।
আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি॥ —বাসুদেব ঘোষ।

হু-হু করে উঠল শচীদেবীর প্রাণটা। সত্যি ত অমঙ্গলের লক্ষণ। কি বলে সান্ত্বনা দেবে সে বৌমাকে। কিছুক্ষণ তাঁর মুখেও কোন কথা ফুটল না। শেষে বললেন—'বৌমা, কেঁদে আর কি করবে। যা হওয়ার তাই ত হবে। নিমাই বলেছে কিছুদিন এখনো থাকবে গৃহে। যে কদিন থাকে সে কদিনই আমাদের সুখ। সে কদিনই আমাদের সৌভাগ্য।

তখনো বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁপছে থরথর করে। কাঁদছে না। কান্না তার শুকিয়ে গেছে। কত আর কাঁদবে সে। সত্যি ত, ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে।

ক্রমে বেড়ে চলে রাত। প্রতিদিনের মত শোয়ার আগে নিমাই এল মায়ের কাছে। প্রণাম করল ভক্তিভরে। হাতখানা কি কেঁপে উঠল তার। হয়ত নিবেদন করল অন্তরের অরুন্তুদ আর্তি। ক্ষমা করো মা তোমার অধম সন্তানকে। তোমার পদধূলিই আমার যাত্রা পথের একমাত্র পাথেয়।

এলো শয়ন কক্ষে নিমাই। শয্যা গ্রহণ করল না। যেন অপেক্ষা করে বসে রইল। কার প্রতীক্ষায় ?

এলো বিষ্ণুপ্রিয়া। সুগন্ধী পান সেজে এনেছে সে। এনেছে চন্দন আর কুঙ্কুম। আদর করে পানটি পুরে দিল প্রভুর মুখে। তৃপ্তিতে আর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল প্রিয়ার অন্তর। তারপর মধুর হেসে কাছে বসে বললে—

'যদি অনুমতি দাও, আজ তোমাকে সাজাই মনের মত করে।'

'তোমার জিনিসকে তুমি সাজাবে, আমি কেন বাধা দেব বলো ?' অনুরাগ ভরে বললে নিমাই। তারপর বললে—

'কিন্তু তার আগে আমাকেও একটি কথা দিতে হবে।'

'বল নাগো, কি কথা ?'

—'আমিও সাজাব তোমাকে। বল অমত করবে না ?'

—'পুরুষ মানুষ কি আবার সাজাতে জানে ?' হেসে বললে বিষ্ণুপ্রিয়া।

—'পরীক্ষা করে দেখো।'

—'আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে।'

'দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা অঙ্গে।
শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানারঙ্গে॥' —চৈ. ম.

বিষ্ণুপ্রিয়া বসল তার মনের মানুষটিকে মনের মত করে সাজাতে। মালতীর মালা পরিয়ে দিল কণ্ঠে। অনুলিপ্ত করল চন্দনে গোরার শ্রীঅঙ্গ। শোভাময় করে তুললো সুগন্ধি তিলকে সুপ্রশস্ত ললাট। প্রেমময়ের পরশে প্রেমময়ী মগ্না। হয়ে উঠল আনন্দ চঞ্চলা। নিভৃতে নীরবে যেন চলছে প্রাণে প্রাণে আলাপন। প্রতিটি অঙ্গের জন্য প্রতিটি অঙ্গ যেন হয়ে উঠছে আকুল। দু'জনকে দেখে দু'জনই বিমুগ্ধ। আদর করে প্রিয়াকে প্রভু টেনে নিল কোলে। সোহাগে, চুম্বনে ভরে তুলল প্রিয়ার অন্তর।

এবার প্রভুর পালা। 'বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে যেন লাখবাণা সোনা। ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা॥' এমন যার রূপ, নিমাই তাকে সাজাবে কেমন করে।

জড়িত লজ্জায় অধোমুখী বিষ্ণুপ্রিয়া। নিমাই প্রস্ফুটিত পদ্মের মত প্রিয়ার করপল্লব তুলে নিল নিজের হাতে। সোহাগ ভরে করল মৃদু চুম্বন। তারপর বসল সাজাতে।

দীর্ঘ কালো কেশে রচনা করল কবরী। কণ্ঠে পরিয়ে দিল মতির মালা। এঁকে দিল ললাটে সিন্দুর বিন্দু। রক্ত রাঙ্গা সেই সিন্দুর বিন্দুর চারিদিকে দিল চন্দনের ফোটা। আর খঞ্জন আঁখিতে টেনে দিল অঞ্জনের রেখা। শেষে অগোর কস্তুরী গন্ধ মাখিয়ে দিল পীনোদ্ধত কুচ যুগলে সযত্নে। কি অপরূপ সে শোভা। দিব্য বস্ত্র দিয়ে বেঁধে দিল কাঁচুলি। প্রতি অঙ্গে দিল পরিয়ে নানা বরণের অলংকার। যেন বিষ্ণুপ্রিয়া ধারণ করল ত্রৈলোক্য-মোহিনী রূপ।

'তবে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি।
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করয়ে আপনি॥
দীর্ঘকেশ কামের চামর জিনি আভা।
কবরী বান্ধিয়া দিল মালতীর গাভা॥

মেঘ বন্ধ হৈল যেন চাঁদের কলাতে।
কিবা উগারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে ॥
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে করি আছে যেন ইন্দু ॥
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দন বিন্দু আর।
শশিকোলে সূর্য তারা ধায় দেখিবার ॥
খঞ্জন নয়ানে দিল অঞ্জনের রেখ।
ভুরু কাম কামানের গুণ করিলেক ॥
অগোর কস্তুরী গন্ধ কুচোপরি লেপে।
দিব্যবস্ত্রে রচিল কাঁচুলী পরতেকে ॥
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিল তাহার।
তাম্বুল হাসিব সঙ্গে বিহরে অপার ॥' —চৈ. ম.

বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপে বিমুগ্ধ নিমাই। তাকাতে লাগল বারে বারে। প্রিয়া যেন আজ গর্বিতা। সলজ্জ তার মুখমন্ডল। ছুটে গিয়ে লুকাল সে গৃহ কোণে। নিমাই খুঁজছে প্রিয়াকে। গভীর রাত পর্যন্ত চলছে লুকোচুরি খেলা। অবশেষে ধরা পড়ল বিষ্ণুপ্রিয়া। নিজেই ধরা দিল সে। গৌরবক্ষ বিলাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়া। গৌর যে সাজিয়েছে তাকে মনের মত করে। ধারণ করবে না সে বক্ষে প্রিয়াকে।

'নবীনা প্রিয়াজী সবে যৌবন উদয়।
লজ্জায় মুগধা ধনী অধোমুখে রয় ॥
চঞ্চল চরণে গৃহ কোণেতে লুকায়।
শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহ মাঝে খুঁজিয়া বেড়ায় ॥
পদ্ম গন্ধ বহে মরি সুরস অধর।
দিবানিশি মত্ত তাহে গৌরাঙ্গ ভ্রমর ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ণশশী গৌরাঙ্গ চকোর।
যার রূপ সুধা প্রিয়ে প্রমত্ত শ্রীগৌর ॥
গৌর প্রেমে গরবিনী ধনী বিষ্ণুপ্রিয়া।
গৌর বক্ষ বিলাসিনী দেহ পদছায়া ॥'

কোলে করে মিষ্টি হেসে বললে নিমাই—'দেখো, কেমন সাজিয়েছি তোমায় আমার মনের মত করে।'

নত মুখে হেসে বললে বিষ্ণুপ্রিয়া—'তোমার এ গুণটি আছে জানলে,

তোমাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারতাম। এখন থেকে তুমিই বেঁধে দিও আমার কবরী। আর কষ্ট দেব না কাঞ্চনাকে।'

'এ কথা কাঞ্চনাকে বলতে তোমার লজ্জা করবে না?'

'কেন, কিসের লজ্জা। ও ত আমার সই। ওকে আমি আমার মনের সব কথাই বলি।'

'সত্যি?'

যেন একটু লজ্জা পেল নিমাই। কিন্তু তা ক্ষণকাল। প্রিয়ার রূপে আজ আকৃষ্ট নিমাই। চতুর্দশী নবীনা যুবতীর আকর্ষণ বড় দুঃসহ। তাই বড় চঞ্চল হয়ে পড়ল গৌরসুন্দর। গৌরাঙ্গ ভ্রমর যেন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্ফুট দেহ কোরকের গন্ধে হয়ে উঠেছে উম্মত্ত।

'ত্রৈলোক্য মোহিনী রূপ নিরখে বদন।
অধর মাধুরী সাথে করয়ে চুম্বন॥
ক্ষণে ভুজলতা বেড়ি আলিঙ্গন করে।
নব কমলিনী যেন করিবর কোরে॥'—চৈ. ম

গৌরাঙ্গ আর বিষ্ণুপ্রিয়া, দুজনেই প্রেমোন্মত্ত। এই শেষ লীলা তার। তাই বুঝি রেখে যাচ্ছে স্মৃতির আলিম্পন। অন্ততঃ স্মৃতিটুকু থাক। নইলে কি নিয়ে বাঁচবে বিষ্ণুপ্রিয়া। উপেক্ষিত জীবনের এই বুঝি শেষ সঞ্চয়। এইটুকুই শেষ পাথেয়।

যেন আকণ্ঠ নিমজ্জিত দুজনে। নিমাই আজ প্রাণ উজাড় করে পান করছে বিষ্ণুপ্রিয়ার অধরসুধা। ক্ষণে ক্ষণে জড়িয়ে ধরছে প্রিয়াকে। তুলে নিচ্ছে আপন বক্ষে। আজকে বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরবক্ষ বিলাসিনী। রসিক নাগর তার, তাকে তুলছে রসিয়ে। অথৈ প্রিয়ার প্রেমের সরোবর। আজ যেন হয়ে উঠছে উত্তাল। প্রমত্তা প্রিয়া। নিমাই তাকে টেনে নিল তার আবক্ষ আলিঙ্গনের মধ্যে।

'সুমেরুর কোলে যেন বিজুরী প্রকাশ।
মদন মুগধে দেখে রতির বিলাস॥
হৃদয় উপরে থোয় না ছুঁয়ায় শয্যা।
পাশ পালটিতে নারে দোঁহে এক সজ্জা॥'—চৈ. ম

আনন্দে প্রিয়ার তনু হয়ে এল অবশ। জড়িয়ে ধরেছে প্রভু তাকে কনকলতার মত। স্বর্গ সে চায় না। মর্তের প্রেম, মর্তের ভালবাসা আজ হোক অক্ষয়। হোক চির ভাস্বর।

যেন আজকে আবেগোচ্ছল প্রিয়া। প্রভুকে আলিঙ্গনে পিষ্ট করে

বললে—'এ আমি কোথায় গো ? একি সুখের সূচনা না দুঃখের সূন্দর ? এ কি অমৃত না গরল ? আমি জ্ঞানে আছি না অজ্ঞানে ? একি স্বপ্ন না সত্য ? আমি বুঝতে পারছি না কিছুই। তুমি আমায় আরো দৃঢ় করে ধর।'

প্রিয়ার কোমল বক্ষ প্রভু তার প্রশান্ত বক্ষে আলিঙ্গনে বাঁধল দৃঢ় করে। রাখল অধরে অধর। আর—

'হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ানে।
নাসিকায় নাসিকায় নয়ানে নয়ানে॥'

যেন দু'টি দেহ ফুটে উঠল একটি বৃন্তে একটি ফুলের মত। এত সুখ, এত আনন্দ প্রিয়ার জীবনে এই ত প্রথম। রসের সংবাদ রাখে রসিক জন। এ বিলাস লীলা বিষ্ণুপ্রিয়ার স্মৃতিতে হয়ে থাক সমুজ্জ্বল। গৌরবিলাসিনী প্রভুর এইরূপ আস্বাদনের জন্যই ধারণ করেছেন অন্য দেহ। স্বরূপত দুই-ই ত এক। কেবল রস আস্বাদনের জন্য দুই রূপ। ভিন্ন তনু বিগ্রহ।

প্রভুর প্রশান্ত বক্ষে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল বিষ্ণুপ্রিয়া। দু'টি দেহ হয়ে গেল এক। তারপর ?

'বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসাদে দোহে সুখে নিদ্রা যায়॥'

শীতের রাত। নিথর নিস্তব্ধ। অঘোর ঘুমে অচেতন বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু নিমাই। ঘুম নাই চোখে। পাশের ঘরে শচীদেবী। হয়ত তিনিও নিদ্রিতা।

বাঁশরীর নিস্বন। যেন শুনতে পেল নিমাই। নিস্তব্ধ রাত্রিতে সে ধ্বনি বড় স্পষ্ট। ডাকছে নিমাইকে। সীমা থেকে অসীমের পানে। কান্না থেকে কীর্তনে। সুখ থেকে সুখাতীতে।

ওই ত শোনা যাচ্ছে তাঁর নূপুরের নিক্কন। বেজে উঠছে অপূর্ব নাদ-সঙ্গীত। প্রাণ-মাতান আকুল স্বরে। মন হয়ে উঠে উদভ্রান্ত। যেতে চায় ছায়া অনুসরণ করে কায়াকে ধরতে। তাই ত নিমাইয়ের হৃদি-বৃন্দাবনে বেজে উঠেছে ব্রজের বাঁশরী।

ত্রস্ততার সঙ্গে উঠে পড়ল নিমাই। তাকিয়ে দেখল বিষ্ণুপ্রিয়ার নিদ্রিত মুখের দিকে। ঘুমিয়ে আছে বড় সুখদ নিদ্রায়। আর নয়। অতিক্রান্ত রাত্রির তৃতীয় যাম। এই ত বিশ্ব-অঙ্গনে বেরিয়ে পড়ার প্রশস্ত সময়।

রাত্রির শীতল বাতাস যেন ঢেলে দিচ্ছে নিমাইয়ের কানে সুধা-সঙ্গীত।

বারে বারে তাকাচ্ছে নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে। আস্তে আস্তে তুলে আনল পাশ বালিশটা। রাখল প্রিয়ার কোলের মধ্যে সযত্নে। এতক্ষণ ওর আতপ্ত বক্ষের মাঝে শুয়েছিল নিমাই।

বিষ্ণুপ্রিয়ার একখানা পা ছিল নিমাইয়ের পায়ের উপরে। অতি সন্তর্পণে সযত্নে নামিয়ে দিল প্রভু। শিয়রের বালিশটা দিয়ে গুঁজে দিল সেখানে। না, বিষ্ণুপ্রিয়া জানতে পারল না একটুও! অচেতন গাঢ় ঘুমে। আবার একবার তাকিয়ে দেখল প্রিয়ার মুখটা। যেন দেখছে তার প্রাণ প্রতিমাকে প্রাণভরে। সৌন্দর্য নিঙড়ানো কি অপূর্ব মুখচ্ছবি। যেন মানসপটে এঁকে নিচ্ছে নিমাই। বৈভবোজ্জ্বল সমুদ্ধ চন্দ্রানন। পারল না লোভ সম্বরণ করতে। ছোট্ট করে রক্তিমাভ অধরে চুম্বন করল প্রভু।

আস্তে আস্তে নেমে পড়ল খাট থেকে। সুখ শয্যার নীচে। আস্তে আস্তে খুলল দরজার খিল। মায়ের ঘরের দরজায় প্রণাম করল নিমাই। তারপব বেরিয়ে এল গৃহ-প্রাঙ্গণে। চন্দ্রের বিষাদাচ্ছন্ন ম্লান হাসি। আর একবার মনে পড়ল বিষ্ণুপ্রিয়ার চন্দ্রানন। মনে মনে বললো—'বিষ্ণুপ্রিয়া গো, আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে অসহায় মনে করে তুমি ক্ষমা করো।'

নির্বাপিত হলো চিরতরে প্রিয়ার ঘর থেকে গৌর-দীপ শিখাটি। এ দীপ আর জ্বলবে না কোন দিন। ব্যর্থ বাসর। ব্যথিত চন্দ্র তারা। দীপ নিভে গেল। প্রিয়া আঁধারে হলো যে হারা।

> 'নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীরামচরণে।
> পার্শ্বে উপাধানোপরি করিয়া রক্ষণে॥
> বক্ষস্থলে নিজগণ্ড উপাধান দিয়া।
> বাহির হইল গোরা দ্বার উদঘাটিয়া॥' —চৈ. ম.

দক্ষিণ নাসিকায় বইছে শ্বাস। খুলে ফেলল উত্তরীয়, মুক্তার মালা, শেষে পরিধানের কাপড়টিও। তারপর সাধারণ একটি বস্ত্র পরে সামনে বাড়িয়ে দিল নিমাই দক্ষিণ পদ। আবরণ হীন দেহ! কোছার অঞ্চল ঘুরিয়ে বেষ্টিত করল গলদেশ। স্পন্দিত বক্ষ। মনে মনে প্রণাম জানাল স্বর্গীয় পিতৃদেবকে। চোখ থেকে বেরিয়ে এল দুফোঁটা চোখের জল।

মনে পড়ল দাদা বিশ্বরূপের কথা। মনের নেপথ্যে সঞ্চারিত হল ছায়ার মত। মনে পড়ল বহু স্মৃতি বিজড়িত নবদ্বীপকে। এর প্রতিটি ধূলিকণা পূত-পবিত্র। প্রতিটি বৃক্ষ তরুলতা কৈশোরের কুঞ্জবন আর যৌবনের কীর্তন-গাথায় কলমুখরিত। পাখির কলগুঞ্জন, প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীর এতদিন

জুড়িয়েছে তার প্রাণ মন। এ যে বড় প্রিয়, বড় মধুর। বিদায় নবদ্বীপ, চির বিদায়।

আর নেই কোন বাধা বন্ধন। সব কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। মুছে গেছে সব স্মৃতি। বৃদ্ধা মায়ের অশ্রুধারা, প্রিয়ার ক্রন্দন, কোন কিছু বেঁধে রাখতে পারল না তাকে। পিছনের সব বাধা-বন্ধন আজ আর তাকে পারল না আটকাতে। অশান্ত, অধীর, উদ্‌ভ্রান্ত নিমাই ত্রস্ত পদে ছুটে চলেছে গঙ্গার তীরে। তুণ্ডে কৃষ্ণনাম, জপে চলেছে অবিরাম।

গঙ্গার তীরে এসে দাঁড়াল নিমাই। শীত-শান্ত গঙ্গার কতকগুলো ক্ষ্যাপা ঢেউ আছড়ে পড়ছে গঙ্গার তটে। ঘাটে নেই কোন তরণী। নাই পারাবারের কোন পথ। জনমানব শূন্য দু'কূল। খানিক কি যেন ভাবল মনে মনে। তারপর ?

'দুই কর জুড়ি নমস্কার করি
পবশ করিল নীরে॥'

সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ল নিমাই। শীতের শীতল ভাগীরথীর বুকে। যেন একটা জ্যোর্তিমণ্ডল গঙ্গাব বুকে চললো সাঁতাব কেটে। নিশীথ রাত্রির নিথর আঁধারকে চিরে চিরে। শুধু থেকে থেকে শব্দ উঠছে—'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ !! হা কৃষ্ণ !!!'

তারপর ভাগীরথীর ওপারে গিয়ে দাঁড়াল নিমাই। দুই হাত যোড় করে মিনতি ভরা কণ্ঠে বললে নিমাই—

'প্রিয় নবদ্বীপ! প্রিয় ভাগীরথী!
ছাড়ি যাই তোমা, দাও অনুমতি,
হরি সংকীর্তনে, তোমা দুইজনে
জুড়ায়েছি আমি যেমন শক্তি!' —শিবনাথ শাস্ত্রী।

পড়ে রইল নিমাইয়ের স্বাদের নবদ্বীপ। বয়ে চললো ভাগীরথী তার আপন বেগে। যে ঘাট দিয়ে সেদিন নিমাই, মাঘের প্রচণ্ড শীতকে অগ্রাহ্য করে পার হয়েছিল।

'নিরদয় ঘাট বলি হৈল পরিচিত।
আজো স্মৃতি বুকে নিয়ে রয়েছে জীবিত॥'

১৪৩১ শকাব্দের মাঘী সংক্রান্তি। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ বা ১৪ ফেব্রুয়ারির স্মৃতি ভক্ত হৃদয়ে রইল অঙ্কিত। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের অমর লেখনীতে লেখা হলো স্বর্ণাক্ষরে—

'চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥'

ঘুমের আলসো পাশ ফিরল বিষ্ণুপ্রিয়া। হাত বাড়াল নিমাইকে আলিঙ্গন করার জন্য। রজনীর শেষ বিলাস সম্ভোগের আশায়।

কিন্তু কই, কত দূরে প্রভু। নাগাল ত মিলছে না। একটু সরে গিয়ে আবার মেলে দিল হাত। কিন্তু কই, শয্যা যে শূন্য!

কেটে গেল ঘুমের আমেজ। চমকে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়া। 'ওগো, তুমি কোথায়?'

নেই কোন প্রত্যুত্তর।

বাইরে পাতায় পাতায় শিশির পড়ছে। শব্দ হচ্ছে টুপ্ টুপ্। অন্ধকারটা একটু যেন ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। কিন্তু কোন কিছু দেখা যাচ্ছে না ত তাহলে কি!

'ওগো, তুমি কি বাইরে গেলে?'

না, এবারও ত কোন সাড়া নাই।

বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁত্ করে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়ার। খাট থেকে নেমে পড়ল অন্ধকারের মধ্যে। এগিয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়া দরজার দিকে। ওদিকে অন্ধকারটা যেন একটু ফিকে বলে মনে হচ্ছে। এ কি, দরজাটা ত খোলা। এত ভোরে উনি ত কোথাও যান না। কেমন যেন বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠল ওর।

আঁধার-ত্রস্ততার মধ্যে এগিয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়া। শচীদেবীর শোয়ার ঘরের দরজার কাছে।

'মা, ও মা?'

'কে, বৌমা?' শয্যা থেকে উঠতে উঠতে সাড়া দিলেন শচীদেবী। তারপর দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

'কি গো বৌমা, ডাকছিলে কেন?'

রুদ্ধ কান্নায় ভেঙ্গে পড়া করুণ কণ্ঠে বললে বিষ্ণুপ্রিয়া—'তোমার ছেলে কোথায় মা?'

'সে কি?'

চমকে উঠলেন শচীদেবী। আশঙ্কা ঘোরে তাকালেন বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিগ্গেস করলেন—'কেন, নিমাই ঘরে নেই?'

কোন উত্তর নাই বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে। মাথা নেড়ে জানাল 'না।'

তাড়াতাড়ি, অন্ধকারে হাতড়ে জ্বাললেন প্রদীপটি। এখানে ওখানে বৌমার হাত ধরে খুঁজলেন সারা বাড়ীটা। না, কই কোথাও নাই ত। সহসা দেখতে পেলেন নিমাইয়ের পরিত্যক্ত বসন। গায়ের চাদর।

প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে চক্ চক্ করে উঠছে, ওটা কি ? বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর গায়ের চাদর তুলে ফেলেই বললে—'মা, এইত গলার মালা ?'

'হায়, সর্বনাশ হয়ে গেছে বৌমা। নিমাই বুঝি ঘরে নাই।'

শচীমাতা কেঁদে উঠলেন হাউ হাউ করে। বিষ্ণুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে পাগলিনীর প্রায়। তখনো ভোর হয়নি। পথেও বেরোয়নি কেউ। দু'জনে প্রদীপ হাতে নামলেন পথে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কি করবেন, কোথায় যাবেন তিনি। কিছুই যে ঠিক করতে পারছেন না। দাঁড়াতে দাঁড়াতে অসহায়ের মত কেঁদে উঠলেন শচীদেবী। ডাকতে লাগলেন—নিমাই !—নিমাই—নি-মা-ই।'

নেই, কোন সাড়া শব্দ নেই। দিল না কেউ কোন প্রত্যুত্তর। বিষ্ণুপ্রিয়া আর শচীদেবী প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে চলতে চলতে ডাকছেন—'নি-মা-ই !

বিষ্ণুপ্রিয়া নীরব। যেন বরফের মত জমাট বেঁধে গেছে বুকের বেদনা। সে নীরব ভাষা বেদনার অশ্রু দিয়ে, মিশিয়ে অন্তরের আকৃতি বলছেন লোচন—

'হেথা বিষ্ণুপ্রিয়া চমকি উঠিয়া,
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া উঠিল কান্দিয়া
শিরে মারে করাঘাত॥
মুই অভাগিনী সকল রজনী
জাগিল প্রভুরে লইয়া।
প্রেমেতে বান্ধিয়া মোরে নিদ্রা দিয়া
প্রভু গেল পলাইয়া॥'

আর বাসুদেব, একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। অতি প্রাতে স্নান সেরে আসছিলেন প্রভুকে প্রণাম করতে। সেই কাক-ডাকা-ভোরে, শীতের সকালে। চমকে উঠলেন, শচীমাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়াকে পথের মোড়ে দেখে। প্রদীপটি হাতে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন দু'জনে। সে মর্মন্তুদ করুণ দৃশ্য প্রাণবন্ত ভাষায় তিনিই পারলেন বলতে।

'শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের পাশে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।

শয়ন মন্দিরে ছিল নিশা অন্তে কোথা গেল
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাই দু'নয়নে
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলু থালু বেশে ধায় বসন না রয় গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা॥
তুবিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতিউতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাঞা।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিতে কান্দিতে পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥'

শচীমাতার ডাক শুনে আচমকা ভেঙ্গে গেল ঈশানের ঘুম। ধড়মড় করে উঠে বাইরে বেরিয়ে এল ঈশান। সে উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিলে—'মা, মাগো।'

'বৌমা, ওই নিমাই ডাকছে না।' দু'জনে ধরলেন বাড়ীর পথ। ততক্ষণ ঈশান এসে গেছে ওদের কাছে। তাকে দেখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন শচী দেবী। 'ও, ঈশান তুই! দেখেছিস, আমার নিমাইকে?'

কি জবাব দেবে ঈশান। কেঁপে উঠল তার অন্তর। পথে বেরিয়ে আসছে লোকজন। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘরে আনল ঈশান। আলুথালু বেশবাস। রক্তিম চোখ। সিক্ত দু'নয়ন। কাঁদছেন শচীরাণী। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রায় পাগলিনী।

'কাঁদে শচীমাতা, ঘর ফেটে যায়
বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারে পুতলীর প্রায়
দাঁড়ায়ে ললনা বিষণ্ণ বদনা
বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে পায়।'

—শিবনাথ শাস্ত্রী

গঙ্গাস্নান করে একে একে ভক্তরা আসছে প্রভুকে প্রণাম করতে। শচীদেবী কাঁদতে কাঁদতে ইঙ্গিত করলেন, চলে গেল বিষ্ণুপ্রিয়া দরজার ভিতরে। লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

দেখতে দেখতে এসে পড়ল প্রায় সকলেই। শ্রীবাস, নিত্যানন্দ, বাসুদেব ঘোষ আর অন্যান্য ভক্তগণ। ছুটে এল পাড়া প্রতিবেশীরাও।

'উঠি প্রতিবাসী, ত্বরা করি আসি,
'কি হইল? বলি দ্বারেতে ডাকিল।

ঘরে আসি দেখে সে ঘর আঁধার
সে প্রশান্ত মুখ সেথা নাহি আর—
শিরে কর দিয়া পড়িল বসিয়া ;
'হায় কি হইল' মুখেতে সবার। —শিবনাথ শাস্ত্রী

জিজ্ঞাস করলেন শ্রীবাস। কাঁদতে কাঁদতে শচীদেবী বললেন—'আমি কিছু জানি না। চিন্তায় ঘুম নাই চোখে। বৌমার ডাকে প্রদীপ নিয়ে খুঁজলাম চারিদিকে। পেলাম না কোথাও। বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম গঙ্গার দিকে। না, সেদিকেও নেই আমার নিমাই।' না, আর বলতে পারলেন না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন শচীদেবী। শোকাকুল ভক্তবৃন্দ দাঁড়িয়ে রইল অবনত মস্তকে। সহসা নিতাইকে দেখতে পেলেন শচীদেবী। আকুল হয়ে বললেন—

'তুই এনে দে আমার নিমাইকে। সে ত তোদের ছেড়ে কোথাও যায় না।' আবার কান্নায় আকুল হয়ে ঢলে পড়লেন ঈশানের কোলে। বলছেন বাসুদেব ঘোষ—

'পড়িয়া ধরণীতলে শোকে শচীদেবী বলে
লাগিল দারুন বিধি বাদে।
অমূল্য রতন ছিল কোন ছলে কেবা নিল
সোনার পুতুলী গোরাচাঁদে ॥'

ভক্তরা বুঝতে পারলেন, প্রভু সংসার ত্যাগ করেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। শচীদেবীকে মিথ্যে প্রবোধ দিয়ে কি আর হবে। নিত্যানন্দ ত সব জানেন। কিন্তু তবু তিনি বললেন—

'মা, ব্যস্ত হবেন না। নিমাই যেখানে যাক, আমি তোমার কাছে এনে দেব। এ প্রতিজ্ঞা আমার।'

ও দিকে বিষ্ণুপ্রিয়া শায়িত ভূমি-শয্যায়। শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। রাত্রির সাজশয্যা তখনো অঙ্গে তার। সিঁথির সিন্দুর মোছামুছি হয়ে একাকার। কুঙ্কুম, অগুরুর সুবাস ম্রিয়মাণ। চোখের কাজল অশ্রু-জলে ধুয়ে মুছে লেপটে গেছে হেথায়-হোথায়। প্রভুর শ্রীহস্তের রচিত কবরী ভেঙ্গে গেছে এলোমেলো হয়ে। বিস্রস্ত অবিন্যস্ত বেশবাস।

কাঁদছে আর শুয়ে শুয়ে ভাবছে প্রিয়া। মনে পড়ছে একে একে বিগত স্মৃতি। এ জন্যই জলে পড়ে গিয়েছিল নাকের বেশর। থেকে থেকে নেমে আসত কান্না। নাচত বাম চোখ। চারদিকে দেখছিলাম এত অমঙ্গল। বাসরের উছুট অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, আমার কপাল ভাঙবেই। মিথ্যে

সান্ত্বনা দিয়েছিলেন প্রভু আমাকে। উনি জানতেন, সব কিছুই জানতেন! হু হু করে আবার দু'নয়ন হয়ে উঠে অশ্রু-সজল।

কিন্তু প্রভুর আশ্বাস মিথ্যে হলো কেন? প্রভু ত বলেছিলেন, যাবার সময় সব জানিয়ে যাবেন। কই, সে কথা ত রক্ষে করলেন না। তবে কি বিস্মরণ হয়েছিল তাঁর। তবে এমন করে রাতে ভুলালেন কেন। এত সোহাগ, এত ভালবাসা—সে কি সব মিথ্যে, সব প্রবঞ্চনা। রাত্রে এ টুকু সুখ তিনি ত না দিলেই পারতেন। কেন, কেন আমাকে দেখালেন মিথ্যে এ সুখের সাম্রাজ্য। আমি ত বেশ ছিলাম। যতই মনে পড়ে রাত্রির স্মৃতি, ব্যাকুল হয়ে উঠে বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় মন। ভোলা যায় না, ভুলতে পারে না কিছুতেই।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ পরামর্শ করলেন সকলে মিলে। তারপর শচীদেবীর কাছে এসে বললেন—'তুমি কেঁদনা মা। তোমায় যখন কথা দিয়েছি, যেমন করে পারি নিমাইকে এনে দেব তোমার কোলে। তুমি শুধু আমাদের আশীর্বাদ করো, যেন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারি।'

যাত্রা করলো কাটোয়ার পথে। যাবে কাঞ্চন নগরে। দণ্ডী কেশব ভারতীর আশ্রমে। নিলে ওঁর কাছেই নেবে সন্ন্যাস। নিমাই ও'র সঙ্গেই ত করেছিল গোপন পরামর্শ। ওরা চলেছে—

'চন্দ্রশেখর আচার্য পণ্ডিত দামোদর।
বক্রেশ্বর আদি করি চলিল সত্বর॥
এইসব লইয়া নিত্যানন্দ চলি যায়।
প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়॥'

শ্রীবাস রইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া আর শচীদেবীর যা অবস্থা। কখন কি হয়। যদি গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। কে সামলাবে ওঁদের। এই বিপদে, এই শোক-সাগরে শ্রীবাসই রইলেন সব কিছু দায় দায়িত্ব মাথায় নিয়ে।

চারিদিকে বিরাট শূন্যতা। আর্তনাদ আর হাহাকার। একদিকে বিষ্ণু-প্রিয়া আর একদিকে শচীদেবী। থেকে থেকে জাহ্নবীর শীতল বাতাস ফেলে দীর্ঘশ্বাস। বিষ্ণুপ্রিয়া আর শচীদেবী সব হারিয়ে আজ শূন্য, রিক্ত। দিন রাত্রি কেটে যায় কোথা দিয়ে। শচীদেবী শুধু কাঁদছেন আক্ষেপ করে—

'আর না হেরিব প্রসব কপালে অলকা তিলক কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস অঙ্গণে সকল ভকত লয়ে।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে আর না দেখিব চেয়ে॥'

স্নান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই কারো চোখে। পথের বাঁকে পাগলিনী

জননী থাকেন দাঁড়িয়ে। প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে। কেউ পথে গেলে শুধান—'তোমরা দেখেছ, নবীন কান্তি, উজ্জ্বল বর্ণ এক সন্ন্যাসীকে পথে যেতে। বলনা কেউ কি দেখ নি?'

পথিক প্রশ্ন শুনে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে পড়ে শচীদেবীর সামনে। বড় মায়া হয় পাগলিনী জননীকে দেখে। বলে—'কই না ত মা, তেমন সন্ন্যাসী কাউকে ত দেখলাম না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পথিক হাঁটতে শুরু করে।

আবার কেউ বলে—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার কথা মত দেখেছি এক সন্ন্যাসীকে।'

'কোথায়, কোথায় দেখলে বাছা? আগ্রহে আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করেন জননী।

'কাঞ্চন নগরে। কেশব ভারতীর আশ্রমে। আহা, কি কষিত কাঞ্চন বরণ। দেখলে হৃদয় মন জুড়িয়ে যায়। সে কি অপরূপ নয়ন লোভন কান্তি। অনিন্দ্য শোভায় সমুদ্ভাসিত।'

ভাবুক পথিক চলে যায় আপন পথে। পাগলিনী জননী উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন পথিকের দিকে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বন্ধ ঘরে কাঁদছে গুমরে গুমরে। কাঞ্চনা, অমিতা কেউ তাকে পারেনি দুমুঠো খাওয়াতে। স্নানও করেনি সে। কাউকে মাথায় হাত দিতে দেয় না। প্রভুর স্বহস্ত রচিত কবরী, না, কাউকে সে হাত দিতে দেবে না। প্রভুর স্মৃতির বন্ধন উন্মোচন করবে না সে।

ঘুম আসে না বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে। ভূমিতলে বসে বসে রাত কাটায় সে। হয়ে থাকে সদা উৎকর্ণ। যদি ফিরে আসে প্রভু। একবারও কি মনে পড়বে না অভাগীর কথা। সে রাত্রির স্মৃতি একবারও কি মনে পড়বে না তাঁর। এত নির্দয় কি পাষাণ হতে পারবেন তিনি।

বাতায়ন পথে বসে বসে রাত কাটে প্রিয়ার। নিস্তব্ধ নীরব চতুর্দিক। শীতের রাত যেন জড় স্থবির। গাছের পাতায় থেকে থেকে শোনা যায় শব্দ। ওঠে বনমর্মর। সহসা আতকে উঠে বিষ্ণুপ্রিয়া। বুঝি প্রভু ঐ আসছে। উৎচকিত দৃষ্টি মেলে সজাগ হয়ে উঠে প্রিয়া। উঁকি মারে জানালা দিয়ে। কই কিছু নাতো। শিশির পড়ছে গাছের পাতা থেকে টুপ টুপ করে। না, কোন আশা নাই। হতাশ হয়ে পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়া।

কেউ কিছু খাওয়াতে পারে না প্রিয়াকে। কোন মতেই কিছুই খায় না সে।

> 'যেদিন হইতে গোরা ছাড়িলা নদীয়া।
> তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া।'

খান না শচীদেবীও। শ্রীবাস চিন্তায় আকুল হয়ে উঠেন। কি করে বাঁচাবেন এঁদের দ্ু'জনকে তিনি। অনেক সাধ্য সাধনা করেন জননীকে বোঝাতো শ্রীবাস। বলেন—'মাগো, তুমি অমন করলে, প্রিয়াজী যে বাঁচবে না। যাই হোক দ্ু'টি ম্ুখে দাও। শ্রীপাদ যখন গিয়েছেন, নিশ্চয় একটা কিছ্ু খবর আনবেন তিনি।'

শ্রীবাসের পত্নী, মালিনী দেবী, অবশেষে তিনি ও এলেন। শচীদেবীর সই। অনেক বলে কয়ে নিজহাতে দ্ু'ম্ুঠো খাওয়ালেন শচীদেবীকে। জননীর অন্ুরোধে বিষ্ণুপ্রিয়াকে কোন রকমে দ্ুম্ুঠো খাওয়ালো সকলে মিলে।

প্ৃথিবী তার আবর্তন বন্ধ করে না। সে চলেছে নিজের মের্ুদণ্ডের উপরে ঘ্ুরে স্ূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তাই ত দিন-রাত্রি সংঘটিত হয়।

প্রভাত হয় তাই দ্ুঃখের শর্বরীও। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে কেটে গেল তিনটা দিন। বিষ্ণ্ুপ্রিয়ার জীবনে এ ব্ুঝি তিন বৎসর। চতুর্থ দিন নদীয়ার লোকে শ্ুনল নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে। কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে। নাম গ্রহণ করেছে সন্ন্যাস জীবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী।

তখনো সব সংবাদ পেঁ'ছোনি বিষ্ণ্ুপ্রিয়া বা শচীমাতার কাছে। তাঁরা তখনো শ্ুনেননি নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ নিমাইকে পথ ভ্ুলিয়ে এনে তুলেছেন শান্তিপ্ুরে অদ্বৈতাচার্যের বাড়ীতে। নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের পর একদিন কেশব ভারতীর আশ্রমে কাটিয়ে ছ্ুটেছিলেন ব্ৃন্দাবনের পথে। খাওয়া নেই, স্নান নেই, ম্ুখে শ্ুধ্ু কৃষ্ণ নাম। নেই কোন দিকে দ্ৃকপাত। চলেছেন কোন দিকে, কোন পথে কোন হ্ুঁসই নেই তার। পাছে পাছে ছ্ুটে চলেছেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। উর্ধশ্বাসে ছ্ুটে চলেছে যেন একটা আলোক স্তম্ভ। উল্কার বেগে। নিত্যানন্দ পারছেন না কিছ্ুতেই। শেষে অনেক কষ্টে রাখাল বালকদের দ্বারা পথ ভ্ুলিয়ে নিয়ে এসে তুললেন অদ্বৈতাচার্যের বাড়ীতে। চারদিনের দিন আহার করল প্রভ্ু অদ্বৈতাচার্যের গ্ৃহে।

বিকেলে প্রভুর অন্ুমতি আদায় করেছেন নিত্যানন্দ। নবদ্বীপে গিয়ে মাকে আনতে পারে নিতাই। নিমাই দেখা করবে মায়ের সঙ্গে।

নিত্যানন্দ তাই পঞ্চম দিন অতি প্রত্যুষে চললেন নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে। বেশি দ্ূর নয়, শান্তিপ্ুর থেকে নবদ্বীপ মাত্র চার কি পাঁচ ক্রোশ দ্ূরে। নিত্যানন্দের কাছে ও কিছ্ুই নয়। চলছেন আর মনে মনে ভাবছেন—'মা আর বিষ্ণ্ুপ্রিয়া

বেঁচে ত। নিমাইয়ের বিরহ জ্বালা সহ্য করতে পেরেছেন কি ও'রা। কি জানি, কি অবস্থায় দেখব গিয়ে ও'দের।' এমনি নানান সন্দেহ দোলায় দুলতে থাকেন নিত্যানন্দ।

যখন এসে হাজির হলেন নিত্যানন্দ, বেলা খুব একটা হয়নি। সকালই বলা চলে। বাড়ী নীরব। সাড়াশব্দ কোথাও নাই। যেন বৈধব্যের লক্ষণ ফুটে উঠছে বাড়ীটার সর্বত্র। উঠানে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন নিত্যানন্দ—'মা, মা গো ?'

ঘরে ছিলেন শচীদেবী। ডাক শুনেই বুঝতে পারলেন নিতাইয়ের কণ্ঠস্বর। বাড়ী থেকেই বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন—'কে ? নিতাই, আমার নিমাইকে এনেছিস ?'

শাশুড়ীর পিছনে পিছনে বিষ্ণুপ্রিয়াও এসে দাঁড়াল দরজার আড়ালে। তখন নিত্যানন্দ—

'দাঁড়াইয়া মায়ের কাছে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস॥
কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই।
কাঁদি বলে কোথা আছে আমার নিমাই॥'

কি করে বলবেন তিনি জননীকে এ দুঃসহ হৃদয় বিদারক সংবাদ। বৃদ্ধা জননী কি পারবেন সহ্য করতে এ নিদারুণ দুঃখ। বিষ্ণুপ্রিয়া কি বাঁচবে নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা শুনে। কিন্তু তাকে ত বলতেই হবে। তিনি কেমন করে এ সত্য গোপন করবেন। তাই যতই মর্মান্তিক হোক, তিনি বললেন—

'না কান্দিহ শচী মাতা শুন মোর বাণী।
সন্ন্যাস করিলা প্রভু গৌর গুণমণি॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইলা শান্তিপুরে।
আমারে পাঠায়া দিল তোমা লইবারে॥
তখন—শুনিয়া নিতাই মুখে সন্ন্যাসের কথা।
অচৈতন্য হয়ে ভূমে পড়ে শচীমাতা॥
উঠাইলা নিত্যানন্দ চল শান্তিপুরে।
তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে॥'—মুরারি ঘোষ

কাছে ছিলেন মালিনী সই। অনেক কষ্টে ভাঙ্গালেন মূর্চ্ছা। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘিরে রেখেছিল কাঞ্চনা প্রভৃতি পাড়ার কয়েকটি মেয়ে। তারা ধরে ফেলল সকলে। প্রিয়া পাষাণ প্রতিমার মত নীরব নিশ্চল। চেতন পেয়ে শচীদেবী মালিনীকে ধরে বলে উঠলেন—'মালিনী সই, নিমাই নাকি অদ্বৈতের ঘরে।

আমাকে নিতে পাঠিয়েছে চল যাই।' পরক্ষণে আবার পাগলের মত বলে উঠলেন—“না, না, ও আমি দেখতে পারব না। নিমাই এখন কাঙালের বেশ নিয়েছে। আমি গঙ্গায় ডুবে মরব।'

তারপর, 'নিমাই', 'নিমাই', বলে উম্মাদিনী চললেন ছুটে। তাকে ধরে ফেলল সকলে।

শ্রীবাস বললেন—'মা, একটু অপেক্ষা করুন। দোলা আসছে। তাতেই আপনি যাবেন। আমরাও যাব সঙ্গে। তোমাব নিমাইকে ফিরিয়ে আনব নদীয়াতে।'

'হেদে গো মালিনী সই চল দেখি যাই।
নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিতাই॥
সে চাঁচর কেশহীন কেমনে দেখিব।
না যাব অদ্বৈতেব ঘরে গঙ্গায় পশিব॥
এত বলি শচীমাতা কাতব হইয়া।
শান্তিপুব মুখো ধায় নিমাই বলিয়া॥
যাইল সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে
বাসুদেব সঙ্গে যায় কান্দিতে কান্দিতে॥'

দলে দলে নদীয়াবাসী ছুটলো শান্তিপুরের পথে। তারা দেখবে তাদের প্রিয় প্রভুকে। ছুটে চললো তিন শ্রেণীর লোকই। যারা ছিল তার শত্রু, যারা ছিল বৈষ্ণব, আর যারা এদল ওদল কোন দলেরই নয়, তারাও চললো দেখতে। দেখবে তাবা নবদ্বীপের চৈতন্যকে।

দোলা এসে গেছে। শচীদেবী প্রস্তুত। এগিয়ে আসছেন দোলায় আরোহণের জন্য। পিছনে পিছনে বিষ্ণুপ্রিয়াও আসছে। শচীদেবীকে ধরে আছেন সকলে। দোলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন নিত্যানন্দ। চোখ দু'টি স্থির। দেখছেন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে। ধরে আছে কাঞ্চনা। নিত্যানন্দের বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠছে। এখন কি করবেন তিনি। কিছুই স্থির করতে পারছেন না। প্রিয়াজীকে তিনি পারবেন না নিয়ে যেতে। প্রভুর যে আদেশ নেই। এখন কি করে বলবেন তিনি সে কথা। প্রিয়াজীর বুকে কি করে হানবেন তিনি শেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন প্রিয়াজীর সামনে। তারপর আড়ষ্ট গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—'শ্রীমতীকে নিয়ে যেতে প্রভুর আজ্ঞা নাই।'

সকলে স্তম্ভিত। প্রভুর এই মর্মভেদী আদেশ বিদ্ধ করল উপস্থিত সকলকে। শাশুড়ীর অঞ্চল ধরে দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া। সহসা শচীদেবী বললেন—'তাহলে আমিও যাব না।'

চমকে উঠল সকলে। সকলের দেহ হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত। হতভম্ব নিত্যানন্দ। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঞ্চনাকে নিয়ে চলে গেল ধীরে ধীরে। বস্ত্রাবৃত ঘোমটা টানা তার মুখমণ্ডল। প্রবেশ করল গৃহাভ্যন্তরে। শচীদেবী আর পারলেন না দাঁড়িয়ে থাকতে। মালিনী সইকে ধরে বসে পড়লেন ধীরে ধীরে। একটু পরে বললেন—'আমাকে নিয়ে চল বৌমার কাছে।'

গৃহে ফিরে গেল শচীদেবী। অন্যায় হয়েছে তার। এ কথা জানবেন কেমন করে। কেন নিত্যানন্দ একথা বললো না আগে। বৌমার যাওয়ার অনুমতি নাই। যদি অভাগিনী অনুমতি না পায়, তাহলে 'আমিই বা যেয়ে কি করব ?

শাশুড়ীর কথা শুনে বড় লজ্জিত হলো বিষ্ণুপ্রিয়া। অবশেষে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো—'তুমি যাও মা। না গেলে উনি বড় দুঃখ পাবেন। ডেকেছেন তোমায়। আমার জন্য তুমি কেন দর্শন সুখে বঞ্চিত হবে বলো। আমার জন্য ব্যথা পেয়ো না মা। আমি কি কখনো তাঁর ধর্ম পথের অন্তরায় হতে পারি। তাঁর আদেশ পালন করা, সেই ত আমার বড় ধর্ম। তাঁর তৃপ্তি সাধন করাই তো আমার কর্তব্য ও সাধনা। তুমি আর বৃথা বিলম্ব করো না। বলছি তুমি যাও মা।

কাঁদতে কাঁদতে শচী দেবী বললেন—'তুমি তাহলে যেতে বলছ ?'

'হ্যাঁ মা তুমি যাও। উনি তোমায় ডেকেছেন।' অনেকটা স্পষ্ট করে বললে বিষ্ণুপ্রিয়া। অবাক বিস্ময়ে প্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পুর-মহিলারা।

শচীদেবী অগত্যা চলে গেলেন। দোলায় চড়ে পুত্র সন্দর্শনে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ, তারাও চললেন

বজ্রাহতের মত বিষ্ণুপ্রিয়া ঢলে পড়ল ভূমিতলে। ভাবল—'একি অন্যায়। কেবল আমিই নয়। নদীয়ার সকলে দেখতে পাবে, কেবল আমিই নয়। আমি যদি প্রভুর স্ত্রী না হোতাম, তাহলে ত আমার কোন বাধা থাকত না। আমার এক মাত্র অপরাধ, আমি প্রভুর ঘরণী। আমার জন্যই প্রভুর সন্ন্যাস।'

> 'আমা লাগি প্রভু মোর করিল সন্ন্যাস।
> ফিরিয়া যদ্যপি আইলা অদ্বৈতের বাস॥
> স্ত্রীপুরুষ বাল বৃদ্ধ যুবতী যুবক।
> দেখিতে আনন্দে ধাঞা চলে সব লোক॥
> কোন্ অপরাধ কৈনু মুঞি অভাগিনী।
> দেখিতেও অধিকার না ধরে পাপিনী॥

প্রভুর রমণী যদি না করিত বিধি।
তথাপি পাইত দেখা প্রভু গুণাবধি ॥'

—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক

বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্নায় কাঁদছে জীবকুল। কাঁদছে তার প্রভুকে স্মরণ করে। তাদের চিত্তের মালিন্য যাচ্ছে ধুয়ে মুছে। তারা আজ প্রিয়ার ব্যথায় ব্যথী। তারা আজ সকলেই কাঁদছে প্রিয়ার প্রিয় পুরুষটির জন্য। কে সেই প্রাণপতি? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী।

তাঁকে ডাকতে হয় কান্না দিয়েই। তুষ্ট করতে হয় চোখের জলে চরণ সিঞ্চন করে। তাই বিষ্ণুপ্রিয়া আপনি কেঁদে দিচ্ছে সবাইকে কান্নার মন্ত্র। তাঁকে পেতে হলে কাঁদতে হয়। কান্না কি সহজে হয়। চাই আবেগ, চাই প্রাণের আকুতি। তাই ত কাঁদছে বিষ্ণুপ্রিয়া।

প্রভু আমি তোমার জন্যই, তোমার তৃপ্তি সাধন করার জন্যই, আমার সব সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে রইলেম বুকে পাষাণ বেঁধে। তুমি সিদ্ধ কর তোমার অভীষ্ট। নামমুখী করে তোল জীবকে। কৃষ্ণপ্রেম দিয়ে ধন্য কর তাদের। দাও মুছিয়ে মোহাঞ্জন। আমি উপেক্ষায় অনাদরে রইলেম তোমারি প্রতীক্ষায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া আর পারছে না ভাবতে। পারছে না নিজেকে সংযত করতে। অশান্ত মন তার প্রবোধ মানছে না কিছুতেই। কেউ তুলতে পারছে না তাকে। ভূমিতলে তেমনি পড়ে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া। অভাগিনী স্তব্ধ নীরব।

সহসা মনে হল, হায়, হায়, মাকে ত বলা হলো না। আমি এখন কি করব। কি করে পালন করব সন্ন্যাসিনীর জীবন। এসব যে আমি কিছুই জানি না। বলে দিলে ওঁকে জিগ্গেস করে আসতেন এসব। আমি এখন কি করি। মস্ত ভুল হয়ে গেল আমার। সহসা উঠে বসলে প্রিয়া। ভাবলে যদি একটা লিখি পত্র-লিপি। পাঠাই প্রভুর সকাশে। তাহলে, তাহলে উনি কি আমায় জবাব দেবেন। জানাবেন ওঁর নির্দেশ। জানাবেন, এখন আমার পালনীয় কর্তব্য কি?

বিক্ষুব্ধ অশান্ত মন নিয়ে প্রিয়া লিখতে বসল পত্র।

॥ প্রিয়াজীর পত্র ॥

'যে অবধি গেছ তুমি এ ঘর ছাড়িয়া।
সে হতে আছেন মাতা উপোস করিয়া ॥
সদা তাঁর সঙ্গেতে মালিনী ঠাকুরাণী।
নৈলে প্রাণে এতদিন মরিতেন তিনি ॥

খাওয়াইতে করি যত সাধ্য সাধন।
মোরে কোলে করি করেন দ্বিগুণ রোদন ॥
মোর হাতে মা রাখিয়া চলে গেলে তুমি।
অকূল পাথারে দেখ পড়িলাম আমি ॥
পিতা চেয়েছিলেন মোরে বাড়ি লইবারে।
তা কি আমি যেতে পারি মাকে একা ছেড়ে ॥
সন্ন্যাসী ঘরণীর নিয়ম কিছুই না জানি।
কি খাইব কি পরিব লিখিবে আপনি ॥
হাতের কঙ্কণ ফেলিবারে হলো ভয়।
পাছে বা তোমার কিছু অমঙ্গল হয় ॥
তোমার পাটের জোড় গলার চাদর।
তোমার গলার হার চরণ-নূপুর ॥
কি করিব এ সকল সামগ্রী লইয়া।
রাখিব কি গঙ্গা মাঝে দিব ভাসাইয়া ॥
এ সব বারতা আমি কাহারে সুধাই।
মাকে সুধাইলে তিনি বাঁচিবেন নাই ॥
মার কাছে থাক যদি বড় ভাল হয়।
আমি কাছে না যাইব না করিহ ভয় ॥
তাহলে যে শান্ত হবেন দুখিনী জননী।
তারে বলে দিও নিয়ম কি পালিব আমি ॥
আপনি যে সব তুমি নিয়ম পালিবে।
তাহতে কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে ॥
বাঁচিব ত্যজিয়া আমি ভূষণ ভোজন।
সুখেতে করিব আমি মাটিতে শয়ন ॥
লোকে বলে তুমি নাকি আমার লাগিয়া।
গার্হস্থ্য ছাড়িয়া গেলে সন্ন্যাসী হইয়া ॥
কেন আমি তোমার কি করিলাম ক্ষতি।
কোন দিন সংকীর্তনে করেছি আপত্তি ॥
আছাড়ে তোমার সর্ব অঙ্গে লাগে ব্যথা।
বল দেখি কোন দিন কহিয়াছি কথা ॥
খাট হতে ভুমে গড়াগড়ি দিতে তুমি।
বল কোন দিন রাগ করিয়াছি আমি ॥

পাষাণ গলিত তোমার করুণ রোদনে ।
মোর দুঃখ রাখিতাম আপনার মনে ॥
আমারে দেখিলে যদি ধর্ম নষ্ট হয় ।
আমি নয় রহিতাম বাপের আলয় ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া পত্র লেখে কান্দিয়া কান্দিয়া ।
বলরাম দেখে পাছে থাকি দাঁড়াইয়া ॥'

এ পত্র কি পোঁছে ছিল প্রভুর কাছে ? জনশ্রুতি, একটি স্ত্রীলোকের দ্বারা এ পত্র নাকি শান্তিপুরে পোঁছেছিল প্রভুর সকাশে। কোন উত্তর পেয়েছিল কি বিষ্ণুপ্রিয়া, তাও জানা নাই। প্রাচীন পদকর্তা বলরাম দাস নিতান্ত জনশ্রুতি অবলম্বন করে লিখেছিলেন এ পত্র-লিপি। ঐতিহাসিক মূল্য থাক বা না থাক, বাংলা পত্র-সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এ পত্রখানি। পত্র-সাহিত্যের স্রষ্টা যে মধুসূদন নন, এটি তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার দহন-দীপ্ত হৃদয়ের বেদনার্তি মূর্ত এ লিপির ছত্রে ছত্রে। করুক ইতিহাস অস্বীকার। কেঁদে কেঁদে প্রিয়াজী যে লিখেছিলেন এ পত্র, এ কথা ত সত্য। পিছনে দাঁড়িয়ে সংগোপনে বোধ হয় চুরি করে দেখে নিয়েছিলেন বলরাম দাস যা ঘটে তা সত্য নয়, কবি যা লেখেন তা সত্য এবং শাশ্বত।

॥ আটাশ ॥

কোন দুঃখই চিরস্থায়ী নয়। তা যদি হত, হয়ত পৃথিবীটা এত সুন্দর হোত না। প্রকৃতি ভুলিয়ে দেয় সব কিছু। এর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ দোলা দেয় মানুষের হৃদয়কে।

তাই বলে অতীতকে ত জীবন থেকে বাদ দেওয়া যায় না। স্মৃতিভারে বার বার নুয়ে পড়ে সে। সুখের দিনে হয়ত দুঃখের স্মৃতি ভুলে যায় মানুষ।

বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে সুখের স্মৃতি আর কতটুকু। যৌবনে যোগিনী সে। কান্না, শুধু যেন কাঁদতে এসেছে সে এ পৃথিবীতে। কান্নার কৃষ্ণতা নিয়েই ত তার জীবন। কান্নার হাহাকারে স্পন্দিত প্রিয়ার জীবন। বুঝিবা কান্না দিয়েই ঘটবে এর পরিসমাপ্তি।

দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে অতিক্রান্ত হলো জীবনে আঠারটা বছর। প্রভু যখন সন্ন্যাস নিলেন তখন চতুর্দশী সে। চৌদ্দ বছরের নবীনা যুবতী। তারপর কোথা দিয়ে কেটে গেল আরো পাঁচটা বছর।

আজ বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে একমাত্র সঙ্গিনী হলো তার স্মৃতি। স্মৃতি নিয়েই বেঁচে আছে সে। কত কথাই না মনে পড়ে তার। প্রিয়া স্তব্ধ হয়ে ভাবে নির্বাক বিস্ময়ে। নিশ্চল পাষাণের মত বসে বসে ভাবে। যাওয়ার আগে বলেছিলেন প্রভু।

'কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচী।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি॥' চৈ. ম.

কৃষ্ণ কে তা সে জানে না। সে জানে গৌরাঙ্গকে। তাই সে ভজনা করে গৌরাঙ্গকেই। গৌরাঙ্গই তার ভজন, পূজন, কীর্তন, বন্দন আর মনন। জপ করে অহরহ—

'ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥'

এই ত, এই নামই জপ করে প্রিয়াজী অহরহ। গৌরাঙ্গের স্মৃতিই একমাত্র তার সম্বল। আর আছেন বৃদ্ধা শাশুড়ী। এখন তাঁর বয়স প্রায় ৭২ বছর। তাঁর মুখে দিনরাত লেগে আছে গৌর নাম। কৃষ্ণ ভজন তার আর

হয় না। গোর নাম আর গৌর-কথন অবিরাম লেগে আছে তুণ্ডে। অবিরাম অন্তর মথিত করে উৎসারিত হচ্ছে—'নিমাই-নিমাই-নিমাই।'

এ যেন ইষ্টমন্ত্র তাঁর। অবিরাম জপমালার মত চলছেন জপ করে। জপতে জপতে শরীর হয়ে আসে অবশ। হারিয়ে ফেলেন বাহ্যজ্ঞান। তখন তিনি দেখতে পান নিমাইকে। আলোয় আলোময় হয়ে উঠে গৃহ। রাতের অন্ধকার হয় অপসারিত। কথা বলেন, ডাকেন নিমাইকে। 'হে আমার নিমাই দেখা দে আমাকে। তুই ত বলে গিয়েছিলি, আমি ডাকলেই দেখা দিবি আমাকে। আমি এই ত তোর জন্য রান্না করে রয়েছি বসে। কই তুই আয়।'

স্নানে যান শচীদেবী। নিজে আর হাঁটিতে পারেন না। ঈশান হাত ধরে নিয়ে যায় গঙ্গায়। বিষ্ণুপ্রিয়া চলে ঘোমটা দিয়ে শাশুড়ীর অঞ্চল ধরে। পথ হাঁটে মায়ের পায়ের দিকে তাকিয়ে। একা একা কখনো গঙ্গাস্নানে যায়না প্রিয়া। ফেরার পথে করে আনে পুষ্পচয়ন। এসে বসেন মন্দিরে। পুজো করেন কান্নার মন্ত্রে। কেঁদে কেঁদে ডাকেন—'নিমাই-নিমাই-নিমাই।'

ডাকতে ডাকতে কখনো যেন পাগল হয়ে যান। কি বলতে কি যে বলেন খেয়ালই থাকে না তাঁর। বিষ্ণুপ্রিয়ার জ্বালা কি কম। কাঁদতে চাইলেও কাঁদতে পারে না। হৃদয়ে কান্নাকে চেপে রেখে বাইরে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে রাখে নিজেকে। শুষ্ক মুখ দেখলেই শচীমাতা কেমন যেন হয়ে পড়েন। তখন সামলাতে পারে না বিষ্ণুপ্রিয়া। তাই হৃদয়ের সব দুঃখকে নির্মম ভাবে চেপে রাখতে হয়। ঢেকে রাখতে হয় প্রসন্নতার প্রলেপ দিয়ে। মাঝে মাঝে বিষ্ণু-প্রিয়ার প্রশ্ন জাগে মনে—'ওগো, তুমি কি আমার জন্য ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়ে গেলে? তবে আমি কেন অঙ্গে ধারণ করব এ বেশ। আমিও তোমার মত সাজব সন্ন্যাসিনী। আমি হবো যোগিনী।

শুয়েছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। উঠে পড়লো সহসা। দেখলে এদিক ওদিক। সামনে কেউ কোথাও নাই। শাশুড়ী ঢুকেছেন মন্দিরে। এইত প্রকৃষ্ট সময়।

তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে অঙ্গের আভরণ। পট্টবাসের পরিবর্তে পরলে গৈরিক বসন। গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত করলে অবাধ্য যৌবনকে। মুছে ফেললে চোখের অশ্রু। সাজলে যোগিনী। কৃচ্ছ্র ব্রতের তপশ্চর্যায় ব্রতী হলে নিজে। হলো গৌরাঙ্গের ষড়বিধ ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী। সর্বশক্তির মূলা-ধার। বিষ্ণুপ্রিয়া আজ হলো গরীয়সী গৌরাঙ্গী।

গৌরাঙ্গী বসলে ধ্যানমগ্ন হয়ে। তলিয়ে গেল গৌরাঙ্গের নাম ভজতে ভজতে অতলে। নিমজ্জিত হল গৌর নামে। ভ্রূমধ্যে কূটস্থ চৈতন্যে ফুটে

উঠল অপূর্ব জ্যোতি। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অপূর্ব বিভায়। সেই জ্যোতির মধ্যেই বিভাসিত হয়ে দেখা দিল গৌরাঙ্গের অপূর্ব মূরতি।

তন্ময় বিষ্ণুপ্রিয়া, ভুমানন্দে হয়ে উঠলো অপূর্ব দীপ্তিময়ী।

ঠিক এমনি সময়ে কোথা ছিল কাঞ্চনা, খুঁজতে এলো প্রিয়াকে। ধ্যান স্তিমিত অবস্থায় দেখে তাকিয়ে রইল অবাক বিস্ময়ে। যেন জ্যোতি ঠিকরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে। ভয়ে ছুটে চললো মায়ের কাছে। কম্পিত কণ্ঠে বলল—'মা গো, এসে দেখো তোমার বৌমা বসেছে যোগাসনে। অপূর্ব বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার মুখমণ্ডল। তা তাকাতে পারছি না ওর মুখের দিকে। মনে হচ্ছে ও হয়ে গেছে পাগলিনী।'

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল কাঞ্চনা। বৃদ্ধা মাতা কাঁপতে কাঁপতে এলেন ছুটে। ভীতা হরিণীর মত ত্রস্ত পদে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে, তারপর টেনে নিলেন আপন কোলে। বললেন—'মা, তুমি ত জগজ্জননী। জীবের মুক্তিদাত্রী মা। জীবের মঙ্গলের জন্যই নিমাই দিয়ে গেছে আমাদের কান্নার মন্ত্র। তুমি কাঁদো, মা। আমিও কাঁদি তোমার সঙ্গে। তবেই না জীব কাঁদবে। রোদনই আমাদের একমাত্র ভজন। এ ভজন ছেড়ে তুমি কেন এলে মা যোগের পথে? এ পথ ত আমাদের জন্য নয় মা।'

এই কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের পথ থেকে শচীমাতা টেনে আনলেন তাকে কোমলে। নইলে বিষ্ণুপ্রিয়া যে পাগল হয়ে যাবে।

মায়ের কোলে মূর্ছিত হয়ে পড়ল বিষ্ণুপ্রিয়া। চীৎকার করে উঠলেন শচীদেবী। 'একি হল?' ছুটে এল কাঞ্চনা। বিরহিনী বিষ্ণুপ্রিয়া নিস্তব্ধ, নীরব। কোন স্পন্দন নাই তাব দেহে। আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন জননী। 'আমার একি হলো? বৌমা, ও বৌমা' কাঞ্চনা এখন সামলাবে কেমন করে। প্রিয়ার কানের কাছে মুখ রেখে আরম্ভ করল গৌর নাম। তাতেই কাজ হলো। এ রোগের এই হলো মহৌষধ। ধীরে জ্ঞান ফিরে এলো বিষ্ণুপ্রিয়ার। উঠে বসল সে। জননী বুকে চেপে ধরলেন প্রিয়াকে। এতক্ষণ পরে কেঁদে উঠলেন শচী মাতা।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্না যেন আর থামে না। এই ত ছিল, কোথায় মিলিয়ে গেল প্রভু।' কাঞ্চনা সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'কাঁদিস নে সই। প্রাণবল্লভ আসবেনই। তাকে আসতেই হবে। জননী আর জন্মভূমি সন্ন্যাসীদের অন্ততঃ একবার যে দেখতেই হয়।'

বিস্ময় ভরা কণ্ঠে শুধাল বিষ্ণুপ্রিয়া—'সই, সত্যি কি তিনি আসবেন? তুই সত্যি বলছিস?'

কেমন যেন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রভু ত আমার জন্যই করেছেন সংসার ত্যাগ। তাহলে কেমন করে আসবেন তিনি। এলেও এ অভাগিনীর জীবিত অবস্থায় তিনি কি আসবেন।'

'অত উতলা হোস্ না প্রিয়া। সংবাদ পেয়েছি তিনি আসছেন', বললে কাঞ্চনা।

'সত্যি, কে বললো রে সই?' আগ্রহ ভবে জিগ্যেস্ করে প্রিয়া।

'নীলাচল থেকে দামোদর পণ্ডিত এসেছেন। তিনিই এনেছেন এ সংবাদ।' কাঞ্চনার কথা গুলিতে কেমন আশ্বস্ত হয় প্রিয়া। সত্যি আসছেন। বড় আশায় বুক বাঁধে প্রিয়া। তাহলে জীবিত অবস্থায় দেখা পাব তাঁর।

হ্যাঁ, প্রভুকে দর্শন করে সত্যি ফিরে আসছেন দামোদর পণ্ডিত। প্রভু তাঁর জন্য আর মায়ের জন্য জগন্নাথের প্রসাদ আর পাঠিয়েছেন কাপড়। বলেছেন দামোদর পণ্ডিতকে প্রভু—'

'এই বস্ত্র মাতাকে দিও এসব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্মনাশ ॥
তাঁব প্রেমবশ আমি তাঁর সেবা ধর্ম।
তাহা ছাড়া করিয়াছি বাতুলের কর্ম ॥
কি কার্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন ॥' চৈ. চ. মধ্য.

শচীদেবীর খুশি আর ধরে না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ডাকলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে।—, বলি ও বৌমা, গেলে কোথায়। এই দ্যাখো, নিমাই আমাব কি সব পাঠিয়েছে দ্যাখো। এই ধরো, নিয়ে যাও। আর দ্যাখো, ওসব সন্ন্যাসিনীর বেশ আমি দেখতে পারি না। যাও, এই শাড়ী তুমি পরো।'

বেরিয়ে এসে হাত পাতলো বিষ্ণুপ্রিয়া। মায়েব কাছ থেকে গ্রহণ করলো সে প্রভুর প্রেরিত উপহার। ঘরে গিয়ে বুকে চেপে ধরল শাড়ীখানা। দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো আনন্দাশ্রু। প্রভু তাহলে ভুলে যাননি এ অভাগীর কথা। বার বার বুকে চেপে অনুভব করতে লাগল প্রভুর স্পর্শ। ভরে উঠল প্রিয়ার প্রাণ এক অনাস্বাদিত স্মৃতিসৌরভে।

শচীদেবীর যেন আনন্দের সীমা নাই। নিমাই তার আসছে নদীয়ায়। আত্মহারা হয়ে উঠলেন তিনি। যেন আর তর সয় না তাঁর। বসে থাকেন গিয়ে পথের ধারে। কোন পথিক গেলেই তাকে জিগ্যেস করেন—'বলি

তোমরা জান, আমার নিমাই কতদূর এলো? তাকে দেখেছ কি কেউ এদিকে আসতে?'

কখনো বা থাকেন সম্পূর্ণ নিজের খেয়ালে। রাতে ঘুম আসে না একটুও। প্রায় বিছানায় বসে বসে রাত কাটান। আবার কখনো কখনো ডাকেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে—'বলি ও বৌমা, নিমাইকে একবার পাঠিয়ে দাও না এ ঘরে।'

'বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীর কথা শুনে অবাক। নিমাই তাঁর কোথায়? কই তিনি ত আসেননি এ ঘরে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ বৌমা। নিমাই ত আমার ঘরে নাই। সে ত চলে গেছে সন্ন্যাস হয়ে। আজকাল আমাব আর কিছু মনে থাকে না। বুঝলে বৌমা, বয়স আমার কত হোল বলত। আজকাল আমার আর কিছুই মনে থাকে না দেখছি।'

রোজই নিমাইয়ের জন্য রান্না করেন শচীদেবী। নিমাই যা যা খেতে ভাল-বাসত, সেইসব ব্যঞ্জনই রান্না করেন।

'একদিন শালান্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভ্রষ্ট পটোল নিম্বপাত॥
লেম্বু আদা ঘণ্ট দধি দুগ্ধ খণ্ডসার।
শালগ্রামে সমর্পিল বহু উপহার।
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন॥
নিমাঞির প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন।
নিমাঞি নাহি ঘরে কে করে ভোজন॥'

মায়ের আকুল আহবান শুনে ছুটে আসে নিমাই। আধো তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় যেন স্বপ্ন দর্শন করেন শচী মাতা। নিমাই এসে বসে বসে খাচেছ তার নিবেদিত অন্ন। ভারী খুশি হল শচীদেবী। একটা আত্মতৃপ্তি লাভ করেন মনে মনে।

আবার কখনো কখনো শচীদেবী দেখেন তার নিমাই রয়েছে শ্রীবাসের অঙ্গনে। ছুটেন রান্নাবান্না করেই। গিয়ে হাঁক দেন—'কইরে সই, আমি যে এদিকে রান্নাবান্না করে বসে রয়েছি। সব যে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বলি তোর বাড়িতে নিমাই কি রয়েছে?'

মালিনী দেবী হয়ে উঠেন বিস্মিত। তিনি বেশ বুঝতে পারেন শচী-মাতার মাথার ঠিক নেই। পাগল হয়ে গিয়েছেন পুত্রের জন্য। ধীরে ধীরে আবেশ যায় কেটে। হাহাকার করে ওঠে অন্তর।

এমনি করে কাটে দিনের পর দিন। আবেগে, আর্তিতে, অশ্রু বেদনায় আর স্মৃতি-চারণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় দিবস রজনী।

একদিন।

সহসা আকাশ বাতাস হয়ে উঠল মুখরিত। হরিধ্বনিতে ভরে উঠল চতুর্দিক। চারিদিকে পড়ে গেল আনন্দের সাড়া। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আগমন বার্তা ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। বিষ্ণুপ্রিয়া আর শচীদেবী আকুল উৎকণ্ঠায় ছুটে এলেন বাতায়নে। সতৃষ্ণ নয়নে ব্যাকুল প্রতীক্ষা নিয়ে। যেন ধৈর্য আর ধরে না। শচীদেবী অবশেষে বেরিয়ে এলেন গৃহ থেকে। পিছনে পিছনে মায়ের অঞ্চল ধরে ঘোমটা মাথায় বিষ্ণুপ্রিয়াও এলো বেরিয়ে। দেখলো পথে চলেছে অবিচ্ছিন্ন জনস্রোত। কাতারে কাতারে, হাজারে হাজারে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন শচীদেবী। নিমাই আমার ঠিক আসবে ত। হয়ত এমনও ত হতে পারে জন্মভূমি দর্শন করে ফিরে যাবে নিমাই। কিন্তু যদি গৃহে না আসে? সন্ন্যাসীর ত স্ত্রীমুখ দর্শনে নিষেধ আছে। তাহলে বিষ্ণু-প্রিয়া কি থাকবে চিরবঞ্চিতা?

এপার ওপার গঙ্গা। দূরত্ব আর কতটুকু। চীৎকার করে উঠল এপারের জনসমুদ্র, ওই, ওইত ওপারে এসে গেছেন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু। সুদীর্ঘ বপু। হাজার হাজার লোকের মধ্যে থাকলেও দূর থেকে দেখা যায় তাঁকে। ওই, ওইত দাঁড়িয়ে রয়েছেন অমিয় লাবণ্যমাখা কনক দ্যুতি প্রভু।

বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন শচীদেবী। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। হাত পায়ে জোর নেই তাঁর। কাঁপছেন থরথর করে। অঞ্চল ধরে দেবী বিষ্ণু-প্রিয়া। এত দূর থেকে দেখা যাবে কি ওকে।

এপারের হাজার হাজার লোক অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে উঠল—'ওই-ওই-যে প্রভু।'

ঘোমটার ভিতর থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া দেখলো দৃষ্টি প্রসারিত করে। ওপারে যেন এক বিশাল জন-সমুদ্র। তারমধ্যে বিকশিত হয়ে উঠল প্রস্ফুটিত পদ্মের মত অপূর্ব মুখমণ্ডল। বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোমটার আড়াল থেকে দেখে নিল প্রভুকে। এতদিনের ব্যথিত অন্তর তার হয়ে উঠল আনন্দে পরিপূর্ণ। প্রিয়া মনে মনে বলে উঠলে—

'এত দিনে সদয় হইল মোরে বিধি।
আনি মিলাওল গোরা গুণনিধি ॥
এত দিনে মিটল দারুণ দুখ।
নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদমুখ ॥

চির উপবাসী ছিল লোচন মোর।
চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর॥
বাসুদেব ঘোষে গায় গোরা-পরবন্ধ।
লোচন পাওল যেন জনম অন্ধ॥'

প্রিয়ার বুক ঠেলে নামল কান্নার ঢল। একি রূপ হয়েছে তার প্রাণ-গৌরাঙ্গের। কই মাথায় সেই চাঁচর চিকুর। কই নদীয়া বিনোদের সেই কাঞ্চন জিনিয়া বরণ। এ যে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ।

ওপারে ফুলিয়ার লক্ষ লক্ষ লোক মিছিল করে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। হরি হরি বলে নাচতে নাচতে, চলছে হাতে তালি দিতে দিতে। চারিদিকে বইছে আনন্দের হিল্লোল। বাড়ীতে ফিরে এলেন বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীদেবী। কেমন যেন বিষাদাচ্ছন্ন শচীদেবীর অন্তর। থেকে থেকে ভাবছেন তিনি—'কই এখনো ত এল না নিমাই! দামোদর পণ্ডিত যে বললো, আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে সে।' ভাবতে ভাবতে কেমন যেন আকুল হয়ে প্রাণ কেঁদে উঠে তাঁর। 'ওরে বাপ, একটি বার দেখা দিয়ে প্রাণ জুড়িয়ে দে।'

প্রিয়ার মনটা ও হয়ে ওঠে অশান্ত। দেখা দেয় চিত্ত-চাঞ্চল্য। নানা প্রশ্ন তোলপাড় করে উঠে মনে। জিগ্গেস করেন কাঞ্চনাকে—'হ্যাঁ রে সই, প্রভু বুঝি আমার জন্যই আসছেন না মাকে দেখতে। তুই বলত, এ জীবন রেখে কি লাভ। এর থেকে মরণ অনেক ভাল ছিল রে।'

'ওসব বাজে চিন্তে কেন করছিস বলত। ওসব অলুক্ষণে কথা কি ভাবতে আছে!' সান্ত্বনা দিয়ে বললে কাঞ্চনা।

অবশেষে শুনলেন শচীদেবী। নিমাই এসেছে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে। তর সইল না আর। কাঁপতে কাঁপতে চললেন নিমাইকে দেখতে। অগত্যা ঈশান ও চললে সঙ্গে সঙ্গে। টলে টলে পড়ছেন, তবু ছুটছেন আবেগ ভরে। আনন্দ যেন ধরে না জননীর। যেন উথলে উঠছে হৃদয় ছাপিয়ে। রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, বলছেন—'নিমাই নদীয়াতে এসেছে রে। এই শোন, ওকে আর যেতে দিস্ নে। তোরা ধরে রাখবি, বুঝলি।'

কাঞ্চনা আর বিষ্ণুপ্রিয়া। দুজনে বসেছে মুখোমুখি। সখিকে বলছে প্রাণের কথা প্রিয়া। বলছে দুঃখের কথা। কান্নার কথা। কি লাভ বেঁচে থেকে। জীবনে কি পেলাম রে। সারাটা জীবন ত কাঁদতে কাঁদতে ফুরিয়ে যাচ্ছে রে। এর থেকে মরে গেলেই ছিল ভাল।'

আবার পরক্ষণে বলছে প্রিয়া—'কিন্তু সই, মরে গেলেই ত সব ফুরিয়ে গেল

রে, তাহলে ত আর শুনতে পাব না আমার প্রাণবল্লভের গুণগাথা। দুঃখ দহনের মধ্যেই ত আমি ধরে রাখতে চাই আমার প্রাণ গৌরাঙ্গকে।

ওদিকে শচীদেবী টলতে টলতে ঢুকে পড়লেন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ীতে। ঢুকেই সটান চলে গেলেন নিমাইয়ের কাছে। দাঁড়ালেন একেবারে মুখোমুখি। মাকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করলে নিমাই। শচীদেবী আর পারলেন না নিজেকে ধরে রাখতে। রুদ্ধ আবেগে যেন ফেটে পড়লেন। বললেন—'ও সন্ন্যাসে আর কাজ নাই নিমাই। তুই চল, ঘরে ফিরে চল।'

'কিন্তু মা, আমি ত তোমার বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করিনি। তবে তুমি এমন কথা বলছ কেন। কেন ত্যাগ করতে পারছ না পুত্রের মায়া।'

চীৎকার করে উঠলেন শচীদেবী—'না-না-না, তুই আমায় অমন কথা বলিস না। আমি পারব না, কখনই পারব না পুত্রের মায়া ত্যাগ করতে। আমি জন্ম-জন্মান্তর তোকে পুত্র রূপেই চাইরে নিমাই। ও মায়া তুই আমাকে কাটাতে বলিস না। ওই বাৎসল্য মায়াই ত আমার সাধনারে নিমু।'

উন্মাদিনী মায়ের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলে নিমাই। মার মুখে একি কথা শুনছে। একি বলছেন শচীদেবী। বাৎসল্য রসের মূর্ত বিগ্রহ প্রকটিত তার সামনেই। কিছুক্ষণ থমকে গেলে নিমাই। তারপর বললে—'আমি জন্মস্থান দর্শন না করে যাব না মা। কাল সকালেই তোমার গৃহদ্বারে দেখতে পাবে আমাকে।'

'তাহলে ঠিক যাচ্ছিস ত? আমি সারা রাত জেগে থাকব তোর জন্য। দেখিস ভুলিস না যেন।' বেরিয়ে আসতে আসতে বার বার ফিরে তাকাতে লাগলেন শচীদেবী।

বাড়ী এসে সব কথা বললেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। ভারী খুশি হলো প্রিয়া। একটা খুশির ঢেউ আছড়ে পড়ল যেন তার হৃদয়ে। কাঞ্চনা বললে—'সখী আমি তোকে বলিনি। প্রাণকান্ত তোকে দেখা না দিয়ে যেতে পারে না কিছুতেই।'

বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় কিন্তু দুলে উঠল সন্দেহের দোলায়। দ্বিধা দ্বন্দ্বের ঝড় উঠল তার মনে। সন্ন্যাসী ত দেখে না কখনো স্ত্রীর মুখ। শাস্ত্রে ত সে নির্দেশ নেই। তবে কি তিনি মানবেন না সে নির্দেশ। হতেও পারে, তিনি যে স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাধীন।

সারারাত ঘুম হলো না কারো। কেউ পারলেন না ঘুমোতে। জেগেই কাটল বিষ্ণুপ্রিয়া আর শচীদেবীর।

ভোর না হতে হতেই দূর থেকে ভেসে এল কীর্তনের রেশ। ঐ বুঝি

প্রভুকে নিয়ে আসছেন ভক্তবৃন্দ। এগিয়ে আসছেন প্রভুর আঙ্গিনার দিকেই। দর্শন করবে নিমাই আপন জন্মভূমি। এই ত শেষ দেখা। পথের দুধারে দাঁড়িয়ে আছে কাতারে কাতারে লোক। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন মহাপ্রভু। ভক্তরা নিচ্ছে পায়ের ধুলো। কেউ কেউ পরিয়ে দিচ্ছে মালা চন্দন। দরজার সামনে এসে সহসা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রভু।

লুটিয়ে পড়ল দ্বারের অন্তরাল থেকে একটি দেহ। প্রভুর চরণপ্রান্তে। আলুথালু রুক্ষ কেশ। সন্ন্যাসিনীর একখানি অতিসাধারণ মলিন বসন। মাথায় টানা ঘোমটা। আবরণ শূন্য সর্ব দেহ। বিষাদের আলিম্পন মুখ মণ্ডলে। কম্পিত দেহ। ঢলঢল আঁখিভরা জল। এত জল নয়, বুঝি প্রভুর পাদ্য অর্ঘ্য। নিবেদন করছে বিষ্ণুপ্রিয়া, তার প্রভুর শ্রীচরণে।

স্থির অচঞ্চল প্রভু বলে উঠলেন মধুর স্নিগ্ধ কণ্ঠে—'কে তুমি কল্যাণি?'

ভক্তবৃন্দ বিস্ময়ে নির্বাক। স্তব্ধ, হতভব। কেউ ভাবতেও পারেনি এরকম একটা কিছু ঘটবে। বিষ্ণুপ্রিয়া এমন আকুল হয়ে লুটিয়ে পড়বে প্রভুর শ্রীচরণে।

অতি ধীরে ধীরে মাথা তুললো বিষ্ণুপ্রিয়া। অবহেলিত, বঞ্চিত, বেদনা-দীর্ণ জীবনের যেন একখানি করুণ প্রতিচ্ছবি। উপেক্ষিতা বিরহিণী জীবনের রাত্রির বিষণ্ণতা মাখা মুখখানি তুলে তাকালো অসহায় প্রিয়া। করুণ রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—'আমি তোমার দাসী প্রভু।'

নিমাই তুলতে পারল না তার পদযুগল। দাঁড়িয়ে রইল পাষাণের মত স্থির নির্বাক হয়ে। তারপর গম্ভীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললো নিমাই—'কি তোমার প্রার্থনা?

বিষ্ণুপ্রিয়া কান্না-ভেজা করুণ কণ্ঠে বললে—'এ দুটি রাঙ্গা পায়ের ছোঁয়া পেয়ে উদ্ধার হয়ে গেল জগতের কত পাপীতাপী। বিষ্ণুপ্রিয়াই কি রইবে প্রভু চির উপেক্ষিতা?'

'বিষ্ণুপ্রিয়া, এবার তুমি হও কৃষ্ণপ্রিয়া। সার্থক কর তোমার নামাদর্শ।'

বিষ্ণুপ্রিয়া বেদনা-দীর্ণ কণ্ঠে সবিনয়ে বললে—'তুমিই ত আমার কৃষ্ণ, তুমিই ত আমার বিষ্ণু এ ছাড়া ত আমি জানি না অন্য কাউকে প্রভু।

তুমি ত জান আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তোমাকে দেওয়ার মত আমার ত সম্বল কিছু নাই।' অতি সরল কণ্ঠে বললে নিমাই।

এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে প্রভু। নেই কোন ভাবান্তর। কিন্তু দেখে মনে হয়, কিছু যেন দিতে চান প্রভু। অবশেষে বললেন—'নাও আমার এই পাদুকা

যুগল। এরই পুজো কর তুমি। ফিরে পাবে মনের শান্তি। পাবে হৃদয়ে সন্তোষ।'

পরম ভক্তি ভরে মাথায় তুলে নিলে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর পাদুকা যুগল। আভূমি লুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল প্রিয়া প্রভুর শ্রীচরণে। দুইগণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অবিরল ধারে অশ্রুরাশি। আনন্দে ভক্তবৃন্দ দিল জয় ধ্বনি।' জয় গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া।'

ধূলি ধূসরিত বিষ্ণুপ্রিয়া পাদুকা যুগল মস্তকে ধারণ করে ধীরে ধীরে ফিরে গেল গৃহে। উপেক্ষিতা জীবনের এই ত তার পরম সম্বল। একমাত্র আশ্রয় স্থল। পরম ভক্তিভরে প্রিয়া বুকে চেপে ধরল পাদুকা যুগল। বার বার মাথা ঠুকতে লাগল অন্তরের আকুল আর্তি নিয়ে। অভাগিনী নিজের কেশরাশি দিয়ে সযত্নে বার বার মুছতে লাগল প্রভুর পাদুকা যুগল।

ফিরে চললেন শ্রীগৌরাঙ্গ। সেই সঙ্গে চিরতরে অস্তমিত হল নদীয়ার চাঁদ নবদ্বীপ থেকে।

॥ ঊনত্রিংশ ॥

চিন্তায় কেমন যেন ভেঙ্গে পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়া।

দিনকে দিন দুর্বল হয়ে পড়ছেন শাশুড়ী। পথ আর চলতে পারেন না। বয়স ত কম হলো না। প্রায় ৮৭ পেরোতে চলছেন। আজকাল প্রায় মাথার ঠিক নাই তাঁর। বসে বসে আপন মনে কি যেন সব বকে চলেন। সব কথা বোঝা যায় না। তবে বিড়বিড় করছেন সব সময় 'নিমাই-নিমাই' করে—এ স্পষ্ট বোঝা যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রায়ই বসে থাকে শাশুড়ীর কাছে। হাত বুলিয়ে দেয় গায়ে পিঠে। যথা সময়ে নিজে হাতে তুলে খাইয়েও দেয় বিষ্ণুপ্রিয়া। তখন বলেন— 'বলি ও বৌমা, আমার নিমাই খেয়েছে ত। তার যেন কোন অযত্ন না হয়।'

বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসে প্রিয়ার। মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। হ্যাঁ গো তোমার ছেলে খেয়েছে। কিন্তু মুখ ফুটে প্রিয়া বলতে পারে না, 'তোমার নিমাই ত বাড়ীতে নেই।'

জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড খরায় কেমন যেন আইঠাই করতে থাকেন শচীদেবী। বিষ্ণু-প্রিয়া পাশে বসে বসে বাতাস করে শাশুড়ীকে। তবুও দরদর ধারে ঝরে পড়ে ঘাম। নিজের অঞ্চল দিয়ে যত্ন করে মুছে দেয় প্রিয়া। অসহনীয় হয়ে ওঠে জ্যৈষ্ঠের দুপুর। প্রিয়ার মনে পড়ে প্রভুর কথা। এই প্রচণ্ড খরায় প্রভু তাঁর রাঙা চরণে উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়ে হাঁটছেন কেমন করে। পাখা টানতে টানতে গুণগুণ করে বিষ্ণুপ্রিয়া—

'জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপত সিকতা।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ রাতা॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কাঁদে নিশিদিন।
ছট্‌ফট্ করে যেন জল বিনু মীন॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! তোমার নিদারুণ হিয়া।
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥'—লোচন

দিন কয়েক হল শচীদেবী আর উঠতে পারছেন না। কিছু খাওয়াতেও পারছেন না প্রিয়া তাকে। উৎকণ্ঠার শেষ নেই বিষ্ণুপ্রিয়ার। এই ত তার শেষ সম্বল। তার বিরহদীপ্ত বঞ্চিত জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী। সেই যদি চলে যায়। সে থাকবে কাকে নিয়ে। আর ভাবতে পারে না বিষ্ণুপ্রিয়া।

নদীয়ার লোকেরা আসছে দলে দলে। দেখে যাচ্ছে শচীদেবীকে। অতন্দ্র প্রহরী বিষ্ণুপ্রিয়া। সব সময় বসে আছে শাশুড়ীর শিয়রে।

পুরাতন ভৃত্য ঈশান। সেও হয়ে পড়েছে বৃদ্ধ। আজকাল তেমন আর কিছু করতে পারে না। বড্ড ভেঙে পড়েছে তার শরীরটা। কি আর করবে সে। যতটুকু যা পারছে, তাই করছে সে।

কাঞ্চনা ছায়ার মত সদা সর্বদা আছে কাছে কাছেই। ভারী প্রিয়সখী প্রিয়ার। তিন বছর আগে, ওকে পাঠিয়ে ছিল নীলাচলে। দেখে আসতে প্রভুকে। তা গিয়েছিল ও। এনে দিয়েছে প্রাণকান্তের সংবাদ। দেখেও এসেছে পাণবল্লভকে। ওর কাছেই শুনে গৌর কথা। শাশুড়ী ত আর বলতে পারেন না কিছুই। তবু ভাল, গৌর ভজনার সঙ্গী পেয়েছে কাঞ্চনাকে।

কিন্তু কাল রাতে যে কিছুতেই ঘুমাতে পারেনি প্রিয়া। বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছেন শচীদেবী। একেবারে সারা রাত কেটেছে ঠায় বসে বসে। আর কোন আশা নাই। বুঝি নিভে যাবে শেষ প্রদীপটি। প্রিয়া অপলক তাকিয়ে আছে শাশুড়ীর মুখের দিকে। কেমন যেন স্থির হয়ে আসছে সব। সহসা দু'হাত তুলে খুঁজছেন ওকে। বিষ্ণুপ্রিয়া ঝুঁকে পড়ল মুখের কাছে।

দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইলো বিষ্ণুপ্রিয়াকে। কি যেন বলতে চাইলেন। জড়িয়ে এসেছে গলা। কিছুই শোনা গেল না। কি বলতে চেয়েছিলেন শচীদেবী। না, কিছুই পারলেন না বলতে। মাথাটা কাত হয়ে পড়ে গেল বালিশে।

বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে উঠলো ডুকরে। 'মা, মা গো।'

চলে গেলেন শচীদেবী। দুঃখ, দহন-দীর্ণ তনুহা ক্লিষ্ট একটা জীবন শেষ হয়ে গেল। বিষ্ণুপ্রিয়ার সব কর্তব্য, সব দায়িত্ব আজ শেষ।

রথযাত্রার কাছাকাছি। গৌড় থেকে ভক্ত যাত্রীদল এসে হাজির হল নীলাচলে। জননীর তত্ত্বাবধায়ক দামোদর পণ্ডিত এসেই সংবাদটা দিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শুনলেন তাঁর মুখেই। জননী সজ্ঞানেই গঙ্গা লাভ করেছেন। বাইরের থেকে কোন দুঃখ বা ব্যথার আভাসই নেই। কেউ কোন জানতেও পারল না। তবে শ্রীচৈতন্যদেবের এই মায়িক পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণও যেন গেল কমে। মায়ের জন্য যেটুকু আকর্ষণ ছিল তাঁর তাও ছিন্ন হলো।

'দামোদর পণ্ডিত আরো বললেন—'বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবার তুলনা হয় না। প্রাণপণে সেবা করেছেন প্রিয়াজী। দিন রাত্রি অনলস অতন্দ্র। প্রভু, আপনার সব দায় সম্পন্ন করেছেন সুচারুরূপে।'

শুনে ভারী খুশি শ্রীচৈতন্য দেব। শুধু কি তাই। ভগবদ্ ভজনে তাঁর নিষ্ঠা, ভক্তির তুলনা হয় না। সন্ন্যাসিনী জীবনের কঠোর থেকে কঠোরতর নিয়ম এখন পালন করছেন প্রিয়াজী। ইহ জগতের দিকে কোন দৃষ্টি নেই তাঁর। এমন কি দেহের প্রতিও সম্পূর্ণ উদাসীন।

কথাগুলো শুনলেন শ্রীচৈতন্যদেব। বললেন না কোন কিছুই।

সত্যি সব দায় থেকে মুক্ত আজ প্রিয়া।

নেই কোন উৎকণ্ঠা। নেই কোন চাঞ্চল্য। ভাবনাও নাই বিন্দুমাত্র। দুর্ভাবনায় আর কাটবে না রাত্রিও। কেউ নেই। কিছু নেই। একমাত্র কান্নাই তার সঙ্গের সাথী।

প্রভুর কথাগুলো আজ বেশী করে মনে পড়ছে বিষ্ণুপ্রিয়ার। প্রভু বলেছিলেন—'তোমাকে কাঁদবার জনাই আমি সন্ন্যাস নিচ্ছি প্রিয়া। তুমি না কাঁদলে জীব কাঁদবে না।

তাই ত বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদছে। তার কান্না দেখে জীব ও কাঁদছে। সম্মুখে রয়েছে প্রভুর দারুময় পাদুকা। তাকিয়ে আছে তারি দিকে প্রিয়া। ধরে রাখতে পারছেনা আর নিজেকে। চোখ ভরে উঠছে জলে। পাদুকা দু'টি বক্ষে চেপে ধরে প্রিয়া। চোখের জলে সিক্ত করে, অভিসিঞ্চিত করে বেদনার অশ্রু জলে। জানায় প্রাণের প্রণতি। নিমজ্জিত হয় আত্মরতির সুখ সায়রে। এমনি করে কেটে যায় প্রহরের পর প্রহর। সর্বশক্তি দিয়ে আকুল হয়ে ডাকে প্রভুকে। কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্য দিয়ে চরম আত্মনিগ্রহ করে এগিয়ে চলে আত্ম-নিমগ্নতার পথে।

কোন দিকে খেয়াল নেই বিষ্ণুপ্রিয়ার। চলেছে অবিরাম নাম জপ করে। নাম বন্যার খরস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে নিজেকে। কবে কোথায় গিয়ে ঠেকবে সে নিজেই তা জানে না।

রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়ার গৃহের দ্বার। কারো যাওয়ার অনুমতি নেই সেখানে। তাই দেবীর দর্শনও পায়না কেউ।

অতি প্রাতে স্নানাহ্নিক সেরে জপে বসে প্রিয়া। সম্মুখে একটি পাত্র। তাতে রয়েছে সামান্য কিছু আতপ চাল। আরো একটি শূন্য পাত্র রয়েছে পাশেই।

শুরু হলো জপ। একবার একটি শেষ হল নাম জপ, পাশের শূন্য পাত্রে তুলে রাখলে একটি তণ্ডুল। এক নাম এক তণ্ডুল।

হিসেবের কোন ঝামেলা নেই। ছেদ নাই নামের ও। এমনি চলল সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। দেখলো তাকিয়ে প্রিয়া। কয়েক মুষ্ঠি মাত্র জমেছে তণ্ডুল। তাই নিয়ে এলো ধুয়ে। তারপর মুখে বাঁধল কাপড়। যদি মুখ থেকে এ'টো জল বা থুথু পড়ে। তাই এই সাবধানতা।

'জপান্তে সে সংখ্যার তণ্ডুল মাত্র লঞা।
যত্নে পাক করে মুখ বস্ত্রেতে বাঁন্ধিয়া॥'

ব্যঞ্জন ? তাব কি আর কোন প্রয়োজন আছে। নাম-সিদ্ধ চাল। নামই ত ব্যঞ্জন। মাখান হয়েছে নাম দিয়েই। সামান্য লবণের ও নাই কোন প্রয়োজন।

বিষ্ণুপ্রিয়া ভোগ দেখাল প্রভুকে। লাগিয়ে দিল গৃহের কপাট। এমনি ভাবে কাটল অনেকক্ষণ। তারপর বাইরে এল দরজা খুলে। এবার প্রসাদ গ্রহণের আয়োজন।

'বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনি।
মুষ্টিক প্রসাদ মাত্র ভুঞ্জেন আপনি॥
অবশেষে প্রসাদান্ন বিলায় ভক্তেরে।
ঐছন কঠোর ব্রত কে করিতে পারে॥'

গৃহের বারান্দাতে টাঙান বস্ত্রের পর্দা। তার অন্তরালে এসে দাঁড়াল বিষ্ণুপ্রিয়া। দর্শনেচ্ছু ভক্তগণ এসে সমবেত হলো। পরিচারিকা তুলে দিল পর্দা। চরণ যুগল দর্শন করে ধন্য হল ভক্তবৃন্দ।

এমনি করেই পালন করে প্রিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রতা। হৃদয়ের সব পঙ্কিলতা, সব আবিলতা নাম জপের প্রেমবন্যায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। গৈরিক রঙে রেঙে উঠে মন। যাত্রা করে—ঐশ্বর্য থেকে মাধুর্যে। জীবনের সব কান্না মন্ত্রের সুরে হয়ে উঠে সঞ্জীবিত।

প্রিয়া চিঠি লিখেছিল প্রভুকে। বলেছিল—

'আপনি যে সব তুমি নিয়ম পালিবে।
তা হতে কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে॥'

প্রিয়া আজ সেই কঠোর নিয়মেই বেঁধেছে নিজেকে। নিজে কেঁদে কেঁদে কাঁন্দাচ্ছে অন্যকেও।

এই দহন দীপ্ত জীবনে শুধু কান্না, শুধু হাহাকার। কেঁদে কেঁদে শচীদেবী নিয়েছেন বিদায়। তাঁর কান্না বুঝি তিনি দিয়ে গিয়েছেন প্রিয়াকে। সহসা

সংবাদ এলো নীলাচল থেকে। প্রভু নেই। তিনি অন্তর্ধান করেছেন। শোনা মাত্র মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল বিষ্ণুপ্রিয়া। নিদারুণ শেল বিঁধল বিষ্ণুপ্রিয়ার বক্ষে।

'বিষ্ণুপ্রিয়া আর বংশী গৌরাঙ্গ বিহনে।
উন্মত্তের ন্যায় কান্দে সদা সর্বক্ষণ॥
দুই জনে অন্ন পান করিয়া বর্জন।
হা নাথ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে সর্বক্ষণ॥'

কান্না আর থামে না প্রিয়ার। ক্ষণ মূচ্ছা, ক্ষণ চেতন, যখনি ফিরে আসে জ্ঞান, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে প্রিয়া। প্রভু, তুমি এ দাসীকে কার কাছে রেখে গেলে। নাও এবার ডেকে নাও। দাসীকে স্থান দাও তোমার পদে।

কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে বংশীবদন। প্রিয়ার আশ্রিত সেবক। গভীব বাত। তন্দ্রাচ্ছন্ন বিষ্ণুপ্রিয়া। চারিদিকে নিথর নিস্তব্ধ। এমন সময় প্রভু এলো প্রিয়ার কাছে। বললে শিয়রে দাঁড়িয়ে—'বিষ্ণুপ্রিয়া আমার জন্য আর কেঁদো না। শোন; যে নিম গাছের গোড়ায় আমি জন্মেছিলাম, আব যে নিম গাছের স্নেহচ্ছায়ায় মা আমায় স্তন্য দান করেছিলেন—সেই নিম গাছের দ্বাবা নির্মাণ করো আমার দারুমূর্তি। প্রতিষ্ঠা করো নবদ্বীপে। সেবা করো সেই মূর্তির। দেখবে তার মধ্যেই পাবে আমাকে।'

বিষ্ণুপ্রিয়াব ভেঙ্গে গেল তন্দ্রা। বলে উঠলো—'কে, কে গো? কোথায় গেলে? এই ত তুমি আমার শিয়রেব ছিলে। দেখা দিয়ে কোথায় পালালে গো।'

ভেঙ্গে গেল বংশীব ঘুম। সেও দেখেছে স্বপন। আব বিলম্ব নয়। প্রভুর আদেশ পালন করতে বিষ্ণুপ্রিয়া হয়ে উঠল তৎপব। নির্মিত হল নিমাইয়ের দারুময় দেহ। বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী সমবেত হলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হলো দারু বিগ্রহ। সেবায়েত নিযুক্ত হলো বিষ্ণুপ্রিয়ার সহোদর যাদব মিশ্র।

প্রিয়া যেন অনেকটা শান্ত হলো। কিন্তু কান্নাব যে এখনো বাকি। সুখে দুঃখে যারা ছিল কাছে, একে একে তারাও আবম্ভ করলো বিদায় নিতে। ঈশান ত চলে গেছে অনেক দিন আগেই। সেবক বংশীও নিল বিদায়। পিতৃ কুলে মা বাবাও গত হয়েছেন সেই কবে। একে একে সব কান্না, একাই কেঁদেছে বিষ্ণুপ্রিয়া। সবাই যেন চলে গেছে উপেক্ষা করে প্রিয়াকে।

বালব্রহ্মচারী দামোদর পণ্ডিত বেশ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তবু দেহে তাঁর যুবকের মত শক্তি। একমাত্র তিনিই করছেন প্রিয়াজীর সেবা। প্রিয়াজীর বয়স

ত আর কম হলো না। তাহলেও কারো অধিকার নাই, একমাত্র দামোদরই যেতেন, সেবা করতেন বিষ্ণুপ্রিয়ার। শেষের দিনগুলি কাটছিল ধ্যান-ভজনেই। নিজেকে নিঃশেষে করেছিল আত্মসমর্পণ। সে কাহিনী বড় মর্মন্তুদ। বিষ্ণু-প্রিয়ার ব্রত কঠোর হতেও কঠোরতর।

'বাড়ীর বাহির দ্বারে মুদ্রিত করিয়া
ভিতরে রহিলা দাসী জনা কতো লইয়া ॥
দুই দিকে দুই মই ভিতে লাগা আছে।
তাহে চড়ি দাসী যায় আগে পাছে ॥
ভিতরে পুরুষ মাত্র যাইতে না পায়।
দামোদর পণ্ডিত যায় প্রভুর আজ্ঞায় ॥
পণ্ডিতের অদ্ভুত শক্তি অদ্ভুত প্রকৃতি।
মহাপ্রভুর গুণে নিরপেক্ষ যার খ্যাতি ॥
কদাচ কেহ করে অল্প মর্যাদা লঙ্ঘন।
সেইক্ষণে দণ্ড করে মর্যাদা স্থাপন ॥
গঙ্গাজল ভরি দুই ঘট হস্তে লইয়া।
সেই পথে লঞা যায় নির্লক্ষে চলিয়া ॥
প্রত্যহ সেবার লাগি লাগে যত জল।
প্রায় দামোদর তত আনয়ে সকল ॥
বহিরাচরণ লাগি দাসীগণ আনে।
কলস লইয়া যবে যায় গঙ্গাস্নানে ॥ —অনুরাগাবলী

শুভ গৌর পূর্ণিমা আজ। বিষ্ণুপ্রিয়া সখী কাঞ্চনাকে নিয়ে চলেছে মন্দিরে। ধীর পদক্ষেপ। চরণ যেন চলে না আর। এসে দাঁড়ালো মন্দিরের সামনে। একবার তাকালো বিগ্রহের দিকে। স্থির অচঞ্চল চোখের দৃষ্টি। বড় বিষাদাচ্ছন্ন। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো কাঞ্চনা। দেবীর দু'নয়ন বেয়ে ঝরে পড়ছে জল অঝোর ধারায়। সখীর অবস্থা দেখে বড ব্যথা পেলো কাঞ্চনা।

বিষ্ণুপ্রিয়া বললো—'আজকে প্রভুর জন্মদিন। আবির্ভাব তিথি। বড় পুণ্য দিন। সই, মন্দির থেকে সবাইকে চলে যেতে বল। আমি যাব মন্দিরে।'

বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করলো গৌর-মন্দিরে। তারপর লাগিয়ে দিল কপাট। বসল বিগ্রহের সামনে। নিমগ্ন হল গৌরধ্যানে' নাম জপ করতে করতে অবশ হয়ে এল তনু।

কেটে গেল অনেক ক্ষণ। তবু উন্মুক্ত হলো না মন্দিরের কপাট। কাঞ্চনা হয়ে উঠল উৎকণ্ঠিতা। ডেকে আনল যাদবকে। এসে যাদব খুললো মন্দিরের কপাট। ছুটে এল সকলে। দেখল চিরবিরহিনী উপেক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়া গোর বিগ্রহের সম্মুখে মহাসমাধিস্থ। হাহাকার করে উঠল সকলে। করুণ কণ্ঠে ডাকল যাদব—

—'দিদি! দিদি!'

না, কোন সাড়াশব্দ নেই। দেহে নেই কোন স্পন্দন। পড়ে রয়েছে দেহটা। দেহী নেই। সব শেষ। দুঃখ শ্রান্ত বিরহিনী প্রিয়ার উপেক্ষিত জীবনের ঘটেছে চির সমাপ্তি। গোর বক্ষবিলাসিনী গোর বক্ষে লাভ করেছে চির শান্তি। আজ শ্রীবিগ্রহ কি শুধু বিশ্বম্ভর, না, বিশ্বম্ভর-বিষ্ণুপ্রিয়া?'

গোরবক্ষ বিলাসিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
কৃপা করি এ দাসেরে দেহ পদছায়া॥

গ্রন্থ-ঋণ

১। শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত—মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ (বিশ্ববাণী)
২। চৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস
৩। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ
৪। শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস (অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত)
৫। অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৬। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব—স্বামী সারদেশানন্দ
৭। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—মালীবুড়ো
৮। বৈষ্ণব পদাবলী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭২)
৯। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী—বিমানবিহারী মজুমদার
১০। মহান ভারত—শ্রীভিক্ষু
১১। বাঙালী জীবনে বিবাহ—শঙ্কর সেনগুপ্ত
১২। বৈষ্ণব রসপ্রকাশ—ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস
১৩। চৈতন্য আবির্ভাবের পটভূমি—মালীবুড়ো
১৪। শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য—মালীবুড়ো
১৫। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—বিধুভূষণ সরকার
১৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড : চৈতন্যযুগ—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭। কান্তাপ্রেম—গজেন্দ্রকুমার মিত্র
১৮। বিরহিনী বিষ্ণুপ্রিয়া—মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত
১৯। যদি গৌর নাহি হত—শম্ভু মহারাজ
২০। প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১। রাজগৃহ ও নালন্দা—ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন
২২। তিব্বত ও কাশ্মীরে—স্বামী অভেদানন্দ